একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

[illegible] সংখ্যা — বৈশাখ [illegible] ব্রাহ্ম সম্বৎ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধ্যান।

[illegible]

গম্ভীর জাগে তার গভীর নাদের।

[illegible] জাগে মধুরা, দেবের [illegible];

[illegible] তার ধ্যান নিরাকার।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ [illegible]।

আচার্য্যের উপদেশ।

নববর্ষের ঊষা —নব বর্ষের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ঊষা —পূর্ব্বদিক্ আলো করিয়া সাগর গর্ভ হইতে ধীরে ধীরে সমুত্থান করিতেছে! বৎসরের প্রথম সূর্য্য ক্ষণ পরে আগমন করিবে— তাই কল্যাণময়ী ঊষা শুভ্র জ্যোতিতে আকাশের অন্ধকার প্রক্ষালিত করিয়া সূর্য্যের প্রয়াণ-দ্বার সুমঙ্গল শোভায় শোভিত করিয়া রহিয়াছে। সুপ্ত পৃথিবীকে জাগ্রত করিয়া আরক্তিম নব সূর্য্য [illegible] জলে [illegible] হইতেছে,—দেখিতে [illegible] সহস্র অমৃত-কোটি কিরণ-রেখা আসিয়া [illegible] চারিদিকে বিকিরণ করিল; ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড [illegible] আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। সর্গের আজ একই সময়ে বাৎসরিক [illegible] দুই [illegible] স্বর্ণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। এই শুভক্ষণ মুহূর্ত্তে [illegible] আমরা দিবসের অধিপতি—বৎসরের অধিপতি—আত্মার অধিপতি—পরমাত্মাকে ভক্তি-[illegible] প্রণাম করিয়া সংবৎসরের এবং দিবসের প্রথম মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই।

এই সময়ে সূর্য্য আকাশ এবং পৃথিবীর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছে—অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুই বৎসরের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছে,—সম্মুখে নব বৎসর, পশ্চাতে অতীত বৎসর;—মঙ্গল-জগতের চক্ষু যেন ঐ সন্ধি-স্থান হইতে ভূর্লোক ভুবর্লোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—অতীত অনাগত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আমাদেরও কর্ত্তব্য যে, অতীত বৎসরের নিকট হইতে কি শিক্ষা লাভ করিলাম তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি, [illegible] দেখিয়া আগামী বৎসরের গম্য-পথের একটি সুন্দর আদর্শ-লিপি প্রস্তুত [illegible] পারি[illegible]

...সুরের যুদ্ধ যেমন পুরাণের প্রধান তত্ত, শ্রেয় এবং প্রেয়ের সংগ্রাম সেইরূপ মনুষ্য জীবনের প্রধান ঘটনা। অতীত বৎসরে শ্রেয় যখন জয়ী হইয়া আমাদিগকে উন্নতির উচ্চ সানুতে লইয়া গিয়াছে তখনই বা আমাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, আর, যখন প্রেয় জয়ী হইয়া আমাদিগকে অধোগতিতে লইয়া গিয়াছে, তখনই বা আমাদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। এ সংসারে প্রেয়ই বলবান্—কিন্তু তাহাকে জয় না করিলে মনুষ্যের আর কিছুতেই মনুষ্যত্ব নাই! মনুষ্যের আত্মার যে কি বল—সংসার-সংগ্রামই তাহার পরীক্ষা-স্থল। যখনই আমরা শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, সেই পথেই আত্মার বল, সহায়, শান্তি, মুক্তি, সমস্তই বিদ্যমান আছে;—আর যখনই প্রেয়ের পথে পদার্পণ করিয়াছি তখনই দেখিয়াছি যে, সেই পথেই আত্মার যত দুর্গতি যত গ্লানি যত অশান্তি যত মলিনতা! স্পষ্টই দেখিয়াছি যে, শ্রেয়ের পথে মঙ্গলের দলবল বিভীষিকার মেঘে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—প্রেয়ের পথে অমঙ্গলের দলবল প্রলোভনের চাকচিক্য-ময় ধূলি-রাশিতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। শ্রেয়কে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক,—বহির্দৃষ্টিতে তাহাকেই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে, প্রেয়ের পথে যাহা কিছু দেখিতে ভাল তাহাই মৃগতৃষ্ণিকা, আর, যাহা কিছু দেখিতে কদর্য্য তাহাই তাহার পঙ্কিল মূর্ত্তি। অতএব নববর্ষের প্রবেশ-দ্বারে এবং আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই বাক্যটিকে যেন আমরা সুস্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখি যে, "প্রেয়! তোমাকে আমরা চাহি না—তুমি দূরে প্রস্থান কর।"

প্রেয় আমাদের যেরূপ শত্রু—প্রেয় আমাদিগকে যেরূপ বিষদৃষ্টিতে দেখে—আমরা যদি প্রেয়কে তাহার অর্দ্ধেক বিষদৃষ্টিতে দেখি তবে আমরা তাহার কুহক হইতে রক্ষা পাইতে পারি; কিন্তু আমরা তাহা করি না,—প্রেয়কেই আমরা আমাদের পরম সুহৃৎ মনে করি, ও পিতৃহীন অনাথ বালকের ন্যায় সেই কপট বন্ধুর হস্তে ধন প্রাণ-মান সমস্তই সঁপিয়া দিই। আর-আমরা শ্রেয়কে আমাদের নিকটে আসিতে দিই না। শ্রেয় সাক্ষাৎ ঈশ্বরের করুণা—সর্ব্বজগতের সুহৃৎ—আমাদের মঙ্গল মঙ্গলের আকর—শ্রেয়কে আমরা অবিশ্বাস করি, ও বন্ধুবর্গকে বলি যে, "শ্রেয়কে সাবধান—এমন নির্ব্বোধ আর জগতে নাই! আপনিও সুখভোগে বিরত—অন্যকেও সুখভোগে বিরত করিতে চায়।" শ্রেয় যে, কি স্বর্গীয় অমৃত-রস পান করে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না—তাই মনে করি যে, শ্রেয়েতে কোন রসকস নাই! কিন্তু শ্রেয় আপন মুখে সেই রস আস্বাদন করিয়া বলেন "রসো বৈ সঃ" "পরমাত্মা রসস্বরূপ" প্রেয় ও রসের কিছুই জানে না! শ্রেয় কত যে আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলেন—"বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে—তব চরণামৃত-পান-পিপাসিত নাহি চাহি ধন-জন মানে"—প্রেয় তাহার বাষ্পও বুঝিতে পারে না। অতএব নববর্ষের সোপান-দ্বারে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই বাক্যটি যেন আমরা সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া রাখি যে, "শ্রেয়! তুমি আমাদিগকে লইয়া চল—তোমারই আমরা অনুগামী হইয়া সম্বৎসর অতিবাহন করিব।"

সঙ্গীতের প্রথমেই যেমন যন্ত্র-সকলের সুর বাঁধা কর্ত্তব্য, সেইরূপ শ্রেয়ের পথে চলিতে হইলে প্রথমেই আত্মাকে পরমাত্মার সহিত এক-তানে মিলিত করা কর্ত্তব্য। অদ্যকার এই পুণ্য সময়ে আইস আমরা আমাদের হৃদয়-স্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা—ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র আশা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ—বিস্মৃত হইয়া, ঈশ্বরের মহান্ উদ্দেশ্য—তাঁহার অপার করুণা—তাঁহার অনন্ত প্রেমের প্রতি আমরা আমাদের সমুদায় লক্ষ্য নিবিষ্ট করি। আইস আমরা বন্ধুবান্ধবে সম্মিলিত হইয়া এক হৃদয়ে একমনে পরমাত্মাকে আহ্বান করি—তাঁহাকে হৃদয়ের গভীর মর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করি—ও তাঁহাকে হৃদয়াধিপতিরূপে বরণ করিয়া প্রীতি ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি। অদ্য হইতে এই আমাদের সংকল্প হউক যে, যে কোন কার্য্য করিব—অগ্রে পরম পিতা পরমেশ্বরের আদেশ গ্রহণ করিব; এবং কার্য্য-অবসানে তাঁহার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতিতে অন্তঃকরণে অপার শান্তি সম্ভোগ করিব, তাঁহার আশীর্ব্বাদের অভ্যন্তরে বাস করিব—তাহাই আমাদের স্বর্গ;—তাঁহার প্রসাদ লইয়া সংসারে বিচরণ করিব—তাহাই আমাদের বল, তাঁহার প্রেমরসে হৃদয়-পদ্ম বিকসিত করিব—তাহাই আমাদের আনন্দ,—এইরূপে আমরা আত্মার আনন্দে নিদ্রা যাইব, আত্মার আনন্দে জাগরণ করিব—আত্মার আনন্দে সম্বৎসর অতিবাহন করিব এবং সময় উপস্থিত হইলে আত্মার আনন্দে ইহলোক হইতে লোকান্তরে প্রয়াণ করিব। অদ্য হইতে যেন এই বিমল আনন্দের ব্রত আমাদের হৃদয়ে চিরজীবনের মত বদ্ধমূল হয়।

হে পরমাত্মন্! তুমিই কেবল একই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর! তোমাকে আমরা আশ্রয় করিতে পারিলেই আমাদের দেবভাব সকল অচলের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়—কেহই তাহাদিগকে তিলমাত্র টলাইতে পারে না। তোমার অজেয় প্রসাদ দ্বারা তুমি, আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখ, যেন অন্তর-বাহিরের আসুরিক দল বল আমাদের নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করে; তোমার অমোঘ আশ্রয়ে বলী হইয়া যাহাতে আমরা সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারি—ও তোমাকে হৃদয়াভ্যন্তরে পাইয়া সকল দুঃখ শোক অতিক্রম করিতে পারি—তুমি আমাদিগের প্রতি সেইরূপ কৃপা বিতরণ কর, তাহা হইলে আমাদের সকল অভাব দূর হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ চৈত্র রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরব্রহ্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রেমের দিক্ দিয়া অতি সহজ জ্ঞানের দিক্ দিয়া অতি কঠিন। শ্রদ্ধা—কি না ঐকান্তিক বিশ্বাস। * জ্ঞানালোকে সত্য প্রকাশ পায়,

* সজ্জন-তোষিণী নামক একখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পত্রিকায় এই কথাটির বিরুদ্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "প্রেমের দিক্ দিয়া শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের দিক্ দিয়া শ্রদ্ধার কি ভেদ ও কি বিলক্ষণ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।" সম্পাদক মহাশয় যে, কেন বুঝিতে পারেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহার প্রেমচক্ষু ফুটে নাই—জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেওয়া কত কঠিন—সম্পাদক মহাশয় কি তাহা জানেন না? চন্দ্র উদিত হইতে দেখিয়া বিদূষক যখন মোদকের সহিত তাহার উপমা দিল, তখনই বুঝা গেল যে, সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই—সে ব্যক্তি প্রেমের দিক্ দিয়া চন্দ্রকে দেখিতে জানে না; এখন,—কে এমন নির্ব্বোধ যে সে ব্রাহ্মণকে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অনুভব করাইবার জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইবে? জ্ঞানের দিক্ দিয়া সৌন্দর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করা যদি সহজ হইত—তবে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িলেই বিদ্বান্ ব্যক্তি মাত্রেই কবি হইতে পারিতেন। সৌন্দর্য্য যে কি তাহা ভাবেই বুঝিতে হয়, জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। কিন্তু যাহা জ্ঞানে বুঝা হয় তাহাই প্রকৃতরূপে বুঝা হয়, ভাবে কেবল আভাস মাত্র বুঝা হইয়া থাকে; এজন্য যে কোন বিষয়ের তত্ত্ব শুদ্ধ কেবল আমরা ভাবে বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি, তাহার সহিত অনেক সময়ে ভুল জড়ানো থাকে; বিবেক দ্বারা সেই ভুল-গুলিকে অপসারণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা জ্ঞানের কার্য্য; এইরূপ জ্ঞানের দিক্ দিয়া যখন কোন বিষয়ে আমা-

প্রকাশ পাইলেও সত্যের প্রতি সকলের সমান মাত্রায় শ্রদ্ধা হয় না। সত্য আমাদের নিকট প্রকাশ পাইলেও অনেক সময়ে আমরা অশ্রদ্ধা করিয়া তাহাকে হারাইয়া ফেলি। মিথ্যার প্রতিই বরং আমরা অতর্কিত ভাবে শ্রদ্ধা সমর্পণ করি;—একথা আমরা কর্ণে শ্রবণ করি মাত্র যে,

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেবা শরীর-চেষ্টা করিত কেবা জীবিত থাকিত যদি এই আকাশে আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম না থাকিতেন; কিন্তু এ কথাটির প্রতি আমাদের বিশ্বাস কতটুকু? অতীব যৎসামান্য! এত অল্প যে তাহার প্রাণে কোন বল নাই! কিন্তু যখন আমরা শুনি যে, "অদৃষ্টই সকলের মূল—অদৃষ্টেরই বলে আমরা জীবিত আছি—অদৃষ্টেরই বলে আমরা চলাবলা করিতেছি—অদৃষ্টই জগতের মূলাধার" তখন উহার ভাবার্থ আমরা কি যে বুঝিলাম তাহার ঠিকানা নাই, অথচ উহা

দের শ্রদ্ধা হয়, তখন সে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে আমাদের যেমন পরিশ্রম লাগিয়াছে—তাহার মূল-ও তেমনি দৃঢ় হইয়াছে। প্রেম-দ্বারা আমরা কতবার কত বিষয় ভাবে বুঝিয়া লই;—তাহা যখন কিছু কখন সেই সেই বিষয় সম্বন্ধেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি কোনস্থলে বলিয়াছেন "বাসনাই ভাবনার জনক;" প্রেম-মূলক-চিন্তা-শ্রদ্ধায় সম্বন্ধে তেমনি বলা যাইতে পারে যে, বাসনাই সে শ্রদ্ধার জনক,—যাহাতে যাহার প্রেম তাহা স্থায়ী হউক এই তাহার আন্তরিক বাসনা,—আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি যে,—সে চিরজীবী হউক, তাহার আমরা পাঠ লিখি "চিরঞ্জীবেষু",—সে পত্র-সকলই চিরজীবী এই বাক্যে আমরা শ্রদ্ধা সমর্পণ করি, এইরূপ প্রেমের দিক্ দিয়া শ্রদ্ধা সমর্পণ সর্ব্বদাই আমরা করিয়া থাকি—এবং তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা প্রযুক্ত জ্ঞান দ্বারা সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় করিবার জন্য সচেষ্ট হই। শ্রদ্ধা যতক্ষণ শুদ্ধ কেবল প্রেমকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে ততক্ষণ তাহা কাঁচা থাকে, যখন তাহা জ্ঞানের অবলম্বন পায় তখনই তাহা পাকা হয়। পত্নী পতিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে বলিয়া তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিশ্বাস করে,—এরূপ বিশ্বাস সহজ বটে কিন্তু তদ্রূপ বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না; পত্নী যদি অনুসন্ধান ও পরীক্ষার দ্বারা পতির সদ্গুণ-সমস্ত বিশেষ রূপে অবগত হইয়া তাহার ঐ হৃদয়ের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন, তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে ঐ পতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জ্ঞানের দিক্ দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। বালকের অপরিণত সরল বিশ্বাস সচরাচর প্রেমের দিক্ দিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ও পুরুষের কঠোর অনুসন্ধানলব্ধ বিশ্বাস সচরাচর জ্ঞানের দিক্ দিয়া হইয়া থাকে। প্রেমী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা রাগান্ধ তাঁহারা কুহককে বিশ্বাস করিয়া ঠকেন—তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, না জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি-বুদ্ধির যুক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ঠকেন—তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, ইহা বলা কঠিন; কিন্তু এটি বেশ বলা যাইতে পারে যে, যাঁহাদের মনে অনুরাগ এবং বুদ্ধি উভয়ের যথোচিত সামঞ্জস্য আছে, তাঁহারাই সকল অপেক্ষা কম ঠকেন। প্রেম-শূন্য বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে, তাহা অতিবুদ্ধি! জ্ঞান-শূন্য প্রেম প্রেমই নহে, তাহা জড়-আসক্তি; জ্ঞান এবং প্রেমের সামঞ্জস্যই ধর্মের দৃঢ় ভিত্তি-মূল। যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম এতদিন শুষ্ক জ্ঞানের ধর্ম ছিল, এখন নূতন বৈষ্ণবদিগের উত্তেজনায় তাহা প্রেমের ধর্ম হইতেছে, তাঁহারা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থের যে কোন একটি পত্র উল্টাইবেন সেই পত্রেই তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে; এরূপ সত্বেও উক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "আমরা দেখিতেছি, যে, ব্রাহ্মধর্ম ক্রমশঃ জ্ঞানাপেক্ষা প্রেমের অধিক সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এইটি ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত উন্নতি বলিয়া বোধ হয়।" এ কথার আমরা কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন কালেই এরূপ কোন বাক্য বলেন নাই যাহাতে জ্ঞানকে প্রেম অপেক্ষা বড় বুঝায় বা প্রেমকে জ্ঞান অপেক্ষা বড় বুঝায়; আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে কুতর্ক প্রভৃতির বিরুদ্ধে অনেক স্থলে অনেক কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু কোন স্থলেই জ্ঞানের গুণ-লাঘব করা হয় নাই,—অন্ধ ভক্তির বিরোধে অনেক স্থলে অনেক কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু কোন স্থলেই বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির গুণ-লাঘব করা হয় নাই। ধর্মরূপ গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে—জ্ঞান এবং প্রেম দুইই চাই; জ্ঞান যদি না থাকে তবে ঐ গৃহের পত্তন ভূমি কোথায়? প্রেম যদি না থাকে তবে উহার প্রয়োজন কোথায়? গৃহের পত্তন ভূমি এবং প্রয়োজন দুইই যখন সমান আবশ্যক তখন জ্ঞান প্রেম দুয়ের একটিকে খাটো করিয়া আর একটিকে বাড়াইতে যাওয়া বিষম বিভ্রাট। বর্ত্তমান উপদেশের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র-প্রকার। তাহার অভিপ্রায় সংক্ষেপে এই যে, প্রেমকে জ্ঞান দ্বারা দৃঢ় করা উচিত ও জ্ঞানকে প্রেম দ্বারা সজীব করা উচিত। বর্ত্তমান বিবাদের সার মীমাংসা এই যে, আত্মার মূল-প্রদেশে—আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রেমময়, ও বিষয়াতীত অমায়িক প্রেম জ্ঞানময়—দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই; এ বিষয়ে আমাদের সহিত সম্পাদক মহাশয়ের কোন মতভেদ নাই,—তাহা তিনি স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শুনিবা মাত্র আমাদের মন কেমন সহজে বিশ্বাস করিয়া ফেলে যে, "এই কথাই ঠিক্"! আনন্দকে আমরা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করি—আনন্দ যে কি তাহা আমরা জানি,—ইহা আমরা প্রত্যক্ষবৎ জানি যে, আনন্দই আমাদের সকল কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক—আনন্দই আমাদের সকল কার্য্যের চরম লক্ষ্য ; আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই সকলের মূলাধার—এ কথাটি জ্ঞানের কথা,—তথাপি ইহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইল না ; আর অদৃষ্টকে আমরা কখন জ্ঞান-দ্বারা উপলব্ধি করি না—আনন্দ যে কি তাহা আমরা জানি, অদৃষ্ট যে কি তাহা আমরা জানি না ; আনন্দের আকর্ষণ আমরা বুঝিতে পারি এবং তাহা কিরূপে কার্য্যের প্রবর্ত্তনা করে তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, অদৃষ্ট যে কি আকর্ষণে জগৎকে বশ করিয়াছে তাহা আমরা কিছুই বুঝি না—কস্মিন্ কালেও বুঝিতে পারিব না. আনন্দ যে মূল প্রবর্ত্তক পদের উপযুক্ত, ইহা আমাদের জানা কথা,—ইহা জ্ঞানের কথা, অদৃষ্ট যে, কোন কিছুর প্রবর্ত্তক, ইহা আমাদের না জানা কথা,—ইহা অজ্ঞানের কথা ;—জ্ঞানে যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে তাহা আমরা কখন বা উপেক্ষা করিয়া কখন বা উপহাস করিয়া কখন বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া অনায়াসে উড়াইয়া দিই, আর, জ্ঞানে যাহার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহারই প্রতি আমরা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সমর্পণ করি,—ইহা কি আমাদের আত্মার বিকার-দশা নহে? আমরা সত্যকে জানিয়াও সত্যকে ভালবাসি না—আমাদের জ্ঞানের সত্য আমাদের প্রাণের সত্য নহে—ইহাই আমাদের আত্মার বিকার-দশা! আমরা মিথ্যাকে না জানিয়াও মিথ্যাকে ভালবাসি—অজ্ঞানের মিথ্যাই আমাদের প্রাণের সত্য—ইহাই আমাদের আত্মার বিকার-দশা! জ্ঞানের প্রশস্ত পথের উপর আমাদের মনের মালিন্য উপেক্ষা অশ্রদ্ধা অযত্ন রাশীকৃত করিয়া সে পথকে আমরা যত দুর্গম করিয়া তুলিয়াছি—প্রকৃত পক্ষে তাহা তত দুর্গম নহে। শ্রদ্ধার অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান-পন্থীর মন পদে পদে সংশয় দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় ; সে বাধা অতিক্রম করিতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু একবার তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে সম্মুখের পথ চির কালের মত নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

প্রেমের পথ যদিও সহজ কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস নাই,—সে পথ জলপথের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে,—অনুকূল বায়ু বহিল তো তাহা দিব্য সুগম, প্রতিকূল বায়ু বহিল তো তাহাতে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। কুসঙ্গের আবর্ত্তে ও কুতর্কের ঝঞ্ঝাবাতে ঈশ্বর প্রেমার্দ্র সরল অন্তঃকরণ মোহে নিমগ্ন হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি কুসঙ্গের ভিতরের ভাব বুঝিয়াছেন—বন্ধুতার অবগুণ্ঠনের মধ্যে স্বার্থপরতার বিষদন্ত এবং পাপাসক্তির কলঙ্ক-লেখা অবলোকন করিয়াছেন,—যিনি কুতর্কের ভিতরের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন,—বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্যের আড়ালে অবিদ্যার তমো ঘনীভূত দেখিয়াছেন, তাঁহার সে ভয় নাই ;—তাঁহার একমাত্র ভয়ের কারণ এই যে পাছে সংসারের অসারতা-জ্ঞানই তাঁহার জ্ঞানের চরম সীমা হয়—ও প্রেম তাঁহার হৃদয় হইতে পলায়ন করে; পাছে তাঁহাকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় যে, অনেক কুতর্ক ও সংশয় খণ্ডন করিয়া যদি বা সত্যের কূলে উপনীত হওয়া গেল—ঈশ্বর-প্রেমের অভাবে এখন দেখিতেছি যে, চারিদিকে কেবল জীবন-শূন্য মরুভূম প্রসারিত রহিয়াছে,—আমার এতদিনের এত যে পরিশ্রম, সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল। এই জন্য ব্রাহ্ম মাত্রেরই দুইদিকে সাবধান হওয়া উচিত—

(১) যেন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জ্ঞানকে অন্তঃকরণ হইতে নির্ব্বাসিত না করেন, (২) যেন বিদ্যামদে উন্মত্ত হইয়া প্রেমকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত না করেন।

সংসার চালাইতে হইলে যেমন আয় ব্যয় উভয় কার্য্যেই নিপুণ হওয়া আবশ্যক, ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সেইরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন এবং প্রেমবিতরণ দুই কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানকে যদি মনের ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখা যায়, অথবা লোককে দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে তাহাকে প্রকাশ্যে বাহির করা যায়, তবে কৃপণের ধনের ন্যায় তাহার থাকা না থাকা সমান; কিন্তু জ্ঞানের আশ্বাস-বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমরা যদি ঈশ্বরেতে রীতিমত প্রেম সমর্পণ করিতে পারি—জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন কার্য্যে যদি জ্ঞানকে রীতিমত খাটাইতে পারি—তবেই আমাদের জ্ঞান সার্থক হয়।

সাংসারিক কর্ম্মের যেমন তিনটি অঙ্গ আয় ব্যয় এবং স্থিতি, আধ্যাত্মিক সাধনেরও সেইরূপ তিনটি অঙ্গ,—ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন, ব্রহ্মে প্রীতি সমর্পন, এবং ধর্ম্মে স্থিতি। যতক্ষণ আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকি—পরম সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকি—ততক্ষণই জ্ঞান জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাহার পরে তাহা মনোমধ্যে বিলীন হইয়া সংস্কার-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি আবার যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরেতে প্রেম সমর্পণ করি, ততক্ষণই আমাদের প্রেম জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাহার পরে তাহা সংস্কার-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের প্রতি যদি আমাদের লক্ষ্য থাকে তবে যেখান হইতে যে কোন সত্য প্রাপ্ত হই তাহা ঈশ্বরের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই, আর, যেখানে যাহার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম প্রদান করি তাহা ঈশ্বরকেই প্রদান করি। ঈশ্বরের নিকট হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন এবং ঈশ্বরেতে নিঃস্বার্থ প্রীতি সমর্পণ এই দুই কার্য্যের সংস্কার যখন আমাদের আত্মাতে বদ্ধমূল হয়—তখন সেইরূপ সংস্কার প্রকৃষ্টরূপে ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য। জলের ধর্ম্ম যেমন শৈত্য এবং অগ্নির ধর্ম্ম যেমন উত্তাপ, সেইরূপ, মোহমুক্ত আত্মার ধর্ম্মই—পরম সত্যজ্ঞান উপার্জ্জন এবং বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেম বিতরণ। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মপ্রীতির সংস্কার যখন মনোমধ্যে বদ্ধমূল হয়, তখন মন স্বভাবতই সত্যের দিকে ধাবিত হয় ও কার্য্য স্বভাবতই মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়—ইহারই নাম ধর্ম্ম। মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম,—সত্যজ্ঞানের উপার্জ্জন এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের বিতরণেই মনুষ্যত্ব—সুতরাং ইহাই ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে এবং তিনি যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ইহাতে ঈশ্বরেতে প্রীতি সমর্পণের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে। ঈশ্বরোদ্দেশে নিঃস্বার্থ ভাবে জগতে প্রেম বিতরণ করিলে তাহা ঈশ্বরেতেই সমর্পণ করা হয়। প্রীতির উত্তেজনায় কেহ যদি কোন ব্যক্তিকে একটি মূল্যবান অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন, তবে তাঁহার সে দানকে অঙ্গুরীয়ক-দান না বলিয়া প্রেম-দান বলাই সঙ্গত—কেন না অঙ্গুরীয়ক কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র, তিনি যদি গর্ব্বের উত্তেজনায় ঐ অঙ্গুরীয়কটি প্রদান করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সে দান দানই হইত না—তাহা অঙ্গুরীয়কের বিনিময়ে দাতৃত্ব-গৌরব ক্রয় করা মাত্র, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম

বলেন "শ্রদ্ধয়া দেয়ং" শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। দান মাত্রই প্রেম দান, তদ্ভিন্ন আর যে কোন দান তাহা দানই নহে—তাহা ক্রয় বিক্রয় মাত্র। আমরা ঈশ্বরকে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না—ঈশ্বর আমাদের প্রেম ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না,—আত্মার সহিত পরমাত্মা প্রেমসূত্রেই গ্রথিত।

সংসারের সুখদুঃখে, ভয়-লোভে, সম্পদ বিপদে, ঈশ্বর-প্রীতি যখন বিচলিত হয়, তখন তাহাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক হয়। জ্ঞানের নিকট হইতে আমরা বিবেক প্রাপ্ত হইতে পারি। অস্থায়ী সুখদুঃখের সহিত নিত্য ব্রহ্মানন্দের কি প্রভেদ, ভয়-লোভের সহিত নিঃস্বার্থ প্রেমের কি প্রভেদ, সম্পদ বিপদের সহিত অক্ষয় চির সম্পদের কি প্রভেদ, জ্ঞানই তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারে। জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা যদি সুখদুঃখের চঞ্চল তরঙ্গ কাটাইয়া আত্মার অন্তরতম অটল ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করি, ভয় লোভের স্রোত অতিক্রম করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের আকর্ষণে মনকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করি, সম্পদ বিপদের আবরণ ভেদ করিয়া পরব্রহ্মের অভয়-পদ আশ্রয় করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা আনন্দ-ময় অনন্ত জীবনের পথে অবশ্যই অগ্রসর হই। জ্ঞানের প্রসাদে যখন মনের স্থৈর্য্য হয়, তখনই ঈশ্বর-প্রীতি নিরুদ্বেগে স্বীয় অভীষ্ট পথে ধাবিত হয় নচেৎ তাহা সম্ভবে না। সত্যজ্ঞান এবং নিঃস্বার্থ প্রেম এই দুয়ের সঙ্গম-স্থানই ধর্ম্মের প্রস্রবণ।

আইস আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি "দেহি জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহি প্রীতি—শুদ্ধ প্রীতি, তুমিই মঙ্গল-আলয়। ধৈর্য্য দেহি বীর্য্য দেহি, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহি বিবেক বৈরাগ্য দেহি দেহ ও-পদ আশ্রয়।" ঈশ্বর স্বয়ং যে জ্ঞান মনুষ্যে মনুষ্যে বিতরণ করিতেছেন, তাহাই দিব্য জ্ঞান; তিনি যে প্রীতির প্রস্রবণ মনুষ্য-হৃদয়ে উন্মুক্ত করেন, তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি; এবং তিনি যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাহাই সনাতন সার ধর্ম্ম,—তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া দুঃখ-শোকময় সংসারের মধ্যে আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—শুষ্ক মরুভূমিতে প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন—ভয়-বিপদের অন্ধকারে অমৃত অভয় জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। আইস আমাদের প্রাণদাতা এবং জ্ঞানদাতা পরম পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহার সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম—তাঁহার সেই অমৃত আশীর্ব্বাদ—মস্তকে ধারণ করি, সেই জ্ঞানাঞ্জনে মনশ্চক্ষু অঞ্জিত করি, সেই শোকতাপহারী সঞ্জীবনী সুধা হৃদয়ে লেপন করি,—তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্ম নীতি।

উপক্রমণিকা।

নীতির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

নীতি ধর্ম্মোন্নতির ভিত্তিভূমি। নীতি সম্বন্ধে উন্নতি লাভ না করিলে ঈশ্বর-বিশ্বাস ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্তিতে উন্নতি লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি রিপুগণের তাড়নায় অস্থির, যে ব্যক্তি অপবিত্র চিন্তায় নিমগ্ন, যে ব্যক্তি পাপ-কার্য্যে রত, ঈশ্বরে তাহার জ্বলন্ত অটল বিশ্বাস থাকিতে পারে না। এ প্রকার ব্যক্তির ঈশ্বরের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সে ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস

স্থাপন করিবে কিরূপে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকারে নৈতিক-অবনতি-গ্রস্ত লোকের প্রবৃত্তি হয় না। নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে, পাপ হইতে যিনি যত দূর বিরত হয়েন, তিনি ঈশ্বরে ততদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। পাপচিন্তা, পাপকামনা যাঁহার আত্মাকে কলুষিত করে, যিনি পাপ-কর্ম্মে রত হয়েন তাঁহার আত্মায় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সর্ব্বদা অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি পাপচিন্তা, পাপকামনা ও পাপকার্য্য হইতে এককালে বিরত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস সর্ব্বদা পূর্ণাকারে বিরাজ করে, সর্ব্বদা অচল, অটল, স্থির থাকিয়া তাঁহার শরীরকে দেবমন্দির করিয়া তুলে। ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে যেমন, ঈশ্বর প্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধেও তেমনি। পাপীর হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্তির স্থান হয় না। যিনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল, যিনি পবিত্রতার পূর্ণ আদর্শ, দুশ্চরিত্র ব্যক্তির আত্মা তাঁহাকে প্রীতি করিতে, ভক্তি করিতে, পারিবে কিরূপে। পাপের প্রতি যাহার কিঞ্চিন্মাত্র প্রেম আছে, ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বরকে সে প্রকৃত রূপে হৃদয়ের সহিত কি প্রকারে প্রেম করিতে পারিবে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদা ঈশ্বর-ভক্তির কথা বলিতেছেন, কিম্বা ঈশ্বর-প্রেমের গান গাহিতেছেন, হয়ত ঈশ্বর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দিতেছেন, কিম্বা দশা প্রাপ্ত হইতেছেন, অথচ নীতি বিষয়ে উন্নত নহেন,— হয় কাম-রিপুর সেবক, নয় লোভ-পরতন্ত্র, নয় স্বার্থপর, নয় নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। এ প্রকার লোকের হৃদয়ে অকপট প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি বা প্রেম জন্মায় নাই। ইহাঁদের ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াও স্থান প্রাপ্ত হয় না। যাঁহাদিগের একদিকে ঈশ্বরপ্রীতি ও ভক্তি লাভ করিবার বাসনা, অপর দিকে পাপ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতি ও ভক্তি স্থাপন করিবার দিকে গমন করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এজন্য তাঁহারা সকলের সাধুবাদও পাইতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহারা পাপ হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইবেন, যতক্ষণ না তাঁহারা পাপচিন্তা, পাপকামনা, পাপালাপ, ও পাপকার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবেন, ততক্ষণ তাঁহারা আত্মায় পূর্ণমাত্রায় প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি ও ভক্তি লাভ করিতে পারিবেন না।

আমাদিগের প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন যে কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ইহা অতি গভীর সত্য। মানুষ যেমন উচ্চ নীতির অনুযায়ী পুণ্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকে, সেই প্রত্যেক পুণ্যকর্ম্ম-সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্ত মার্জ্জিত ও উন্নত হইতে থাকে। আবার যেমন চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে ও আত্মা পবিত্র হইতে থাকে, তেমনি আত্মার দৃষ্টি পরিমার্জ্জিত হয়, মানব তখন ঈশ্বরকে দেখিতে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে থাকে। পবিত্র ঈশ্বর পবিত্র-চরিত্র মানবের সম্মুখেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যিনি পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, পবিত্র না হইলে তাঁহাকে জানা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সকল পাপ, সকল অপবিত্রতা হইতে বিমুক্ত না হইলে সেই অনন্ত পবিত্র স্বরূপের পবিত্রময় ভাব কিরূপে হৃদয়ে ধারণা করা যাইতে পারে? অতএব দেখ, এই নীতি পালন দ্বারা আমরা যে কেবল ঈশ্বরে প্রকৃত ভক্তি ও প্রেম স্থাপন করিতে

সমর্থ হই তাহা নহে, তাঁহার অনন্ত প্রেমময় ভাব, তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও করুণা, তাঁহার অনন্ত পবিত্র স্বরূপ, ইহজন্মে যতদূর জানা সম্ভব তাহা জানিয়া, এ জীবনে আমরা যতদূর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি তাহা লাভ করিয়া, কৃতার্থ হই।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক হইতে গেলে সম্পূর্ণরূপে নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। নীতির সর্ব্বোচ্চ সীমায় আমরা উঠিতে পারি না বলিয়াই আমরা ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিতে পারি না। ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিবার জন্য নীতির সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহন করা আবশ্যক। ধর্ম্মোন্নতির উপর যখন নীতির এরূপ প্রভাব, নৈতিক উন্নতি যখন ধর্ম্মোন্নতির সোপান, তখন প্রত্যেক ধর্ম্মোন্নতি-সাধনাকাঙ্ক্ষীর নীতি পালনের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্ম-নীতি অতি সুন্দররূপে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ সচরাচর পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় নহে, ইহা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের তত্ত্বপূর্ণ গভীর-জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক। এইরূপ গ্রন্থ এতদ্দেশে কিম্বা অন্য দেশে সুপ্রাপ্য নহে। ভক্তিমান ও চিন্তাশীল লোকের পক্ষে ইহা চিন্তার ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দেয়। ইহার ভাষাও যেমন উদার, ভাবও তেমনি উদার। ইহাতে বাহ্য জগৎ ও মানবাত্মার প্রকৃতি, মুক্তি, উপাসনা ও ধ্যান বিষয়ে যেমন নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তেমনি মানুষের নৈতিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় গভীর তত্ত্ব সকল পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সংস্কৃত বেশ দেখিয়া অনেকে আকৃষ্ট না হইতে পারেন কিন্তু ইহার উপদেশ বাক্য সকল যে গভীরতর ও হৃদয় বিদ্ধকারী তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মগণ অদ্যাপি সম্যক রূপে এই গ্রন্থের মর্য্যাদা বুঝেন নাই, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে লোকের অনুষ্ঠেয় সমস্ত নীতি ব্যাখ্যা করিব।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা।

যাহার উপাদানস্থলে, শরীর মন ও আত্মা এই তিনের উপযোগী তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আর যাহাতে এই তিনটী উপেক্ষিত হয় তাহা অসম্পূর্ণ ও অনুদার শিক্ষা। তদ্দ্বারা জনসমাজের কোন উপকার হয় না। এই মূল নিয়ম ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে শিক্ষা অতি নির্দ্দোষ ছিল। ইহকাল ও পরকালের শুভ লক্ষ্য করিয়া এই শিক্ষা প্রদত্ত হইত। ইহা যেমন মনুষ্যকে জনসমাজের উপযোগী করিবার জন্য তেমনি যে সমস্ত উপকরণ পরলোকের সহায় ও সম্পদ হইবে মনুষ্যকে তাহারও জন্য প্রস্তুত করিয়া দিত। সুতরাং এই শিক্ষা পূর্ণ ও উদার। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক আর্য্য সমাজে ইহা কি প্রণালীতে প্রদত্ত হইত এক্ষণে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

আমরা দেখিতেছি প্রাচীন ভারতে শিক্ষার মূলেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য। ঋষিরা একটী আট বৎসরের শিশুকে কেন যে এই ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিতেন, কোমল শরীলতাকে কেন যে অসি-পত্র ধারায় ছেদন করিতেন তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে তৎকালে গৃহস্থের গৃহ-ধর্ম্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠিত ও রক্ষিত হইত তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া নিরর্থক বোধ হয় না। তখনকার গার্হস্থ্যটী কি? আমরা দেখিতে পাই গার্হস্থ্যের যে সকল

নিয়ম ছিল তাহার মূল উদ্দেশ্য স্বার্থত্যাগ ও পরার্থসাধন। এইটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা নাই। গৃহস্থের নিত্য কার্য্য এই বিষয়ে পর্য্যাপ্ত। এই সকল কার্য্যের মধ্যে পঞ্চ যজ্ঞই সর্ব্বপ্রধান। প্রথম ব্রহ্মযজ্ঞ, বিদ্যাদান একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার। দ্বিতীয় পিতৃযজ্ঞ, তর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকের উপকার। তৃতীয় দেব-যজ্ঞ, হোমাদি দ্বারা দেবগণের ও তৎসঙ্গে মনুষ্যলোকের উপকার ১। চতুর্থ ভূতযজ্ঞ, অন্নাদি বলিদ্বারা পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গের উপকার। পঞ্চম নৃযজ্ঞ,অতিথিসেবায় মনুষ্যের উপকার। এই সমস্ত কার্য্য কেবলই পরার্থ এবং গৃহস্থের মুখ্য কার্য্য। ইহা কিরূপ নিষ্ঠা ও আগ্রহের সহিত সাধিত হইত তাহা পুরাতত্ত্ববিৎগণের অবিদিত নাই। ফলত এইরূপ কথিত আছে যে গার্হস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য আশ্রম, কারণ ইহা প্রতিনিয়ত জ্ঞান ও অন্ন দ্বারা অন্যান্য আশ্রমের উপকারক হয় ২। যখন পরার্থই ইহার লক্ষ্য তখন যে ব্যক্তি আত্মসংযম না করিয়াছে গার্হস্থ্য তাহার পক্ষে নয় ৩। এ কথার আর ব্যভিচার নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীতে হয় তো ইহা একটী উপেক্ষার কথা কিন্তু তখনকার গার্হস্থ্যের ইহা প্রাণগত সত্য। ফলতঃ স্বার্থজয় না করিলে তখনকার কালে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অসম্ভব হইত। আরও একটু দেখ,আহার বিহার অবশ্য একটী নিজের স্বার্থ কিন্তু ইহাই বা কিরূপে নিয়মিত হইত। তখনকার প্রবাদ এক জনের নিমিত্ত অর্থাৎ নিজের নিমিত্ত পাক করা পাপ আহার করার তুল্য ৪। সুতরাং গৃহস্থকে অনেকের নিমিত্ত পাক করিতে হইত। তাই না হয় আগে ভাগে নিজের উদরপূর্ত্তিটা হউক,কিন্তু সে যোটীও ছিল না। অতিথিসেবা তো আছেই, তা ছাড়া বাড়ির ভৃত্যটীরও আহার না হইলে গৃহস্থ নিজে আহার করিতে পাইতেন না ৫। এতদ্ব্যতীত গার্হস্থ্যে ক্রোধাদি জয়েরও বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। একান্নভুক্ত পরিবার পরস্পর সদ্ভাবে থাকা বড় কঠিন কথা। ক্রোধকে প্রশ্রয় দিলে এবন্ধন থাকে না এবং ইহাতে ন্যায়ের রজ্জুও দৃঢ়তর রাখা চাই। এই জন্য সত্য ও প্রিয়বাক্য গৃহস্থের ঘৃত লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থের ন্যায় সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কথা আছে ৬। ফলত গার্হস্থ্য অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেমন পক্ষী দুই পক্ষযোগে আকাশে যায় সেইরূপ গৃহস্থ এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনরূপ তপস্যা ও জ্ঞান লইয়া সংসারে বিচরণ করিবেন ৭। ইহাতেই তাঁহার মুক্তি।

এখন বক্তব্য এই আত্মসংযম যাহার বীজমন্ত্র মনুষ্যকে কিরূপে সেই আশ্রমের উপযোগী করা যাইতে পারে। একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যায় যে ঋষিরা এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্যকে শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা শিক্ষার পৃষ্ঠাস্থি। ইহা দ্বারাই শিক্ষার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিধৃত রহিয়াছে এবং ইহারই বলে গার্হস্থ্যের কঠোর নিয়ম

(১) অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপগচ্ছতি
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ। মনু।
অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্য অর্থাৎ আকাশে বাষ্পরূপে উত্থিত হয়, পরে সূর্য্য বা আকাশ হইতে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি ফলশস্যাদি উৎপন্ন করিয়া প্রজারক্ষা করিয়া থাকে। হোমের এইরূপ উপকারিতা।

(২) যস্মাৎ ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী। মনু।

(৩) যোহধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ। মনু।

(৪) অঘং স কেবলং ভুঙ্ক্তে যঃপচত্যাত্মকারণাৎ। মনু।

(৫) ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈবহি
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাৎ অবশিষ্টন্তু দম্পতী।
গৃহস্থঃ শেষভুক ভবেৎ। মনু।

(৬) তৃণানি ভূমিরুদকং বাক চতুর্থী চ সূনৃতা।
* * * * গৃহস্থস্য নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।
মনু।

(৭) উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণো গতিঃ
তথা বিদ্যা তপোভ্যাং বৈ। ইত্যাদি। হারীত।

লোকের সুসাধ্য হইত। এস্থলে এই বিষয়টী নিম্নের যুক্তিপ্রণালী দ্বারা বুঝিলেই ঠিক্ হইবে।

জগতে দুই প্রকার পদার্থ আছে—কঠিন ও কোমল। এখানে পাষাণ আছে জলও আছে। রৌদ্র আছে জ্যোৎস্নাও আছে, পুরুষ আছে স্ত্রীও আছে, ক্রোধ আছে শান্তিও আছে। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব লইয়াই জগৎ। যিনি এই সকল ভাব বশীভূত করিয়া চলিতে পারেন তিনিই পুরুষ। আর যিনি তাহা না পারেন তিনিই তৃণের ন্যায় অসার ও অপদার্থ। যিনি গৃহস্থ জগতের এই দুই বিরোধী ভাবের সহিত তাঁহাকে অহর্নিশি দ্বন্দ্ব করিতে হইবে। বৈরাগ্য ও ভোগ, কঠোর ও কোমল দুইই তাঁহার সেব্য। কিন্তু ইহা বড় সহজ কথা নয়। মনুষ্যপ্রকৃতিতে কি দেখা যায়? কোন্‌টী তাহার উপযোগী? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে অগ্রে কাঠিন্য পরে কোমলতা তাহার উপযোগী। কাঠিন্য যাহার অভ্যস্ত হইয়াছে কোমলতায় সে অভিভূত হয় না। ভূতলে শয়ন যাহার অভ্যস্ত দুগ্ধফেনবৎ শয্যায় অবশ্যই সে সুখী হয় কিন্তু উহার অভাবে তাহার কাতরতা নাই, আবার কোমল শয্যা যাহার অভ্যস্ত, ভূতল তাহার অত্যন্ত কষ্টকর হয়, সে এই পূর্ব্বাভ্যাসের অভাব সহিতে পারে না। দুই সন্ধ্যা সামান্যরূপ আহার যাহার অভ্যস্ত রাজভোগ চর্ব্ব্যচোষ্য অবশ্যই তাহাকে সুখী করে কিন্তু ইহার অভাবে সে অভিভূত হয় না। আবার রাজভোগ যাহার অভ্যস্ত সামান্যরূপ আহারে তাহার তৃপ্তি নাই, সে পূর্ব্বভোগের অভাব সহিতে পারে না। ইহাই ত সাধারণ নিয়ম, এখন দেখ অগ্রে কঠিন পরে কোমল মনুষ্য-প্রকৃতির উপযোগী কিন্তু বিপরীত দিক্‌টা কোনও রূপে নয়। তবে যে কদাচ ইহার ব্যভিচার দেখা যায় তাহা শিক্ষার ফল। এখন বুঝ গৃহস্থের লক্ষ্য কি? না বৈরাগ্য ও ভোগ। কিন্তু যদি কঠোর বৈরাগ্য তাহার অভ্যস্ত না হয় তাহা হইলে কোমল ভোগ তাহাকে অভিভূত করিবে এবং তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য যে পরার্থকে স্বার্থ করা তদ্বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম হইবেন। কারণ স্বার্থই ভোগ এবং পরার্থকে স্বার্থ করা উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য। এখানেও এরূপ কথা উঠিতে পারে যে ভোগের মধ্য দিয়া বৈরাগ্য অসম্ভব নয়। অবশ্য তাহাও সম্ভব বটে কিন্তু সেটাও শিক্ষার ফল। যাহা শিক্ষাসাপেক্ষ তাহার ঘটনা বিরল। এস্থলে আরও একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। ভোগ হইতে যে বৈরাগ্য তাহা প্রকৃত বৈরাগ্য নয়, ঔদাস্য। কারণ বৈরাগ্য অতৃপ্তি হইতে জন্মে না, অনিচ্ছা বা অপ্রবৃত্তি হইতেই তাহা হয়। প্রাচীন ভারত তাহা বুঝিয়াছিল এবং আগে হইতেই প্রবৃত্তির বীজ সমূলে ছেদন করিয়াছিল। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য।

এই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট থাকাতে আর একটী বড় সুফল ফলিয়াছে। তাহা ভারতের জ্ঞান ও কবিত্ব। সৌন্দর্য্যের দুইটী শক্তি আছে—উন্নয়ন ও অবনয়ন। যাহার যেরূপ শিক্ষা সৌন্দর্য্য তাহার মনে সেইরূপ কার্য্য করে। একটী পুষ্প কাহারও মনে অলৌকিক ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয় এবং তাহাই আবার কাহারও ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার আলম্বন হয়। পৃথিবীর সকল প্রকার বীরত্বে যাঁহার দৃষ্টি সৌন্দর্য্য তাঁহাকেই উন্নীত করে আর সেইটুকু যাঁর অভাব তিনিই অধোনরকের ভীষণ আবর্ত্তে ঘূর্ণমান হন। ঋষিরা প্রকৃতির স্বহস্ত-নির্ম্মিত রমণীয় উদ্যান, কলনাদী নদী, বিহঙ্গকূজিত গিরিশৃঙ্গ, পূর্ণকল চন্দ্র, সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল প্রভৃতি কবিদিগের বর্ণনীয় পার্থিব এই সমস্ত ভোগোপকরণের মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহারা

ইহার মধ্যে আত্মহারা হইতেন কিন্তু আত্মার বিনাশ সাধন করিতেন না। তাই তাঁহাদের আত্মার মধ্য হইতে জ্ঞান ও কবিত্ব পরিস্ফুট হইয়া পড়িত। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের ফল।

আমরা প্রথমে বলিয়াছি শিক্ষার তিনটী অঙ্গ শরীর, মন ও আত্মা। ব্রহ্মচর্য্য এই শিক্ষার পৃষ্ঠাস্থি। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের বিধি নিষেধ গুলি আলোচনা করিলে এই তিন প্রকার শিক্ষা যে ইহা দ্বারা নিয়মিত হইত তাহা সহজেই প্রমাণ হইবে। প্রথম শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষার্থী ছাত্র যথাকালে গুরুকুলবাস স্বীকার করিলে তাঁহাকে অনেকগুলি নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হইত। গুরুর নিদ্রা ভঙ্গের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান ১ দূর হইতে সামধ আহরন ২ ভিক্ষার্থ পর্য্যটন ৩, জলকলশ বহন, পুষ্পচয়ন ৪, গোচারণ ৫ অধঃশয্যায় এবং একাকী শয়ন ৬ এই সমস্ত নিয়ম শারীরিক শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট। প্রভাতে বীরবায়ু সেবন ও ব্যায়ামে শরীরের যে উপকার হয় এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে কতকগুলি দ্বারা তাহাই হইত। একাকী এবং অধঃশয্যায় শয়নে বিশেষ উপকারিতা আছে। অন্যের সহিত শয়ন করিলে নিশ্বাসযোগে তাহার প্রশ্বাসের দূষিত বায়ু গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে শরীর অসুস্থ হয়। আর কাঠিনের সহিত সঙ্ঘর্ষে কোমল কাঠিন হইতে থাকে, সুতরাং শুষ্কভূমি বা প্রস্তরোপরি শয়ন করিলে শরীর দৃঢ় হয় ইহাই অধঃশয্যায় শয়নের তাৎপর্য্য। পরে কামত ও অকামত তেজোধাতুর নিরোধ। কামত তেজোধাতুর ক্ষয়ে ব্রতভঙ্গ হইত। ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। যদি ব্রহ্মচারী কামত ব্রতভঙ্গ করেন তাঁহাকে গর্দ্দভ চর্ম্ম পরিধান করিয়া স্বীয় গর্হিত কর্ম্ম প্রখ্যাপন পূর্ব্বক সাতটা বাড়িতে ভিক্ষা করিতে হইত ৭। আর অকামত তেজোধাতুর ক্ষয় হইলে 'পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং' এই মন্ত্রটী জপ করিতে হইত। এস্থলে দুই প্রকার পাপে দুইটী প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি। ইহার মধ্য হইতে পাওয়া যায়—অনুতাপ ও সাবধানতা। দীনবেশে স্বকৃত কুকর্ম্ম প্রখ্যাপন করিয়া বেড়ান বড় সামান্য অনুতাপের কর্ম্ম নয়। পাপের বিষজ্বালা যাঁহার অন্তর দগ্ধ করে সেই ব্যক্তিই সরলভাবে স্বকৃত পাপ অন্যের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে। আর যে ব্যক্তির তাহাতে সঙ্কোচ হয় সেইই গোপন করে। দ্বিতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রের অর্থ প্রভৃতি দ্বারা কেবল সাবধানতাই অভিব্যক্ত হয়। এখনও এইরূপ দুর্বিপাকে একটী বৃক্ষপত্রে পবিত্র মাতৃনাম লিখিয়া শয্যার প্রান্তে রাখিয়া থাকে।

মস্তকমুণ্ডন বা জটাযূট ধারণ ৮। এইরূপ বিকল্পের অবশ্যই কোন অভিপ্রায় আছে। আপাতত বোধ হয় এই দুই প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মচারীর আহার্য্য শোভার ব্যাঘাত করাই উদ্দেশ্য কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও কিছু থাকিতে পারে। অধ্যয়নে চিন্তা আছে। চিন্তার সময় মস্তিষ্কের মধ্যগত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরায় একপ্রকার গতি জন্মে। গতি হইতে উত্তাপ

(১) গুরোঃপূর্ব্বোত্থানং। বিষ্ণু সূত্র।

(২) দূরাদাহৃত্য সমিধঃ। মনু।

(৩) গুরুকুলবর্জ্জং গুণবৎসু ভৈক্ষ্য চরণং। বিষ্ণু সূত্র।

(৪) উদকুম্ভং সুমনসঃ ইত্যাদি। মনু।

(৫) মহাভারতে প্রসিদ্ধ আয়োদধৌম্যের উপাখ্যান দেখ।

(৬) একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র। মনু।
অধঃ শয্যা। বিষ্ণু সূত্র।

(৭) কামতো রেতসঃসেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুঃ ধর্ম্মজ্ঞাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ।
এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভাজিনং।
সপ্তাগারং চরেৎভৈক্ষ্যং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্।
বিষ্ণু সূত্র।

(৮) ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যং।

ও তদ্দ্বারা শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। বোধ হয় ইহার প্রতিকার নিমিত্ত মস্তকমুণ্ডনের প্রথা ছিল। অর্থাৎ শীতল বায়ু অবাধে মস্তকের উপর বহিতে পাইলে চিন্তাজনিত কোনরূপ পীড়া না হইয়া বুদ্ধিস্ফূর্ত্তির সহায়তা করিতে পারে। পণ্ডিতেরা ললাটের অব্যবহিত উর্দ্ধ স্থানটীকে বুদ্ধিতত্ত্ব কহিয়া থাকেন। এই বুদ্ধিতত্ত্ব প্রসন্ন রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা। হয় তো এই জন্যই এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মস্তকমুণ্ডন করেন এবং গ্রীক জ্ঞানীরা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ঐস্থান কেশশূন্য করিতেন। আর বিকল্পিত জটাবহনেরও কিছু অর্থ থাকিতে পারে। মস্তকে জটা বা অধিক কেশ তাড়িত রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা শরীর মন তুষ্ট সুস্থ হয়। কিম্বা এমনও বুঝিতে পার ব্রহ্মচর্য্যে ছত্র নিষিদ্ধ[১]। কৃষ্ণবর্ণের উত্তাপ বিক্ষেপের শক্তি আছে। গোচারণ-ক্ষেত্রে ছত্রহীন ছাত্রকে কৃষ্ণ জটাযূটই প্রখর সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিত। যাহাই হউক, ব্রহ্মচর্য্যের এই সমস্ত বিধি নিষেধ যে শারীরিক শিক্ষার অনুকূল তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

ব্রহ্মচারীর মধুমাংস নৃত্যগীত ও কৃত্রিম লবণ নিষিদ্ধ[২]। মধুমাংসে শারীরিক উত্তাপ ও তাহার সঙ্গে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মচর্য্যে রজস্তমের একান্ত অভিভবই আবশ্যক। নচেৎ বিষয়বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। ইহা যেমন শারীরিক শিক্ষার প্রতিকূল তেমনি আধ্যাত্মিক শিক্ষারও প্রতিকূল। এই জন্য ইহা নিষিদ্ধ ছিল। অনেকে মনে করেন নৃত্যগীত একটী নির্দ্দোষ আমোদ। নির্দ্দোষ বটে কিন্তু ছাত্রদিগের পক্ষে নয়। আমোদপ্রিয় হইলে অধ্যয়নের যোগভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আরও একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। নৃত্যে দর্শনের সার্থকতা, গীতে শ্রবণের চরিতার্থতা। গীত বলিলেই ধর্ম্মসঙ্গীত এবং নৃত্য বলিলেই চৈতন্যদেবের নৃত্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। একটু নিম্নদৃষ্টিতে এই নৃত্যগীতের কথা ভাবিলে বোধ হয় দর্শন ও শ্রবণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই ইহার লক্ষ্য। অনেকেই চক্ষু কর্ণের দ্বার ছাড়াইয়া নৃত্যের প্রয়োগকৌশল ও গীতের কবিত্বে পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের তাহা নিষিদ্ধ। ইহাতে ভোগবাসনা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

লবণ সকল দেশেরই একটী প্রধান খাদ্য কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে তাহা কেন নিষিদ্ধ তাহা অনুমান করা বড় কঠিন। কিন্তু ইহা অপকারক পদার্থ না হইলে এরূপ নিষেধ কেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে বিশেষ কি আছে জানি না কিন্তু এদেশে মসুর্য্য-বীজে যখন টীকা দিবার প্রথা ছিল, তখন চিকিৎসকেরা অগ্রে অলবণ আহার ব্যবস্থা করিত। এখনও কোন কোন কঠিন রোগ এই অলবণ আহারে চিকিৎসিত হইতে দেখা যায়। ফলত লবণ একটী ঔষধ। যাহা ঔষধ তাহার দৈনিক ব্যবহার সঙ্গত নয়। কারণ যে বস্তু রোগ প্রতীকার করে সহজ অবস্থায় তাহারই আবার রোগ আনয়নের শক্তি আছে। কিন্তু ইওরোপীয় চিকিৎসায় এই লবণ সম্বন্ধে একটু বিশদ ব্যাখ্যা দেখা যায়। ডাক্তার গ্রেহেম বলেন লবণ সম্পূর্ণ একটী অপুষ্টিকর পদার্থ। উহা কিছুতেই জীর্ণ হয় না। উহা কোনরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে অবিকৃতভাবে রক্তের সহিত মিশিয়া অবি-

১ অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষোরুপানৎ ছত্রধারণং ইত্যাদি। মনু।

২ ক্ষারলবণমধুমাংসানি ... নৃত্যগীতস্ত্রীমধুমাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্টপ্রাণিহিংসাশ্লীলপরিবর্জনম্। বিষ্ণুসূত্র।

কৃত অবস্থাতেই রক্ত-প্রবাহ-যোগে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। পরে শ্বাস-যন্ত্র মূত্রযন্ত্র ও লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। উহার তীব্রতা, পাকাশয়াদি যন্ত্রের গ্লানিজনক। ইহা দ্বারা পাকাশয়, অন্ত্র, শোষক শিরা, হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহিনী শিরা অযথারূপে উত্তেজিত হইয়া নানারূপ পীড়া জন্মাইয়া দেয়। লবণ দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। পরিপাক কার্য্যের নিমিত্ত যে পরিমাণ মিউরেটিক দ্রাবকের প্রয়োজন তাহার ক্লোরিণ উপাদান প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিজ খাদ্য হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। তন্নিমিত্ত কোন প্রকার লবণের প্রয়োজন নাই। এই লবণ ব্যবহারে কাশ ও চর্ম্মরোগ জন্মে। ডাক্তার পার্কস প্রভৃতিও গ্রেহেমের সহিত একমত হইয়া বলেন অজীর্ণ রোগ ও যক্ষ্মা অলবণ আহারে দূর করা যায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে লবণ একটী বিসবৎ পদার্থ। ঋষিরা ইহা অবশ্যই জানিতেন কিন্তু তাঁহারা ছাত্রের পক্ষে কৃত্রিম লবণ দূষ্য বলিয়া সৈন্ধবাদিকে কেন যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

ক্রমশঃ

সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ত্রৈগুণ্যম্ ॥ ৪ ॥

গুণত্রয়ের নাম ত্রৈগুণ্য।১ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ,—এতন্নামক গুণত্রয়ের সমষ্টীভাব ত্রৈগুণ্য নামে অভিহিত হয়।

যাহা প্রকাশ-স্বভাব, যাহা লঘু, যাহা প্রসন্নতা তাহাই সত্ত্ব এবং তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। শরীরে ইহার অসঙ্গিত্ব, প্রতিতুষ্টি, (অনুকম্পা) জ্ঞান, তিতিক্ষা ও সন্তোষ প্রভৃতি অসংখ্যবিধ কার্য্য থাকিলেও অনেক প্রকার লক্ষণ থাকিলেও সংক্ষেপে সুখাত্মক বলিলে যথেষ্ট হয়।

ইন্দ্রিয়গণ যে সন্নিকৃষ্ট অর্থ অবভাসিত করে, প্রকাশিত করে, তাহা তাহারা স্বনিষ্ঠ সত্ত্বগুণের দ্বারাই করে। সত্ত্বাধিক্য হইতে শরীরের লঘুতা এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গ্রহণ-সামর্থ্য উদ্বুদ্ধ হয়। যে ধর্ম্ম থাকায় বস্তু প্রকাশিত হয় সে ধর্ম্মের নাম লঘুত্ব, এবং যে শক্তির দ্বারা বস্তু-যাথাত্ম্য প্রকাশ পায় সে ধর্ম্মের নাম প্রকাশকত্ব। এই দুই ধর্ম্ম সত্ত্ব নামক গুণের অসাধারণ স্বভাব। অতএব, লঘুত্ব ও প্রকাশকত্ব সত্ত্বগুণের লক্ষণ (অনুমাপক ধর্ম্ম)।

যাহা উপষ্টম্ভক, যাহা সংশ্লেষ-জনক, যাহা সক্রিয় অর্থাৎ যদ্বলে বস্তুতে স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহারই নাম রজঃ। সংশ্লেষ ও ক্রিয়া এই দুইটীই রজোগুণের কার্য্য, গুণান্তরের নহে। অতএব, প্রেরকত্ব ও সক্রিয়ত্ব এই দুই ধর্ম্মই রজোগুণের লক্ষণ। শরীরে ইহার দ্বেষ, দ্রোহ মৎসরতা, নিন্দা, শঠতা, দুঃখ প্রভৃতি অনন্তভেদ বা অসংখ্য লক্ষণ থাকিলেও সংক্ষেপে দুঃখাত্মক বলিয়া উক্ত হয়।

যাহা গুরু, যাহা ভারি, যাহা আবরক বা কার্য্য-প্রতিবন্ধক, তাহারই নাম তমঃ। শরীরে ইহার প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা ও বিষাদ বা মোহ প্রভৃতি অসংখ্য ভেদ বা অনন্ত কার্য্য থাকিলেও সংক্ষেপে মোহাত্মক বলিয়া উক্ত হয়। তমোগুণের দ্বারাই শরীর-গুরুত্ব ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ-শক্তি প্রতিবদ্ধ হয়। এতদ্রূপ অব্যক্ত অবস্থাপন্ন গুণত্রয়ের নাম ত্রৈগুণ্য। সাংখ্যাচার্য্যেরা অল্প কথায় নিম্নোক্ত প্রকার ত্রৈগুণ্য-লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

যাহা প্রকাশক তাহা সত্ত্ব, যাহা প্রবর্ত্তক তাহা রজ এবং যাহা ব্যামোহকারণ তাহা তমঃ।

---

১ তত্ত্ববোধিনী ৯ কল্প ২ ভাগ বৈশাখ।

সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ ।৫।

সঞ্চর অর্থাৎ উৎপত্তি, প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ প্রলয় বা বিলোপ। পূর্ব্বোক্ত ত্রৈগুণ্যই সঞ্চরের ও প্রতিসঞ্চরের কারণ।

সঞ্চর বা উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা শুন। সর্ব্ব জগতের আদি কারণ বা বীজীভূত, পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণান্বিত পদার্থ যাহা কেবল সত্ত্ব, রজ ও তম অর্থাৎ প্রকাশ শক্তি, প্রেরণ শক্তি ও গুরুত্ব শক্তির সম্মেলন বা সমষ্টি, ভাষা কথায় যাহাকে, বল, বাধা ও স্ফূর্ত্তি, এতৎত্রিয়ের অধিকরণ বা আধার বলিলেও বলা যায় তাহা হইতে পর পুরুষের বা অসংসারী আত্মার (চিৎশক্তির) অধিষ্ঠান বশতঃ প্রথমতঃ অষ্টগুণা বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব সঞ্চরিত বা উৎপন্ন হইয়াছিল। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহংকার তত্ত্বটী জন্মিয়াছিল। সেই প্রথমোৎপন্ন অহংকার তত্ত্বটী ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সাত্ত্বিক বৈকারিক (১), রাজস তৈজস (২), এবং তামস ভূতাদি (৩)। তন্মধ্যে যাহা সত্ত্বগুণের বিকার তাহা হইতে ইন্দ্রিয়, যাহা তমোগুণের বিকার—যাহার অন্য নাম ভূতাদি—তাহা হইতে তন্মাত্র, আর যাহা তৈজস অর্থাৎ যাহা রজো অংশের বিকার তাহা হইতেও ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদুযোগ্য তন্মাত্রা সকল) হইয়াছিল। সেই তন্মাত্র পদার্থ হইতেই এই সকল মহাভূত হইয়াছে; এতদ্রূপ উৎপত্তি-ক্রমের নাম সঞ্চর। এক হইতে অন্য সঞ্চরিত হয় বলিয়া সঞ্চর। সঞ্চরের বৈপরীত্যের নাম প্রতিসঞ্চর। অর্থাৎ যে যাহা হইতে সঞ্চরিত বা উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যুৎক্রমে সে তাহাতে প্রবেশ করিলে তাহা প্রতিসঞ্চর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সকল মহাভূত যখন লয় হইবে, অদৃশ্য হইবে, তখন ইহারা তন্মাত্রেই লয় হইবে, প্রবেশ করিবে, অদৃশ্য হইবে বা সুপ্ত হইবে। তন্মাত্র সকল ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিবে, বীজ ভাবে লুক্কায়িত হইবে। তন্মাত্র সকল অহঙ্কারে বিলীন হইবে, অহঙ্কার বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধি অব্যক্ততত্ত্বে একীভূত হইয়া যাইবে। অব্যক্ত অব্যক্তই থাকিবে, তাহার আর লয় হইবে না, কেন না তাহার লয়স্থান নাই। অব্যক্ত অনুৎপন্ন পদার্থ ও নিত্য, সেই কারণেই তাহার লয় কল্পনা নাই। সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর ব্যাখ্যাত হইল, এক্ষণে উৎপন্ন পদার্থের অন্য প্রকার বিভাগ শুনুন।

অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ।৬।

সমুদায় প্রাকৃতিক বিকারের অন্য তিন প্রকার বিভাগ আছে। যথা—কতক অধ্যাত্ম, কতক আধিভূত, কতক বা আধিদৈবত। অধ্যাত্ম কি? আধিভূত কি? এবং আধিদৈবতই বা কি; তাহা শুন।

বুদ্ধি পদার্থটী আত্মাশ্রিত, আত্মার সহিত ইহার অতি নৈকট্য আছে, সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বটিকে অধ্যাত্ম বলিয়া জানিবে। তাহার বিষয় অর্থাৎ বোদ্ধব্য বস্তু মাত্রই বহির্বর্ত্তী, ভূতভাবে অবস্থিত, এ নিমিত্ত বোদ্ধব্য বিকার মাত্রেই অধিভূত। ব্রহ্ম নামক শুদ্ধ চৈতন্যই বুদ্ধির দেবতা অর্থাৎ অনুগ্রাহক, তন্নিমিত্তই ব্রহ্মচৈতন্যকে আমরা আধিদৈবত বলি।

বুদ্ধিতত্ত্বের যাহা অহঙ্কার নামক বিকার তাহাই অধ্যাত্ম। যাহা তাহার বিষয় অর্থাৎ যাহা অহঙ্কর্ত্তব্য সে সকল বিষয় ভূত ভাবে ও বহির্বর্ত্তিভাবে অবস্থিত বলিয়া অধিভূত। এতদুভয়ের দেবতা বা অনুগ্রাহক রুদ্র; এনিমিত্ত আমরা রুদ্র দেবকে অধিদৈবত বা অহঙ্কারের দেবতা বলিয়া গণ্য করি। রৌদ্র ভাব প্রচণ্ডতা না থাকিলে অহঙ্কার থাকিতে পারেন না, তাহার কিছুও প্রস্ফুরিত হয় না। সুতরাং রুদ্রই অহঙ্কারের দেবতা অর্থাৎ অনুগ্রাহক।

সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন অধ্যাত্ম, তাহার বিষয় সকল অধিভূত, চন্দ্র তাহার দেবতা বা অনুগ্রাহক। চন্দ্রের সহিত মনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আছে। চন্দ্রের সহিত মন এমন এক অলক্ষ্য সূত্রে আবদ্ধ আছে যে আবদ্ধতা থাকাতে মন উত্তম রূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়—সে আবদ্ধতা সে সম্বন্ধ অতত্ত্বজ্ঞ মানব জানে না। চন্দ্রোদয় হইলে মন বিস্ফারিত হয়, প্রসন্ন হয়. মন চন্দ্রের নিকট হইতেই আপনার সঙ্কল্প বিকল্প-শক্তি প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র ভিন্ন মনের দেবতা বা অনুগ্রাহক আর কেহ নাই। চন্দ্রই মনকে অনুগ্রহ করে, তাই সে সঙ্কল্প করে অর্থাৎ ক্রিয়াবান হয়।

শ্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, তাহার বিষয় অর্থাৎ শ্রোতব্য সকল অধিভূত, দিক্ তাহার দেবতা বা অনুগ্রাহক। দিকের অনুগ্রহ না থাকিলে, দিগবোধ না থাকিলে, আবরণাভাবের (ফাঁকের) মর্য্যাদা না থাকিলে, শ্রোত্রেরক্তিশ হ্রাস হইয়া যাইত। দিগ্‌জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির অদূরে শব্দ উত্থাপন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এই তত্ত্বের অতাল্প যাথার্থ্য জানিতে পারিবে।

ত্বক্ অধ্যাত্ম, স্পৃশ্য সকল অধিভূত, বায়ু তাহার দেবতা বা অনুগ্রাহক। বাহ্য বায়ুর অনুগ্রহেই ত্বকের ত্বকত্ব বজায় থাকে, তাহার স্পর্শ-শক্তিরও আপূরণ হয়। বায়ু না থাকিলে ত্বকের স্পর্শ-শক্তি কি হইয়া যাইত তাহা বলা যায় না। এইজন্য বায়ুই ত্বকের দেবতা এবং বায়ুই অধিদৈবত ত্বক্।

চক্ষু অধ্যাত্ম, দ্রষ্টব্য সকল অধিভূত, সূর্য্য তাহার দেবতা বা অনুগ্রাহক। দ্রষ্টব্য না থাকিলে চক্ষু কি দেখিত? সূর্য্য না থাকিলে চক্ষু কাহার নিকট দর্শন-শক্তি বা দেখিবার সাহায্য পাইত? আলোকের সাহায্য ব্যতীত আলোকের অনুগ্রহ ব্যতীত চক্ষু কিছুমাত্র দেখিতে পান না, সুতরাং আলোকের আগার-স্বরূপ ঐ সূর্য্যই জীবের অধিদৈবত চক্ষু।

হস্ত অধ্যাত্ম, আদান অর্থাৎ গ্রহণ তাহার কার্য্য, সেই কার্য্যব্যাপ্ত বহির্বস্তুই অধিভূত এবং ইন্দ্র তাহার দেবতা। ইন্দ্রের অনুগ্রহ না থাকিলে হস্তের গ্রহণ-ক্ষমতা থাকিত না, ইহা অতাল্প বিবেক জ্ঞান হইলেই জানা যায়।

পদ অধ্যাত্ম, গন্তব্য সকল অধিভূত এবং বিষ্ণু তাহার দেবতা বা অনুগ্রাহক। বিষ্ণুর অনুগ্রহ ব্যতীত, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার ব্যাপকত্ব ব্যতীত ঐ পদের গন্তব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকিত না।

পায়ু ইন্দ্রিয়টী অধ্যাত্ম, উৎসৃষ্টব্য (মল মূত্রাদি) পদার্থ অধিভূত, মৃত্যু তাহার দেবতা বা অনুগ্রাহক। মৃত্যু অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুগ্রহেই (জীবন অনুগ্রহ, মরণ নিগ্রহ) পায়ুর উৎসর্জ্জন শক্তি অক্ষত থাকে।

উপস্থ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দয়িতব্য অধিভূত প্রজাপতি সকল অধিদৈবত। প্রজাপতি দেবতার অননুগ্রহে উপস্থেন্দ্রিয়ের আনন্দয়িতব্যত্ব থাকে না।

জিহ্বা অধ্যাত্ম, রসয়িতব্য বা আস্বাদ্য বস্তু সকল অধিভূত, বরুণ তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বরুণ দেব বা জলাধিপতিই অধিদৈবত রস।

নাসা অধ্যাত্ম, আতব্য অধিভূত, পৃথিবী তাহার অনুগ্রাহক দেবতা। পৃথিবীর অনুগ্রহ ব্যতীত ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পৃথিবীই গন্ধের ও গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের ক্ষতিপূরক)।

বাকইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য সকল অধিভূত, অগ্নি তাহার দেবতা বা অনুগ্রাহক। অগ্নির অনুগ্রহ, তেজের প্রেরণা বা কায়াগ্নির অভিঘাত না হইলে বাক্‌যন্ত্র পরিচালিত হয় না, কাযে কাযেই তেজ উহার দেবতা। এই

রূপে ত্রয়োদশ প্রকার অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিদৈব ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। (বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়) এতদ্রূপ আধুনিক ভাষা প্রাচীন অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিদৈবত এই সূত্রের প্রায় তুল্য।

যে নর এই সকল তত্ত্ব (বস্তু যাথার্থ্য), গুণের বা প্রকৃতির স্বরূপ ও অধিদৈবত অবস্থা যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ গোচর করিতে পায় সেই ব্যক্তিই পাপ-দোষ বর্জ্জিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া গুণভোগ করিতে পারে। তত্ত্বপাদ ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে অন্যান্য আধ্যাত্মিকী কথা শুন।

ধম্মপদ

১। পালী। মা পমাদমনুযুঞ্জেথ।
মা কামরতিসন্থবং।
অপ্পমত্তোহি ঝায়ন্তো
পপ্পোতি বিপুলং সুখং।

১। সং। মা প্রমাদমনুযুঞ্জীথা
মা কামরতিসংস্তবং।
অপ্রমত্তোহি ধ্যায়ন্
প্রাপ্নোতি বিপুলং সুখং।

অর্থ। প্রমত্ত হইবে না, কামক্রোধাদির বশীভূত হইবে না। অপ্রমত্ত সাধু ধ্যানযোগে বিপুল সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

২। পালী। অপ্পমত্তো পমত্তেসু
সুত্তেসু বহুজাগরো।
অবলস্সং বা সীঘস্সো
হিত্বা যাতি সুমেধসো।

২। সং। অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু
সুপ্তেষু বহুজাগরঃ।
অবলাশ্বমিব শীঘ্রাশ্বো
হিত্বা যাতি সুমেধাঃ।

অ। শীঘ্রগামী অশ্ব যেমন দুর্বল অশ্বকে অতিক্রম করিয়া যায়, সেইরূপ প্রমত্তের মধ্যে অপ্রমত্ত, নিদ্রিতের মধ্যে বহুজাগরণশীল, অগ্রসর হইয়া থাকেন।

৩। পালী। অপ্পমাদেন মঘবা
দেবানং সেট্ঠতং গতো।
অপ্পমাদং পসংসন্তি
পমাদো গরহিতো সদা।

৩। সং। অপ্রমাদেন মঘবা
দেবানাং শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
অপ্রমাদং প্রশংসন্তি
প্রমাদো গর্হিতঃ সদা।

অ। ইন্দ্র অপ্রমাদের বলে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন এবং প্রমাদ সততই গর্হিত।

৪। পালী। ফন্দনং চপলং চিত্তং
দুরক্খং দুন্নিবারয়ং।
উজুং করোতি মেধাবী
উসুকারো ব তেজনং।

৪। সং। স্পন্দনং চপলং চিত্তং
দুরক্ষ্যং দুর্নিবার্য্যং।
ঋজুং করোতি মেধাবী
ইষুকার ইব তেজনং।

অ। শরনির্ম্মাতা যেমন শরকে সরল করে সেইরূপ মেধাবী ব্যক্তি স্পন্দনশীল চঞ্চল অরক্ষণীয় দুর্নিবার চিত্তকে সরল করিয়া থাকেন।

৫। পালী। দুন্নিগ্গহস্স লহুনো
যত্থকামনিপাতিনো।
চিত্তস্স দমথো সাধু
চিত্তং দন্তং সুখাবহং।

৫। সং। দুর্নিগ্রহস্য লঘুনো
যত্রকামনিপাতিনঃ।
চিত্তস্য দমথঃ সাধু-
শ্চিত্তং দান্তং সুখাবহং।

অ। সাধু ব্যক্তি দুর্নিগ্রহ লঘু যথেচ্ছাগামী চিত্তকে দমন করুন। নিগৃহীত চিত্ত আত্মার সুখাবহ হয়।

৬। পালী। দূরঙ্গমং একচরং
অসরীরং গুহাসয়ং।

যে চিত্তং সঞ্জ্ঞমেষ্যন্তি
মোক্ষন্তি মারবন্ধনাৎ।

৬। সং। দূরংগমং একচরং
অশরীরং গুহাশয়ম্।
যে চিত্তং সংযমেষ্যন্তি
মোক্ষন্তে মারবন্ধনাৎ।

অ। যাঁহারা দূরগামী একচর অশরীরি গুহাশায়ী চিত্তকে সংযত করেন তাঁহারা মৃত্যুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর প্রার্থনা।

১৭৮৯ শক।

হে পরমাত্মন্! প্রীতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ, সে ভার সম্যক্‌রূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর। অন্যান্য বাগ্মী মহাত্মারা অধ্যাত্মযোগের মহোচ্চ সত্য সকল ঘোষণা করুন, অথবা কর্ত্তব্য জ্ঞানে বিরাজিত ঈশ্বরের প্রভাব কীর্ত্তন করুন, এ অকিঞ্চনের এই কার্য্য হউক যেন কেবল প্রীতিরূপ সুকোমল উপায় দ্বারা তোমার ধর্ম্ম প্রচার করে। এই অকিঞ্চন দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রীতি ভাবের বিশিষ্টরূপ সঞ্চার কিয়ৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, এ অকিঞ্চন যেন চিরকাল সেই মধুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে বয়স ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের শীতল ভাব যেন আমার আত্মাতে প্রবেশ না করে। আমি যেন তোমার প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তার কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকি। যেখানে বিবাদের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে দেখি, সেখানে "বিগত বিবাদং" যে তুমি তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই বিবাদ প্রশমনে যেন আমি যত্নবান হই। যদ্যপি আমি সে পবিত্র কার্য্যে কৃতিত্ব লাভ করিতে না পারি তথাপি যেন ক্ষুব্ধ না হই। সতত তোমার প্রতি প্রীতি যেন আমার হৃদয়ে চির বিরাজিত থাকে। প্রীতি আমার বাক্য মধুময় করুক, প্রীতি আমার কার্য্য মধুময় করুক।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষের ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল।

দীর্ঘ জীবন পথ,
কত দুঃখ তাপ,
কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর
অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে
এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি
আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার
কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব নারে ম্রিয়মাণ।

গৌড়সারং—তাল একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আছি হরষে
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে।

জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি
শতধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে!
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব-বরষে!

রাগিণী টৌড়ি—তাল একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে!—
অমৃত মধুর তাঁর প্রেম গান
মানব মনে শুনাওরে!
মধুর তানে নীরস প্রাণে
মধুর জীবন জাগাওরে!
যাতনা দিওনা কাহারে ব্যথিতের তরে,
পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে!
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী
প্রাণে নববল দাওরে!
আনন্দময়ের আনন্দ আলয়
নব নব তানে ছাওরে,
পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাওরে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে গত দুই মাসে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. LIII. Part I. Special Number.

Bibliotheca Indica. Published by the Asiatic Society of Bengal.

N. S. Nos. 524, 525. (Akbarnamah)

N. S. No 523 (Katha Sarit Sagara.)

N. S. No 249. (ইবন বতুত)

N. S. No 521. (Muntakhab Ul Tawarikh by Al Badaoni)

N. S. No 527. (চতুর্বর্গচিন্তামণি।)

N. S. No 522. (তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুঃসংহিতা।)

N. S. No 526. ([illegible])

N. S. No 520 (আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র।)

পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা। মুঙ্গের ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

আসাম বন্ধু। মাসিক পত্র। শ্রীগোপীরাম বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

আর্য্যদর্শন। ১০ খণ্ড ১০ ও ১১ সংখ্যা।

নবজীবন। প্রথমখণ্ড ৮ ও ৯ সংখ্যা।

বান্ধব। অষ্টমখণ্ড, দশম ও একাদশ সংখ্যা।

Report on the Operations of the Panjab Brahma Samaj for the 55th Brahma Ear

আলোচনা। প্রথমখণ্ড মাঘ ও ফাল্গুন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সংহিতা। শ্রী সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রচার। প্রথম খণ্ড, অষ্টম ও নবম সংখ্যা।

Theosophist. Vol. 6. No 9, 7.

বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৯১। ফাল্গুন।

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি। অর্থাৎ অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতার বাঙ্গালা অনুবাদ। অবকাশমতে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে আমাদের অভিলাষ আছে।

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal No XI, 1884.

সমালোচনা।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত প্রণীত ইংরাজি ভাষায় লিখিত Book of Faith অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিবার হেতু

ইত্যাদি বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সম্প্রীত হইলাম। ঈশ্বর জগতের মূল শক্তি। তিনি সকল শক্তির আধার ও প্রেরয়িতা। জড় জগৎ তাঁহার সত্ত্বাতে ও তাঁহার ইচ্ছাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনি সকলের কারণ নিয়ন্তা ও সেতু বিধরণ হইয়া রহিয়াছেন ইত্যাদি গভীর তত্ত্ব সকল গ্রন্থকার স্বীয় সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন পরন্তু তিনি নিরীশ্বরবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের প্রচলিত মতগুলি প্রখর যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ কি এদেশীয় কি বিদেশীয় জনগণের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপকারী হইতে পারে কিন্তু ইংরাজি ভাষায় একরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা থাকিলেও আমরা ইচ্ছা করি যে সীতানাথ বাবু এতাদৃশ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। বঙ্গ ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিকাশ অধিকতর প্রার্থনীয়। তাঁহার মত কৃতবিদ্য লেখকগণ কি ইহার অভাব পূরণে অগ্রসর ও সফলকাম হইবেন না।

আয় ব্যয়।

ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	২৮৫।৶৯
পূর্ব্বকার স্থিত			৩০৩৪/০
সমষ্টি	...		৩৩১৯॥ ৯
ব্যয়	...	...	৬৩৬৶৩
স্থিত	...	...	২৬৮৩।/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১৭৮/৯
দান প্রাপ্তি।			
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি		২৲	
„ বাবু রাধিকাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী		১৲	
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী		২৲	
„ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী		২৲	
আনুষ্ঠানিক দান।			
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী		৭৲	
দানাধারে দান প্রাপ্তি		৩৮/৯	
		১৭৮/৯	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...		৫১৮৶০
পুস্তকালয়	...		২৮৲
যন্ত্রালয়	...		৮৭।০
গচ্ছিত			২৫৮৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			৪॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার			৪৫৲
দাতব্য			২৫৲
সমষ্টি			২৮৫।৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৯৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৮১।/৩
পুস্তকালয়	...	...	৬৯৸৶৬
যন্ত্রালয়	...	...	২২২৸ ৬
গচ্ছিত	...	...	১০১ /৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			৪৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার			৪৭৲
দাতব্য			২২৲
সমষ্টি	...	...	৬৩৬৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

জ্যৈষ্ঠ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ

৫০২ সংখ্যা

১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

অনুশাসন। *

১

ধর্ম্মশূন্য যে মানব পাপী দুরাচার,
অনৃত উপায় বিত্ত অর্জ্জনে যাহার,
হিংসার অনলে সদা দহে যার মন,
এথায় না লভে সুখ কভু সেই জন।

২

ধর্ম্ম-পথ পর্য্যটনে যদি ক্লান্ত হও,
প্রতি পদ বিনিক্ষেপে বিঘ্ন বাধা পাও,
অধার্ম্মিক পাপীদের বিপর্য্যয় হেরি
অধর্ম্মের দিকে কভু চাহিবে না ফিরি।

৩

অধর্ম্মে আপাত হয় বিষয় বর্দ্ধন,
অধর্ম্মে আপাত হয় কুশল দর্শন,
শত্রুর নিধন হয় অধর্ম্মের বলে,
শেষে কিন্তু সবি নষ্ট অধর্ম্মের ফলে।

৪

বিন্দু বিন্দু মৃত্তিকা করিয়া সংস্থান
পুত্তিকা যেমন করে বল্মীক নির্ম্মাণ
ক্রমে ক্রমে সেইরূপে ধর্ম্ম উপার্জ্জিয়া
পরলোক হেতু রবে সহায় করিয়া।
হৃদয়ে রাখিয়া স্নেহ দয়া অনুক্ষণ
নাহিক করিবে কোন জীবের পীড়ন।

৫

পরলোকে সঙ্গী হ'তে না রহেন পিতা,
নাহি রহে জ্ঞাতিবন্ধু না রহে বনিতা ;
কেবল নরের চির জীবন সহায়
ধর্ম্ম এক বন্ধু হ'য়ে রহেন সেথায়।

৬

একাকী জনমে নর একাকীই মরে
সুকৃত দুষ্কৃত ফল একা ভোগ করে।

৭

কাষ্ঠ মৃত্তিকার সম করিয়া গনন
মৃতের শরীর ভূমে করিয়া ক্ষেপণ
বিমুখ হইয়া ফিরে যায় বন্ধুগণ
ধর্ম্মই তাহার সহ করেন গমন।

৮

অতএব আপনার সাহায্য কারণ
প্রতিদিন ধর্ম্ম-ধন করিবে অর্জ্জন,
ধর্ম্মেরে সহায় করি সংসার আঁধার
সহজে ধার্ম্মিক নর হ'য়ে যায় পার,

* ব্রাহ্মধর্ম—২ খণ্ড ১৬ অধ্যায়।

৯

ধর্ম্মের আদেশ এই ধর্ম্মের শাসন,
ইহাই যতনে সবে করিবে পালন।
ইহাই যতনে সবে করিবে পালন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৭ বৈশাখ রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

সত্য-ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সত্য কি তাহা না জানিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা কখনই জানা যাইতে পারিবে না। সত্যকে জানা কঠিন বলিয়া সত্যকে কি আমরা পরিত্যাগ করিব? আর, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা খুব সহজ বলিয়া কি আমরা মিথ্যাকে সমাদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিব? অধঃপাতে যাওয়া সহজ বলিয়া কি আমরা অধঃপাতের সোপান নির্ম্মাণ করিব? আর, উন্নতিতে আরোহণ করা কঠিন বলিয়া কি আমরা উন্নতির সোপান ভগ্ন করিয়া ফেলিব? "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর" সত্য বল—ধর্ম্ম আচরণ কর—এ কথা ছাড়িয়া আমরা কি "অসত্যং বদ অধর্ম্মং চর" এই কথাটিকে আমাদের শিরোভূষণ করিব? যদি নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস না কর, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিও না। কিন্তু যদি এরূপ মনে কর যে, "ঈশ্বর নিরাকার—এ কথাটি অতি সত্য কিন্তু আমার মত সাধকের তাহাতে কোন ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না,"—তবে, পৃথিবীতে এমন এক জনও ধর্ম্ম-সাধক আছেন—যাঁহার সত্যেতে কোন ইষ্টসিদ্ধি হয় না—মিথ্যাতেই ইষ্টসিদ্ধি হয়—কি ভয়ানক কথা!—যিনি সত্যেতে কোন ইষ্ট দেখেন না—তিনি যে ধর্ম্মেতে কোন ইষ্ট দেখিবেন তাহারই বা সম্ভাবনা কি? মিথ্যাই যাঁহার ইষ্ট-সিদ্ধির এক মাত্র উপায় হইল, তিনি কিরূপে আপনাকে সত্যের সাধক বলিবেন—ধর্ম্মের সাধক বলিবেন!—ঈশ্বরকে যিনি সত্যের সত্য বলিয়া শ্রদ্ধা করেন তাঁহার সে আন্তরিক শ্রদ্ধা, আর, যিনি স্বীয় মনের কল্পিত বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা সমর্পণ করেন তাঁহার সে কৃত্রিম শ্রদ্ধা,—দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঈশ্বর "নিত্যো হনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" অনিত্য বস্তু সকলের মধ্যে তিনিই কেবল একমাত্র নিত্য—চেতন-পদার্থ সকলের তিনিই একমাত্র চেতয়িতা, ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মা দ্বারা আমরা যেন ঈশ্বরের উপাসনা করি;—মনঃকল্পনা—যাহা এই আছে এই নাই—সেই অস্থির মনঃকল্পনা—তাহা দ্বারা ঈশ্বরের সহজ সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবকে আমরা কখনই অলঙ্কৃত করিতে পারিব না—কেবল আবৃত করিয়া ফেলিব—ইহা জানিয়া শুনিয়া ওরূপ কার্য্যে কোন্ সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন। ঈশ্বর যে আমাদের কত নিকটে তাহা একবার হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়া দেখ,—তাঁহাকে কল্পনা করিতে ইচ্ছা করিও না। আত্মার আধার—বিশ্বের আধার—পরমাত্মাকে যদি আমরা সত্য-সত্যই অন্তর্য্যামী স্বয়ম্ভু নিত্য সত্য বলিয়া না জানি—তবে মিথ্যা-মিথ্যি তাঁহাকে যেরূপে কল্পনা করিলে তাহাতে ফল কি? আর, যদি সত্য-সত্যই জানি যে, তিনি আমাদের নিকটে রহিয়াছেন—তবে তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য মনশ্চক্ষুকে পাপ-মলিনতা হইতে মুক্ত না করিয়া কল্পনাপটে তাঁহার ছবি আঁকিবার বৃথা আয়াসে আমরা আপনারাই বা প্রবৃত্ত হইব কেন—অন্যকেই বা প্রবৃত্ত করিব কেন? হে সাধক! তুমি যদি সরল হৃদয়ের বিশুদ্ধ জ্ঞানে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পুরুষকে

আপনার সাক্ষাৎ প্রভু বলিয়া না জান— তবে তুমি কাহাকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতে চাও? তুমি কি আপনার কল্পনাকে আপনার প্রভুপদে বরণ করিতে চাও? সরল হৃদয়ের সত্য-জিজ্ঞাসা ছাড়িয়া লোকরঞ্জন কৃত্রিম উপায়ে ঈশ্বরকে লাভ করিতে চাও? অসীম আকাশ যাঁহার পরিপূর্ণ সত্তা ধারণ করিতে সমর্থ নহে, ক্ষুদ্র একটি মনঃকল্পিত আকারের মধ্যে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে চাও? ঈশ্বরকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিতে চাও? —তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভাবকে পরিচ্ছিন্ন আকারে বদ্ধ করিতে চাও?—তাঁহার অন্তর্য্যামিত্ব এবং বিভুত্ব তাঁহা হইতে কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা কর? বরং অকূল মহাসমুদ্রকে কূপের মধ্যে আনয়ন করিতে পারিবে—তথাপি পরমাত্মাকে অনিরুদ্ধ অন্তরাকাশ হইতে বাহিরের পরিচ্ছিন্ন আকাশে আনয়ন করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মদিগের এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পথে—মনকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করা উচিত: লোক-রঞ্জনার্থে যেন আমরা আমাদের চিরারাধ্য সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার পথে ফিরিয়া না যাই; প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া যেন আমরা মিথ্যার পথে ফিরিয়া না যাই; দলরক্ষা করিবার জন্য যেন আমরা মিথ্যার পথে ফিরিয়া না যাই; লোকভয়ে কম্পমান হইয়া যেন আমরা মিথ্যার পথে ফিরিয়া না চাই; সত্যের পথে চলা কঠিন বলিয়া আমরা যেন মিথ্যার পথে ফিরিয়া না চাই; আমরা যেন সত্যের অমায়িক সরল পথ ছাড়িয়া মায়াবী-দিগের কুটিল পাক-চক্রময় গোলোক-ধাঁদার ভিতর প্রবেশ না করি। সরল সত্যের অমোঘ সহায় ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দশা কি শেষে এই হইবে যে, অন্ধ যেমন অন্ধ-কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় সেইরূপ মিথ্যার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাকে অতিবড় পণ্ডিত মনে করিয়া দন্দ্রম্যমান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। সত্যমেব ব্রতং যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং; সত্যই যাঁহার ব্রত তিনি তিন লোক জয় করিয়াছেন, তিন লোক জয় করা কত না কঠিন কার্য্য,—কিন্তু সাধক ব্যক্তি কঠিন কার্য্য সাধন করেন বলিয়াই সাধক নাম প্রাপ্ত হ'ন—সঙ্কীর্ণ আয়াস-হীন ঘুমন্ত সাধককে আর সাধক বলা যাইতে পারে না। সাধকের মুখে এক কথা ছাড়া দুই কথা থাকিতে পারে না—সে কথা এই যে, সত্য তুমি আমাকে যে পথে লইয়া চলিবে সেই পথে যাইব—ধর্ম্ম তুমি আমাকে যে পথে লইয়া চলিবে সেই পথে যাইব—কণ্টকের উপর দিয়া যাইব—পুষ্পের উপর দিয়া যাইব—পর্ব্বত ভেদ করিয়া যাইব—সুখ সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে যাইব—অশ্রুপাত করিতে করিতে যাইব—হাস্য করিতে করিতে যাইব—যেদিকে লইয়া যাইবে সেই দিকে যাইব—তাহার এ দিকে ও দিকে চাহিব না। সত্যের মধুময় আকর্ষণ—ধর্ম্মের মধুময় আকর্ষণ—ঈশ্বর-প্রেমের মধুময় আকর্ষণ—সাধকের হৃদয়ের একমাত্র পরিচালক—তাহাতেই তিনি চলেন, তাহাতেই তিনি বলেন, তাহাতেই তিনি বর্দ্ধিয়া থাকেন, তাহাতেই তিনি নিদ্রা যা'ন, তাহাতেই তিনি জাগ্রত হ'ন—তিনিই সাধক—তিনিই সাধক! সাধকের মুখে কখন দুই কথা থাকিতে পারে না—প্রকৃত সাধকের হৃদয় হইতে এই কথাটি বাহির হইয়াছে।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ,"

এক, সেই পরমাত্মাকেই জানো—অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর—ইনিই অমৃত-লাভের সেতু। যাঁহার এক মন, এক লক্ষ্য, এক কথা, সেই সাধকই সাধক—তিনিই সিদ্ধি লাভ করেন—অন্যেরা কে কিসে নীত হইয়া

কোথায় গিয়া পড়ে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। ঈশ্বরের আসনে কেহ বা লোকানুরাগকে, কেহ বা ভাবি ঐতিহাসিক খ্যাতি প্রতিপত্তিকে, কেহ বা আপনার যথেচ্ছগামী মনঃকল্পনাকে আরূঢ় করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহারই পূজা করেন—ইহার নাম কি ঈশ্বরারাধনা—না সংসারের দাসত্ব। এ দাসত্ব হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করুন। হে পরমাত্মন্! আমাদের শত্রু অনেক-সংখ্যক—তুমিই কেবল আমাদের একমাত্র সুহৃৎ। আমরা আপনারা-পর্য্যন্ত আপনাদের শত্রু;—আমরা তোমার সত্যকে ছাড়িয়া আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী সত্য গঠন করিয়াছি,—আমাদের সত্যেতে যাহার অভিরুচি তাহাই তাহার পূজা হইয়া উঠিতেছে—তোমার বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্যে আমাদের মনের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে! চারিদিকেই অন্ধকার—কেবল তোমার মুখজ্যোতিই আমাদের এক মাত্র জ্যোতি—তোমার অভয় আশ্রয়ই আমাদের একমাত্র আশ্রয়,—নিরন্তর তোমাকে যেন আমরা নিকট হইতে নিকটে দেদীপ্যমান দেখি। আমাদের তৃষিত নয়নে তোমার সত্যরূপ প্রকাশ কর—সংসার-সঙ্কট হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং।

কতকগুলি কার্য্য আছে তাহারা প্রায় তুল্য রূপে শরীর, মন, হৃদয়, ও আত্মার দুর্গতি সাধন করে—এই সকল কার্য্য মহাপাপ নামের বাচ্য। মদ্যপান এই সকল কার্য্যের মধ্যে একটী। মদ্যপানে যে কেবল শরীর অসুস্থ, দুর্ব্বল ও রোগের আবাসস্থল হয় তাহা নহে, ইহাতে মন বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি নিস্তেজ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে, হৃদয়ের পবিত্র কোমল প্রবৃত্তি-সকল অসাড় হইয়া যায়, এবং আত্মার দৃষ্টি মলিন হইয়া যায়। যে দেশে এই ঘোর অনিষ্টকারী মদ্যপান-রূপ মহাপাপ প্রবেশ করে, সে দেশের আর দুরবস্থার শেষ নাই। যে পরিবার মধ্যে এই মহাপাপ প্রবেশ করে সে পরিবারের দুর্গতির আর অন্ত নাই। বঙ্গদেশের বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় উহার ভাবিশ্যৎ উন্নতির পক্ষে বড় নিরাশার কথা যে দিনে দিনে বঙ্গে এই মহাপাপ বৃদ্ধি হইতেছে। আবার ইংরাজ-রাজ বঙ্গে সম্প্রতি খোলা ভাটীর নিয়ম করিয়া এই পাপ বিস্তারে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেছেন—আর ক্ষীণমনা দুর্ব্বলহৃদয় আধ্যাত্মিক-বলশূন্য বঙ্গবাসী দলে দলে যাইয়া সেই পাপে নিপতিত হইতেছে। এই বঙ্গদেশে কত সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অসময়ে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছে, কত কত বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য আপনারদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যা হারাইয়া লোকের সম্মুখে ঘৃণিত ও অপমানিত হইতেছে; কত কত বিবেক-পরায়ণ ব্যক্তি বিবেকশক্তি-চ্যুত হইতেছে এবং রিপুগণের বশীভূত হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে; কত কত হৃদয়বান ব্যক্তি আপনারদিগের স্বভাবসিদ্ধ ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইতেছে; আর কত কত ব্যক্তি আত্মার দৃষ্টি মলিন করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে অনধিকারী হইয়া আপনারদিগের আত্মার সুগতির-পথে কণ্টক রোপণ করিতেছে। মদ্যপান-রূপ মহাপাপ জন্য এই বঙ্গে চতুর্দ্দিকে কি শোচনীয় কাণ্ড ঘটিতেছে—একবার তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়।

অপরিমিত মদ্যপানে যে ঘোর অনিষ্ট হয় তাহা ত সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু বঙ্গের ভদ্রসমাজ মধ্যে এক দল লোক আছেন তাঁহারা পরিমিত মদ্যপানের পক্ষপাতী—পরিমিত মদ্যপানে যে কোন অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদিগের রীতি নীতি অনুকরণ করিবার হীন বাসনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, কেহ কেহ নব্য বঙ্গসমাজের শিষ্টাচারের অনুরোধে এবং কেহ কেহ বা স্বাস্থ্যরক্ষা হয় মনে করিয়া অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিবার রীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে করেন অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিলে তাহা হইতে অনিষ্ট হয় না, তাঁহারা অতি ভ্রান্ত। মদ্য একটী প্রচণ্ড বিষ—অল্প হউক, অধিক হউক, কোন কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকল লোকের পক্ষেই ইহা অপকারী ও অনিষ্টকর—শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার অবনতিকর। বর্ত্তমান কালের ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান শরীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের ইহাই মত, আর ইহাঁদিগের এই মত যে অতি সত্য কার্য্যতঃ আমরা তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাইতেছি। পরিমিত মদ্যপানেও যে মহা অনিষ্ট হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের মত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* পরিমিত বা অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিবার আর একটী দোষ এই যে উহা অধিক পরিমাণে পান করিবার অদম্য লালসা উদ্রেক করে—এই লালসা এক শতের মধ্যে এক জন লোকও দমন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কোন সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বাঁধের এক স্থানে ছিদ্র রাখা ও পরিমিত মদ্যপান করা একই কথা—বাঁধের ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া জল নির্গত হইয়া যেমন সমস্ত দেশকে প্লাবিত করে, সেইরূপ একটু একটু মদ্যপান করিয়া মহা অনর্থ সাধিত হয়। দেখা যাইতেছে যে অধিকমাত্রায় হউক বা অল্পমাত্রায় হউক মদ্যপান মনুষ্যের পক্ষে ঘোর অহিতকারী, মহাপাপ। এই জন্যই পুণ্যচরিত্র হিন্দুগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং।" "অন্যকে মদ্য দিবে না, আপনি পান করিবে না, একেবারে ছুঁইবে না"—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। যাহা মহাপাপ, নিজে তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করি

* Dr James Miller says, 'Alcohol kills in large doses, and half kills in smaller ones. It produces insanity, delirium, fits. It poisons the blood and wastes the man.' Dr Gordon says;—'Leaving drunkenness out of the question, the frequent consumption of a small quantity of spirits, gradually increased, is as surely destructive of life, as more habitual intoxication." Professor Hitchcock observes, "The use of spirits, even in the greatest moderation, tends to shorten life." Dr R. G. Dods remarks,—" No one is safe from the approach of countless maladies who is in the daily habit of using even the smallest portion of ardent spirits. The practice can not possibly do any good, and it has often done much harm.' Dr Lettson has recorded the following result of his observation;—'Nearly all the illness of my adult patients, and most of the cases of sudden deaths, are occasioned by the practice of taking a glass of spirits and water after dinner." Dr Harris, in an official report to The Secretary to the American Navy, states, the moderate use of spirituous liquors has destroyed many who were never drunk." Dr Brewster remarks;—"It is enough to observe that the habitual use of intoxicating drinks, even within the limits of what is commonly deemed sobriety, is equally destructive to the health of body and mind." Dr. A. S. Thomson observes,—"Wine, even in moderation, when daily used, is equally hurtful it over stimulates and consequently exhausts the powers of life." Dr Rush declares; "I have known many persons destroyed by ardent spirits who were never completely intoxicated during the whole course of their lives.

ক্রিয়া করিতে সাহায্য করি, তাহা হইলেও পাপ করা হয়, এইজন্য উক্ত হইয়াছে, "মদ্যমদেয়মগ্রাহং" অর্থাৎ অন্যকে মদ্য দিবে না, একেবারে স্পর্শ করিবে না। আজ কাল ইংরেজী সভ্যতানুসারে বঙ্গের নব্য সমাজে এরূপ রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে যিনি নিজে মদ্যপান করেন না, তিনি যদি মদ্যপানাসক্ত কয়েকটী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগের প্রমোদার্থ মদের বিশেষ আয়োজন করিয়া থাকেন, পরে হয়ত আহারান্তে স্বহস্তে তাঁহাদিগকে মদ্য ঢালিয়া দিয়া সৌজন্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন মনে করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করেন। এরূপ সৌজন্য যে নিতান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, ইহা তাঁহারদিগের জ্ঞান হয় না; ইহা বড় আশ্চর্য্য। এরূপ সৌজন্য দ্বারা মদ্যপান রূপ পাপের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়, অন্যকে ঐ পাপ করিতে সাহায্য করা হয় এবং তজ্জন্য ধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হয়; ইহা তাঁহাদের সম্যকরূপে হৃদয়ে ধারণ করা উচিত।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

হিন্দুজাতির নিকট ঐহিক কিছুই নহে, পারত্রিকই যথাসর্ব্বস্ব। যাগ যজ্ঞ দান ব্রত উপবাস যা কিছু বল পারত্রিক ফললাভ তাহার একমাত্র লক্ষ্য। পরকালের উপর হিন্দুজাতির এইরূপই বিশ্বাস। সমস্ত কৃচ্ছ্র-সাধন কেবল ইহারই বলে। এই জন্য ধর্ম্মটী তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইহাই আত্মার শিক্ষা। কিন্তু এস্থলে এমন কেহ বুঝিও না যে পূর্ব্বকালে কতকগুলি মতের সমষ্টিতে বিশ্বাস দাঁড় করাইতে পারিলেই ধর্ম্মশিক্ষার চূড়ান্ত হইত। ছাত্রের ধর্ম্ম কেবল মতে নয় কার্য্যে ছিল। তাহাকে ত্রিকালীন স্নান করিয়া দুইবার সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিপরিচর্য্যা করিতে হইত[১]। ইহাই উপাসনা।

ধর্ম্ম দুইপ্রকার প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম। যাগযজ্ঞাদি প্রবৃত্তি-লক্ষণ বা স্থূল ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান নিবৃত্তি-লক্ষণ বা সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে অষ্টমবর্ষীয় ছাত্রের প্রথমে স্থূল ধর্ম্মে দীক্ষা হইত। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম জ্ঞান-সাপেক্ষ। বোধ হয় বালকের কোমল মন ইহা গ্রহণ করিবার উপযোগী নয় ঋষিরা এরূপই বুঝিতেন। যাঁহারা স্থূল ধর্ম্মকে ভবার্ণবের পরপার গমনে অদৃঢ় ভেলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২]; যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে নারিকেল ফলের জল ও শস্য লাভ হইলে যেমন তাহার অসার ভাগ (ছিবড়া) ত্যাগ করিতে হয়, ফলোদ্গম হইলে ফুলটী যেমন আপনা হইতেই ঝরিয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে স্থূল-ধর্ম্মকে হয় ত্যাগ করিতে হইবে অথবা ইহা আপনা হইতেই বিলোপ পাইবে; তাঁহারাই যে আবার স্থূল ধর্ম্মকে শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া যান, ইহার অবশ্য কোন হেতু আছে। ঋষিরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে স্থূল ধর্ম্মে ভববন্ধন হইতে মুক্তি নাই কিন্তু এদিকে আবার মনুষ্যকে ধর্ম্মশূন্য করিয়া রাখাও শ্রেয় নহে। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম লাভের জন্য প্রাণপণ কর, কিন্তু যত দিন তাহা না পাইতেছ তাবৎ স্থূল ধর্ম্ম লইয়া আত্ম-তৃপ্তির চেষ্টা দেখ। আশ্রম ধর্ম্ম নির্দ্দেশকালে ঋষিদিগের এই অভিপ্রায় বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহারা জ্ঞান-লক্ষণ প্রব্রজ্যার প্রাধান্য দিয়াছেন, বলিয়াছেন জ্ঞানের পক্ষে কালাকাল নাই। যখন

---

১ কালত্রয়মভিষেকাগ্নিকার্য্যকরণম্। বিষ্ণু সূত্র।

২ প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া [illegible] শ্রুতি।

জ্ঞানোদয় হইবে তদণ্ডেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে৩। এস্থলে দেখিতেছি ব্রহ্ম চর্য্য না করিয়া যেমন কেহ গার্হস্থ্যে কিম্বা গার্হস্থ্য না করিয়া যেমন বানপ্রস্থে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রব্রজ্যার পক্ষে সে বিধি নয়। যখনই জ্ঞানোদয় হইবে, তখনই প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই সূক্ষ্মধর্ম্ম যখনই হৃদ্বোধ হইবে, তখনই তাহা আশ্রয় ও তদনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক। ইহাতে কাল ও আশ্রমের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

বাল্যকালে সকল প্রকার সংস্কার সহজে বদ্ধমূল হয়। বয়োধর্ম্মে দুষ্প্রবৃত্তি ও তর্ক-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া মনকে আকুল ও সংশয়ান্বিত করিতে পারে। এজন্য বাল্যকালই ধর্ম্মবীজ বপন করিবার প্রকৃত সময়। পূর্ব্বে তাহাই হইত। পরে যখন গার্হস্থ্যের পরার্থ-প্রধান কঠোর কর্ত্তব্য বহন করিবার সময় আসিত, তখন এই অন্তর্নিহিত গূঢ় বীজ উদ্ভিন্ন হইয়া অতি মধুময় ফল প্রসব করিত। গৃহস্থ ইহারই বলে জীবনের সকল প্রকার রহস্য বুঝিতে পারিত। সংসার-সমুদ্রের নানারূপ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও আপনার পদ অটল রাখিতে সমর্থ হইত এবং কঠিন লৌহকেও পুষ্পকোরকবৎ কোমল বুঝিত। কারণ ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত বল, ধর্ম্ম সহায় হইলে দুস্তর অন্ধকারও সুখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

ত্রিকালীন স্নানের একটু তাৎপর্য্য আছে। অন্তঃশুদ্ধি বাহ্যশুদ্ধি সাপেক্ষ। যাহার শরীর অশুচি থাকে, অন্তঃশুদ্ধি তাহার পক্ষে একটী কষ্টকর ব্যাপার। ফলত ইহার অভাবে আত্ম-সমাধানের ব্যাঘাত ঘটে।

এক্ষণে মানসিক শিক্ষা কিরূপ হইত, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। শিক্ষার্থী ছাত্র সর্ব্বাগ্রে বেদপাঠ করিত। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিত সে সবংশে শূদ্র হইয়া যাইত৪। বেদ ব্রহ্মবিদ্যা। যাঁহারা ধর্ম্মকে সার পদার্থ বলিয়া জানিতেন ধর্ম্ম-গ্রন্থ যে তাঁহাদের প্রথম পাঠ্যের মধ্যে নির্ব্বাচিত হইবে, ইহা একটা আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু এই বেদ প্রথমে অর্থপ্রতীতির সহিত পাঠ করিবার রীতি ছিল না। সকলে ইহা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিত। যখন অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, যখন গ্রন্থ নামে কোন পদার্থ ছিল না, তখন ব্রহ্মচারিরা সংযত হইয়া এই বেদ কণ্ঠস্থ করিত। পরে যখন অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এবং সেই সময় হইতে এখনও এই রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। মুখে অভ্যাস রাখিতে হয়, এই জন্য বেদের একটী নাম আম্নায়৫। কিন্তু সমস্ত গ্রন্থ মুখস্থ রাখা বড় সহজ কথা নয়। দাক্ষিণাত্যে এখনও কিরূপ প্রণালীতে ছাত্রেরা বেদ মুখস্থ করে এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেই। মনে কর আমি কোন একটী ঋকের শেষ পাদের কিংবা পাদার্দ্ধের উল্লেখ করিলাম, শিক্ষার্থী ছাত্র সেই ঋকের পূর্ব্বপাদ আবৃত্তি করিয়া প্রশ্ন পূরণ করিল। আমি মন্ত্রগত কোন একটী বিশিষ্ট দেবতা বা শব্দের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসিলাম এই দেবতা বা শব্দ কোন্ কোন্ ঋকে আছে। ছাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিল। এই এক একটী ছাত্র যেন জীবিত বৈদিক পুস্তকালয়। ইহাদের নিকট বেদের যে কোন স্থান চাও, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা আবৃত্তি করিয়া দিবে। পূর্ব্বেও এইরূপ রীতিতে শিক্ষা হইত। কিন্তু কেবল মু-

৩ যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। শ্রুতি।

৪ যনধীত্যবেদোহন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদ্দ্বিজো সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি। বি, স্মৃ।

৫ আম্নায়তে অভ্যস্যতে আম্নায়ঃ।

ত্তিতে গ্রন্থরক্ষার অনেক বিপদ। ইহাতে পদে পদে পাঠ বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। বেদকে এই পাঠবিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংহিতা পদ ক্রম জটা ঘন প্রভৃতি কতকগুলি পাঠগ্রন্থ আছে। ইহা সর্ব্বশুদ্ধ আটপ্রকার। ইহাকে অষ্ট বিকৃতি বলে। এই সংহিতা পদ ক্রম প্রভৃতি যে কি এবং ইহা দ্বারা কিরূপে যে বেদের পাঠ রক্ষা হয় প্রাতিসাখ্য নামক বৈদিক গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিলাম না। ফলতঃ শিক্ষার্থী ছাত্রকে এই সমস্ত পাঠ-গ্রন্থ সমগ্র বেদের সহিত কণ্ঠস্থ করিতে হইত। পরে বেদের অর্থগ্রহ। এইরূপ পূর্ব্বতন প্রণালীর শিক্ষায় বিশেষ উপকার আছে, এবং এই শিক্ষাই স্বাভাবিক। ইহাতে স্মৃতি ও বুদ্ধি দুয়েরই বৃদ্ধি হয়। আর ইহাকে যে স্বাভাবিক বলিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। শিশু জন্মগ্রহণের পর হইতে পদার্থ চিনিতে ও তাহা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করে। যাঁহারা শিশুর দোলার উপর রক্তবস্ত্রাদি ঝুলাইয়া এই ভাবটা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শিশুর বস্তু চেনা ও স্মরণ রাখার কথা বুঝাইতে হইবেনা। ইহাতে প্রমাণ হয় যে সর্ব্বাগ্রে শৈশবে স্মৃতিশক্তিরই স্ফূর্ত্তি হয়। স্মৃতি যে জ্ঞানটুকু আনে, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ বিচারের উৎপত্তি ও বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। এই যে স্বভাব। পূর্ব্বতন শিক্ষা-প্রণালী ইহারই অনুকূল। ছাত্র অগ্রে স্মৃতি পরে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিত। এবং এখনও চতুষ্পাঠীতে সামান্যতঃ এই রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। যে লতা নৈসর্গিক নিয়মে বাড়ে বাধা না পাইলে সে সর্ব্বতোমুখী হয়। পূর্ব্বে ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতির বুদ্ধি তাহাই হইত। এস্থলে প্রসঙ্গ-সঙ্গতি ক্রমে একটী কথা আসিতেছে। আমরা বলিয়াছি ধর্ম্ম তখনকার শিক্ষার একটী শাখা। পরে দেখাইলাম বুদ্ধিবৃত্তির সর্ব্বতোমুখতা। এখন বক্তব্য এই যে তখনকার কল্পনার যে গভীরতা ও সম্প্রসারণ তাহা এই মণিকাঞ্চন-যোগেরই একটী অব্যর্থ ফল। পূর্ব্বতন কাব্য নাটক পুরাণ যে কোন গ্রন্থ আলোচনা কর দেখিবে কবি যাহা বলিবেন বা করিবেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে যেন তাহার চতুর্দ্দিকটা অগ্রে দেখিতেছেন। যাহাতে বর্ণনীয় বিষয়টী পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠে, তাহার কোথায় কি অভাব, কোথায় কি দিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, ইহা তিনি যেন সহস্র নেত্রে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। প্রাসাদের আড়ম্বর, কুটীরের অবসাদ, বীরের দম্ভ, দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদ, স্বাস্থ্যের সজীবতা, রোগের বিষাদ, স্বর্গের মহোল্লাস, নরকের হাহাকার যেন তিনি জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন। জগতের সমস্ত রহস্যের কুঞ্চিকা যেন তাঁহার হস্তে। তিনি কবাট উদ্ঘাটন করিয়াছেন, ইচ্ছা যে জগতের সকলেই তাহাতে প্রবেশ করুক। তিনি তন্মধ্যে গিয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে সমস্ত দেখিতেছেন। তাঁহার চিত্ত ভালমন্দ বিচারে ব্যস্ত। একদিকে পাপের নরককুণ্ড ও অপর দিকে পুণ্যের স্বর্গবাস বিভাগ করিয়া রাখিতেছে। ইহা পদ্মের সৌরভ-মাধুরী আনিয়া মন মোহিত করে আবার দুর্গন্ধময় অন্ধকার গর্ভের অস্বাস্থ্যকর বিষবায়ু আনিয়া অস্থির করিয়া তুলে। এইরূপ সমস্ত ভাব-পরম্পরার মধ্যে আমরা কেবল কবিরই নৈতিক দৃষ্টির পরিচয় পাই। অনেক চরিত্র-মাহাত্ম্যে তাঁহাকেই প্রতিবিম্বিত দেখি এবং অনেক চরিত্র-দৌরাত্ম্যে তাঁহারই ঘৃণা দেখি। এই টুকু সেই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর সুফল—এখন আর ধর্ম্ম শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট নাই, মর্ম্মস্পর্শী কবিত্বও ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

পূর্ব্বকালে কেবল যে মানসিক শিক্ষা হইত তাহা নহে, ইহার সহিত সদাচার ও সভ্যতার শিক্ষা ছিল। ইহাই হৃদয়ের শিক্ষা। আমরা ইহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য ও ছাত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া লই। যিনি উপনীত করিয়া বেদ অধ্যাপন করেন তিনি আচার্য্য ১। জন্মদাতা পিতা ও আচার্য্যের মধ্যে আচার্য্যই গরীয়ান্। পিতা মাতা হইতে কেবল নাম মাত্র জন্ম হয় কিন্তু বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্রী দীক্ষা দ্বারা যে জন্মের বিধান করিয়া থাকেন তাহাই সত্য তাহাই অজর ও অমর। যিনি ধর্ম্মযোনির কর্ত্তা, যিনি স্বধর্ম্মের শাস্তা, অল্পবয়স্ক হইলেও তিনি ধর্ম্মত পিতা। শাস্ত্রে আচার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রশস্ত ভাব দেখা যায়। ছাত্রেরও লক্ষণ আছে। ছাত্র পরীক্ষিত হওয়া চাই২। যাহার অন্তরে ধর্ম্ম এবং শ্রবণেচ্ছা নাই, তাহাকে বিদ্যাদান নিষ্ফল। উষর ক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায় ইহাতে কোন ফলোদয় হয় না। বিদ্যা আসিয়া আচার্য্যকে কহিল ৩ ভগবন্। আমি তোমার সেবক, আমায় রক্ষা কর। যে ব্যক্তি অসূয়ার বশবর্ত্তী অসরল ও অসংযত, তাহাকে আমায় বলিও না। ইহাতে আমার বীর্য্যের হ্রাস হইবে। তুমি যাহাকে শুদ্ধস্বভাব অপ্রমাদী মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠাবান জানিবে, যে কোনও রূপে তোমার অপ্রিয়াচরণ করিবে না, তুমি তাহাকেই আমায় বলিও। ছাত্রের ইহাই লক্ষণ। এই ছাত্রের অনেক কর্ত্তব্য ছিল। আচার্য্য আদেশ করুন আর নাই করুন, ইহাকে নিয়ত অধ্যয়নে যত্ন করিতে হইত। সে পাঠ লইবার সময় শরীর বাক্য ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও মন সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিত। গুরু উপবেশনে আদেশ করিলে বসিত। গুরুর নিকট সর্ব্বদা হীনভাব ও দীন-বেশে থাকিত। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান এবং শয়নের পরে বিশ্রাম করিত। শয়ন, আসনে উপবেশন, ও ভোজনকালে গুরুর সহিত সম্ভাষণ বা তাঁহার কোন কথা শ্রবণ করিত না। শুনিবার সময় মুখ ফিরাইয়া থাকা অসদাচার। যখন গুরু উপবেশন করিয়া আছেন তখন বসিয়া, যখন গমন করিতেছেন তখন অনুসরণ এবং যখন আসিতেছেন তখন প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার রীতি ছিল। গুরু বিমুখ হইলে সম্মুখে গিয়া, দূরস্থ হইলে নিকটে গিয়া এবং শয়ান থাকিলে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিত। পরোক্ষেও গুরুর নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাঁহার আকার ইঙ্গিত ও কথাবার্ত্তার অনুকরণ অপরাধের মধ্যে গণ্য হইত। গুরুর নিন্দাবাদ শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান বা তথা হইতে প্রস্থান করিত। ছাত্র যদি কোনরূপ যান বা আসনে থাকে তাহা হইলে অবতরণ পূর্ব্বক গুরুকে অভিবাদন করিত। প্রতিবাত বা অনুবাতে গুরুর সহিত বসিত না। গো অশ্ব উষ্ট্র শিলাফলক ও নৌকায় গুরুর সহিত বসিতে পারিত। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাঁহাকে গুরুবৎ দেখিতে হইত। পিতা উপস্থিত হইলেও গুরুর আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে অভিবাদন করিত না। গুরুপুত্র বয়সে ছোট বা বড়ই হউন তিনি অবশ্যই গুরুবৎ মাননীয় কিন্তু তাঁ-

১ যস্তূপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েত্তমাচার্য্যং বিদ্যাৎ। বি, স্মৃ,

২ না পরীক্ষিতমধ্যাপয়েৎ। বি, স্মৃ।

৩ বিদ্যা হবৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মাং সেবধিস্তেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায়
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথাস্যাম্।
যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নং
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চ নাহ
তস্মৈ মাং ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্। বি, স্মৃ,

হায় উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পাদসংবাহন করা নিষিদ্ধ। গুরুর সবর্ণা স্ত্রী গুরুবৎ পূজনীয়া কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিলেই যথেষ্ট হইত। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন তাহা হইলে তাঁহার পাদগ্রহণ দূষণীয়। 'আমি অমুক' এই বলিয়া প্রণাম করিতে হইত। এই সমস্ত সদাচার ও সভ্যতা। পূর্ব্বে অতি যত্ন সহকারে ছাত্রকে এই সমস্ত শিক্ষা করিতে হইত। সুদ্ধিকলে পদ-পদার্থ-বোধ জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে জ্ঞান হৃদয়কে বিনীত করে তাহাই জ্ঞান। প্রাচীন ভারত তাহা বুঝিয়াছিল এবং হৃদয়ের শিক্ষাকে সমধিক মূল্যবান বোধ করিত।

কেবল কতকগুলা আহার করিলেই হয় না তাহা জীর্ণ করা এবং তদ্দ্বারা রসরক্তের বৃদ্ধি করা চাই, এই জন্য ছাত্রদিগের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনধ্যায় কাল ছিল। চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র পড়িত না। গ্রীষ্ম শীত বর্ষাদি ঋতুসন্ধির দ্বিতীয়া, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ ও শক্রোত্থানে অনধ্যায়। ঝটিকাপাত, আকালিক বর্ষ বৃষ্টি বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিকদাহে অনধ্যায়। গ্রামের মধ্যে মৃতদেহ পড়িয়া আছে, দাহ হয় নাই, সে সময়ে অনধ্যায়। যুদ্ধকাল বাদ্যধ্বনি ও শৃগাল কুক্কুরাদির চিৎকারে পাঠ নিষিদ্ধ। শূদ্র ও পতিত লোকের সম্মুখে পাঠ নিষিদ্ধ। দেবমন্দির শ্মশান চতুষ্পথ ও রথ্যায় পড়িত না। কোন রূপ যান বাহনে যাইবার সময় পাঠ নিষিদ্ধ। ছাত্রের বমন বিরেচন ও অজীর্ণ এই তিন অবস্থায় পাঠ নিষিদ্ধ। দেশের রাজা বেদপারগ বিপ্র,গো ও ব্রাহ্মণের কোনরূপ বিপদ হইলে পড়িত না। রাত্রি-শেষে অধ্যয়ন করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন অবৈধ। এই সমস্ত অনধ্যায়কালে পঠিত গ্রন্থের আলোচনা হইত এবং ছাত্রেরা ইহা দ্বারা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিত।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ।

প্রাতঃকাল।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকল আত্মাতেই অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। ব্রহ্মজ্ঞানকে অগ্নির সহিত কি নিমিত্ত তুলনা করা হইল—অগ্নিতে ও ব্রহ্মজ্ঞানে কোন্ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। অগ্নির কি গুণ তাহা দেখিতে গেলে সামান্যতঃ তিনটী প্রধান বলিয়া উপলব্ধ হয়; প্রথমতঃ উত্তাপ, উত্তাপের অভাবে জড় জগতে কোন পদার্থই জীবিত থাকিতে বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না, উত্তাপ ব্যতিরেকে জীব মাত্রেরই জীবন নষ্ট হয়, হিমকলেবর মৃত্যুর এক প্রধান চিহ্ন। উত্তাপ ব্যতিরেকে যে কেবল জীব জন্তু কেহ বাঁচিতে পারে না তাহা নহে—বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, গুল্ম প্রভৃতি কোন প্রকার উদ্ভিদ্ও জন্মিতে বা জীবিত থাকিতে পারে না। সূর্য্যের উত্তাপ সম্যকরূপে প্রাপ্ত না হইলে পুষ্প বিকশিত হয় না, ফল পরিপক্ক হয় না, পত্রাদি রমণীয় শোভা ধারণ করে না, এমন কি উত্তাপের অভাবে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে না। এই রূপে যেমন দেখি যে উত্তাপ বহির্জ্জগতের জীবন এবং উত্তাপ ভিন্ন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প প্রভৃতি কিছুই জীবিত থাকিতে পারে না—কাহারই প্রাণরক্ষা হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান আত্মার প্রকৃত জীবন, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত জীবিত থাকিতে পারে না; ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন আত্মা আত্মাই নহে; ব্রহ্মজ্ঞান-শূন্য আত্মা নির্জ্জীব পদার্থের মধ্যে পরিগণিত হয়, কোন কালেই তাহার বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি হইবে না।

ঈশ্বর আমাদের আত্মা হইতে তিরোহিত হইলেই আত্মার ধ্বংস। আমরা আত্মাকে যে অবিনশ্বর বলি সে কেবল ঈশ্বরের আবির্ভাব বশতঃ; যে আত্মাতে ঈশ্বর অধিবাস করেন এবং যে আত্মা ঈশ্বরে অধিবাস করে তাহাই প্রকৃত আত্মা; আত্মজ্ঞান-ভিন্ন আত্মার অবিনশ্বরত্ব দূরে থাকুক তাহার স্থায়িত্বই সম্ভবে না, এরূপ আত্মা আছে বলিয়াই বলা যায় না; যেমন উত্তাপের অভাবে জড় জগতের জীবনের নাশ হয় সেইরূপ ঈশ্বর-জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মার নাশ হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্মে বলে যে 'যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম'।

অগ্নির দ্বিতীয় গুণ আলোক। সংসারে আলোক না থাকিলে সকলই তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত হইত। আলোক না থাকিলে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য হওয়াতে মানসিক বৃত্তি সকলও যে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিত না এবং প্রকৃতির মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল ভাব সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া আমরা পরাৎপর পরমাত্মার অপার করুণা ও নিরূপম আশ্চর্য্য কৌশল ও অনন্ত মঙ্গলস্বরূপের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই তাহাও পাইতে পারিতাম না এবং তন্নিবন্ধন আমরা ঈশ্বরজ্ঞানলাভে বঞ্চিত ও অন্যান্য অনেক প্রকারে যে কত পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম তাহার উল্লেখ করা এস্থলে অনাবশ্যক; কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পৃথিবীতে আলোক না থাকিলে পুষ্প সমুদায় সুচারুরূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারিত না, মনোহর এবং নবপল্লবাবৃত বৃক্ষ সদ্যোদ্ভূত তৃণাদি সুন্দর শ্যামল বর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারিত না, নানা বর্ণে সুশোভিত জগৎ বর্ণহীন এবং শোভাশূন্য হইত, প্রকৃতির অপূর্ব্ব কান্তি ও মধুরতা লোপ হইত এবং সমস্ত পৃথিবী কণ্টকাবৃত বনে বা বালুকাময় শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইত, শোক এবং অশান্তি জগন্ময় বিরাজ করিত। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় আলোকে আত্মা আলোকিত না হইলে মোহান্ধকারে আত্মা পরিপূরিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মার বিমল জ্যোতির অভাবে মানবাত্মা ভক্তি ও প্রেম শূন্য হইয়া শুষ্ক ও নীরস হইয়া পড়ে; ঈশ্বরের পবিত্র আলোকের অভাবে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, কি পাপ কি পুণ্য, কোনটি ঈশ্বরের অপ্রিয় ও কোনটি তাঁহার প্রিয়কার্য্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া আত্মা হতাশ হইয়া পড়ে, ধর্ম্ম অস্তমিত হওয়াতে কেবল পাপের রাজ্য আত্মাতে বিস্তৃত হয়, আমাদের একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শককে দেখিতে না পাইয়া আত্মা পথহারা, কর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করে। সেই জ্যোতির অভাবে অন্ধবৎ পাপের দুস্তর পঙ্কে পতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়।

অগ্নির তৃতীয় গুণ তাহার দাহিকা শক্তি। সেই দাহিকা-শক্তি-প্রভাবে অগ্নি যে কেবল সমুদায় ভস্মসাৎ করে তাহা নহে, দাহিকা শক্তির একটী প্রধান গুণ পদার্থ সমূহের দূষণীয় ভাগ নষ্ট করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করা। এই সদ্য-প্রকাশিত নব সূর্য্য যেমন ভূমির ক্লেদ ও নৈশ বায়ুর অস্বাস্থ্যকর পরমাণু সমস্ত নষ্ট করিয়া পৃথিবীকে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং প্রভাত-সমীরণকে স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিপ্রদ করিতেছে, অগ্নি যেমন সুবর্ণের শ্যামিকা বা অসার ভাগ নষ্ট করিয়া তাহাকে পবিত্র ও উজ্জ্বল করে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সেইরূপ আত্মার পাপ তাপ ধ্বংস করিয়া তাহাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। স্বর্গীয় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে দুশ্চিন্তা, পাপলালসা, বিষয়-তৃষ্ণা সমস্ত বিদূরিত হয়—দুষ্প্রবৃত্তি সমূহ বিনষ্ট হয়—পাপের ও সংসারের প্রলোভন সমস্ত

হীনবল হইয়া ধর্ম্মের নিকট পরাভূত হয়। তখন আর আত্মার বিকার থাকে না, পৃথিবীতে অমঙ্গল অশান্তি বিরাজ করিতে পারে না, তখন পুণ্যের প্রভাব, ধর্ম্মের বল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আত্মাতে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপন করে। তখন সকল স্থানেই ঈশ্বরের জয়, ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, বিঘোষিত হইতে থাকে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতির প্রবাহে শুষ্ক নীরস আত্মা আর্দ্র ও রসপূর্ণ হয়—অবিশ্বাসী শোক-সন্তপ্ত এবং দীনভাবে মুহ্যমান আত্মা অটল বিশ্বাসরূপ দুর্ভেদ্য কবচে সংরক্ষিত হইয়া প্রেমে ও ঈশ্বর ভাবে পূর্ণ হয়, এবং করুণাময়ের আবির্ভাবে পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিগতশোক হয়, জীবের পরম গতি পরমেশ্বরকে পাইয়া ভূমা আনন্দ লাভ করে, ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ আপাত-মনোরম পার্থিব সুখের জন্য আর শোক করে না।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি আমাদের আত্মাতে যে অবস্থিতি করিতেছে তাহা যেন সর্ব্বদা প্রদীপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত থাকে. আমাদিগের কর্ম্মদোষে যেন তাহা নির্ব্বাপিত না হয়। করুণাময় পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চন্দ্র সূর্য্য যেমন সকলেরই নিকট আপন জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, পণ্ডিত, সাধু, অসাধু কেহই যেমন দিনকর বা হিমকরের আলোক লাভে বঞ্চিত হয় না, সেইরূপ কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তিই সেই বিশ্বচক্ষু জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের বিমল জ্যোতিঃ লাভে বঞ্চিত হয় না। তাঁহার পবিত্র আলোক সকল আত্মাতেই সমভাবে প্রদীপ্ত রহিয়াছে; কিন্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যের আলোক নিয়ত প্রদীপ্ত থাকিলেও আমরা নিমীলিত নয়নে তাহা দৃষ্টি করিতে সক্ষম হই না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় আলোক সকল সময়েই প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাহার দীপ্তি কখনও তিরোভাব বা নির্ব্বাপিত না হইলেও আমরা মোহান্ধতা বশতঃ বা প্রেম-চক্ষু উন্মীলন না করা প্রযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়ের সে বিমল জ্যোতিঃ অনুভব করিতে অক্ষম হই। ভ্রাতৃগণ, যদিও এত দিন মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, এত দিন যদিও তাঁহাকে আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদিগের চিরন্তন ধন বলিয়া না জানিয়া থাকি, আমরা যেন অদ্যকার এই সাম্বৎসরিক সমাজ হইতে নূতন জীবন প্রাপ্ত হই, তাঁহাকে সর্ব্বকাল সকল অবস্থায় সমানভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে শিক্ষা করি। দিকহারা নাবিকের ধ্রুব-তারার ন্যায় তাঁহাকে যেন সর্ব্বদা আমাদিগের পথ-প্রদর্শক বলিয়া জানি. তিনি আমাদিগের এক মাত্র নেতা, তিনিই এক মাত্র পাপের মোচয়িতা ও আত্মার আলোক, তিনি যেন চির দিন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকেন, এবং তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার প্রসাদে তাঁহার আলোকেই তাঁহাকে দেখি; তিনি আমাদিগের অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রেম ভক্তি বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা যেন চিরদিন স্থির ভাবে অচল ও অটল ভাবে আত্মাতে বিরাজিত থাকে, তাঁহাকে প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কোন বাসনা যেন আমাদের মনে স্থান না পায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

অহঙ্কার এবং ঈশ্বর-প্রেম।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রথম সোপান আপনাকে জানা এবং তাহার চরম ফল ঈশ্বরকে জানা। সকল দেশের তত্ত্বজ্ঞানীর মুখেই পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ শুনিতে পাওয়া

যায়—"আপনাকে জানো"। আপনাকে জানিতে হইলে এমন একটি স্থানে দাঁড়ানো উচিত, যেখান হইতে আপনার ভাল-মন্দ সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। অহঙ্কার সেই স্থান। দিবা-রাত্রির মধ্যস্থলে যেমন সন্ধ্যা অবস্থিতি করে, সেইরূপ আমাদের মনের ভাল-মন্দের মধ্যস্থলে অহঙ্কার অবস্থিতি করে;—এ জন্য অহঙ্কার কতটুকু ভাল, কতটুকু মন্দ তাহা ঠিক্ করা সুকঠিন। পরোপকার, বিদ্যানুশীলন, কর্ম্মিষ্ঠতা এই সমস্ত ভাল বস্তুর সঙ্গেও অহঙ্কার জড়িত থাকে, আবার, নর-হত্যা, স্বেচ্ছাচার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এ সমস্ত মন্দ বস্তুর সঙ্গেও অহঙ্কার জড়িত থাকে। সহসা কাহাকেও এমন্ উপদেশ দিতে পারা যায় না যে, "তুমি অহঙ্কার পরিত্যাগ কর,"—এমনও উপদেশ দিতে পারা যায় না যে, "তুমি অহঙ্কার পোষণ কর।" অহঙ্কার নাকি বৈষয়িক অন্তঃকরণের মধ্য প্রদেশ, এজন্য আপনাকে জানিতে হইলে অহঙ্কারটিকে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক।

অহঙ্কার এমনি একটি স্থান যে, তাহাকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিলে সত্যের দ্বারে পৌঁছানো যায়, আর, সেখান হইতে নীচে নাবিলে মূঢ়তার গ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। আমরা যত্ন-পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে "আমি করিতেছি" বলিয়া সেই কার্য্যের একটি বিশেষ মূল্য আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমরা যখন মনে মনে কোন বিষয়ের সংকল্প করি, আর, কিয়ৎকাল পরে তাহাকে যখন আমরা কোন একটি কার্য্যে ফলিত করি, তখন সেই কার্য্যের দর্পণে আমরা আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া গর্ব্বিত হই,—এইরূপ, আপনার কার্য্যের মধ্যে আপনাকে দেখা অহঙ্কারের লক্ষণ, "অহংকর্ত্তা" এইরূপ বোধের নামই অহঙ্কার। যদি আমরা কোন কার্য্য না করি বা কার্য্য করিবার অভিলাষ না রাখি, তবে আমরা অহঙ্কার হইতে মুক্তি পাইতে পারি বটে; কিন্তু তাহা করিলে অহঙ্কার ছাড়াইয়া উপরে ওঠা হয় না, অহঙ্কার হইতে আরো নীচে নাবিয়া যাওয়া হয়,—সেখানে নিশ্চেষ্টতা এবং মূঢ়তা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। জড়তা এবং মূঢ়তা অপেক্ষা অহঙ্কার ভাল বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে সর্ব্বাংশে ভাল তাহা নহে। একদিকে যেমন অহঙ্কার কার্য্যের উৎপাদক, আর এক দিকে তেমনি তাহা কার্য্যের সংহারক। আমরা আপনার কৃত কার্য্য মনে মনে রোমন্থন করিয়া যতটা সময় নষ্ট করি, ততটা সময় সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে অনেক ফল ফলিতে পারে। "আমি করিতেছি" এ ভাবটি আমাদের মনোমধ্যে যত প্রচ্ছন্ন থাকে, ততই কাজ ভাল হয়; আর, যতই তাহা আমাদের চক্ষের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, ততই আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে আড়ালে ফেলিয়া আমাদের ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়। ইউরোপে সাধারণ-তন্ত্র প্রচলিত করিবার জন্য যে হস্তে নেপোলিয়ন বিশ্ব-বিজয়ী মন্ত্রপূত অসি ধারণ করিয়াছিলেন—অবশেষে তিনি সেই হস্তে আপনার মস্তকে রাজ-মুকুট আরোপন করিলেন,—ইহা কিরূপ কার্য্য? হায়! নেপোলিয়ন এবং তাঁহার মূল অভিসন্ধির মধ্যস্থলে অহঙ্কার রূপ তমো আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির একেবারেই মূল বিধ্বস্ত করিয়া দিল। এই সকল দেখিয়া অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতে মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির সতর্ক হওয়া উচিত। যশোলিপ্সা সৎকার্য্যের একটি প্রবল উত্তেজক—ইহা খুবই সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের মূল উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করিতে দেওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। টাকার যেমন এক

হিসাবে মূল্য আছে এক হিসাবে কোন মূল্যই নাই, যশেরও ঠিক্ সেইরূপ। এক জন রবিন্‌সন্ ক্রুসোর নিকট সহস্র মুদ্রা অপেক্ষা এক মুষ্টি ধান্য সহস্র গুণ মূল্যবান,—পথহারা ঈশ্বরান্বেষী ব্যক্তির নিকট সহস্র-যোজন-ব্যাপী যশ অপেক্ষা তিলপ্রমাণ ঈশ্বর-প্রেম সহস্র গুণ মূল্যবান্। টাকা যেমন দেহের পুষ্টি-সাধক খাদ্য-সামগ্রী নহে, যশও সেইরূপ হৃদয়ের পুষ্টি-সাধক অন্ন নহে। উভয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই নহে,—কোন সংসার-কার্য্যের প্রবর্ত্তক হওয়াতেই উভয়ের যত কিছু মাহাত্ম্য। যশস্বী ব্যক্তি লোককে সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সৎপথে প্রবৃত্ত করিতে পারেন বলিয়াই যশের এত মহিমা;—নচেৎ যশকে কেহ সঙ্গে করিয়া আনেনও নাই কেহ সঙ্গে লইয়া যাইবেনও না। যথার্থই যদি কোন ব্যক্তির কোন অসাধারণ ক্ষমতা বা সদ্গুণ থাকে তবে লোকে তাহা জানিলে ভাল হয়, কেননা তাহা হইলে সে সদ্গুণ বা ক্ষমতা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া বিফলে যায় না—লোকসমাজে যথোচিত স্ফূর্ত্তি পাইতে পায়; এই খানেই যশের আবশ্যকতা—এই খানেই যশের সার্থকতা। যশ বল, খ্যাতি-বল, মান মর্য্যাদা বল, সমস্তই আপনার এবং অন্যের মঙ্গল-সাধনের জন্যই আবশ্যক, আপনার কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিবার জন্য নহে। অর্থ-কৃপণ ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া লোহার সিন্দুকের টাকায় টাকায় আপনারি প্রতিবিম্ব অবলোকন করেন,—"আমিই ইহার স্বামী" এই তত্ত্বটি অবলোকন করেন। যশঃকৃপণ ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া আপনি কবে কি কার্য্য করিয়াছেন ও তদুপলক্ষে কবে কোন্ সংবাদ পত্রে কি বলিয়াছে, তাহাতে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখেন,—দেখেন যে ঐ কার্য্য-গুলির আমিই কর্ত্তা। যশ কিছু মন্দ সামগ্রী নহে; যশের সাহায্যে গুণবান্ এবং ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরা আপনাদের গুণ এবং ক্ষমতা দূর দূর দেশ পর্য্যন্ত অনেকের মনে উদ্বোধিত করিয়া দিয়া পৃথিবীর অনেক উপকার সাধন করেন—আরো করিতে পারিতেন যদি অহঙ্কার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের মূল অভিসন্ধিকে আড়াল করিয়া না দাঁড়াইত। যশের সম্মুখে যখন অহঙ্কার আসিয়া অভীষ্ট মঙ্গল কার্য্যের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখনই তাহার গাত্রে দোষ পোঁছে। পৃথিবীর মহাত্মারা স্বীয় কার্য্যকে দূরবীক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ভাবী মঙ্গলের রাজ্য প্রত্যক্ষ করেন—সে রাজ্যে তিনি আপনার নাম দেখিতে পান না—সেই নাম দেখেন যিনি "নামরূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা"—যে নাম চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে,—ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি মৃত্যু-কালেও সে নাম হৃদয়ের ভিতর করিয়া লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার কার্য্যকে দর্পণ করিয়া তাহাতে কেবল আপনারই নাম দেখিতে থাকেন, তিনি কি দেখেন? দর্পণে ফুৎকার দিলে তাহাতে যে এক রত্তি মেঘের সঞ্চার হয় তাহাই দেখেন—তাহা কিছুই নহে।

আমাদের মন যদি বৃথা অহঙ্কারের রাজ্য ছাড়াইয়া ঈশ্বর-প্রেমের রাজ্যে উত্থান করিতে পারে, তবে এমন একটি নিরাপদ কূল প্রাপ্ত হয় যেখানে মিথ্যার তরঙ্গ পৌঁছিতে পারে না। সেখানে ইন্দ্রিয়াতিগ এবং নিরহঙ্কার সত্য আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। এখানে আমরা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যে কোন কার্য্য করি সে সত্যের নিকটে তাহা আমলে আসে না, অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে কোন কার্য্য করি তাহাও আমলে আসে না—আমরা বিশুদ্ধ অন্তঃ-

করণে, বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ে যে কোন কার্য্য করি তাহাই সেখানে পৌঁছিতে পায়। সত্য যখন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি চিরস্থায়ী আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখকে সার করিলে? ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি তাহার কি উত্তর দিবে? কিছুই না। সত্য যখন অহঙ্কারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমার কিই এমন বিজ্ঞতা—কতদিনকার বহুদর্শিতা যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া তোমার আপনার বুদ্ধিমত্তাকে সার করিয়াছ! তোমার বুদ্ধি কতটুকু—তোমার বল কতটুকু—তোমার জ্ঞান জন্মিয়াছে কতটুকু সময়ের মধ্যে—তোমার পরীক্ষার আয়তন সৌর জগতের কতটুকু অংশ—অহঙ্কারী ব্যক্তি ইহার কি উত্তর দিবেন? কিছুই না। কি ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির সুখস্বপ্ন—কি অহঙ্কারের স্বকপোল-কল্পিত স্বপ্রধানতা—সত্যের নিকটে উভয়ের কাহারো এক কড়াও মূল্য নাই। মূল সত্য ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নহে, মূল সত্য ইন্দ্রিয়াতীত;—মূল সত্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের মনঃকল্পনার বশীভূত নহে, মূল সত্য অভিমানশূন্য। অতএব এ কথাটি অতীব সত্য যে, ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং অহঙ্কার ছাড়াইয়া না উঠিলে কোন-প্রকারেই ঈশ্বরপ্রেমের নাগাল পাওয়া যাইতে পারে না।

সকল শাস্ত্রেই বলে যে, মনঃসংযম করা ঈশ্বর-সান্নিধ্য-লাভের একটি প্রধান উপায়। মনঃসংযম করিতে হইলে মনের দুই দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক—কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তির দিক্ এবং অহঙ্কারের দিক্। প্রবৃত্তি দমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে এই যে এক অহঙ্কার উপস্থিত হয় যে, “আমি প্রবৃত্তি দমন করিতেছি” এই অহঙ্কারটিকেও দমন করা উচিত। ইন্দ্রিয়াসক্তি সাক্ষাৎ তমোগুণ, অহঙ্কার সাক্ষাৎ রজোগুণ; দুইকে ছাড়াইয়া উঠিলে তবেই সত্ত্বগুণের নির্ম্মল আকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়;—সেইখানেই আমরা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারি।

ঈশ্বরের প্রেমময় সান্নিধ্য আমাদের অন্তঃকরণের স্পর্শমণি। তাহাতে আমাদের বিষয়-লালসা শান্ত হইয়া যায়, অহঙ্কার প্রেমকে আপনার সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া আপনি তাহার কিঙ্কর হইয়া করযোড়ে এক-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। তখন আমাদের কার্য্য আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তখন আমরা আমাদের ঠিক অধিকারটি বুঝিতে পারি, ও সেই অধিকারটির ভালরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হই। বড় হইবার ইচ্ছা সকল লোকেরই আছে—কিন্তু সকল লোকের অধিকার কিছু আর সমান নহে। অহঙ্কারী ব্যক্তি-মাত্রই মনে করেন যে, আমি সকল অপেক্ষা বড়; ডন্‌কুইক্‌সোট্ মনে করিতেন যে, আমার মত বীর-পুরুষ আর জগতে নাই,—কেহ বা মনে করিতেন যে, আমিই ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র—ঈহুদী জাতি মনে করেন যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির মধ্যে আমরাই একা কেবল ঈশ্বরের মনোনীত,—এ তো কেবল জনের জনের মনের কল্পনা, কিন্তু সত্য কি? সত্য যাহা তাহা অতি সুন্দর,—তাহা এই;—সকল লোকেরই এক একটি অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, সে অধিকার কার্য্য-দ্বারা বাড়ানো কমানো যায়। ঈশ্বর-প্রেমের রশ্মি যে ভাগ্যবান্ পুরুষের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তিনি আপনার অধিকারের মধ্যেই সেই প্রেমোচিত কার্য্য করিয়া রাজাধিরাজ অপেক্ষাও আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করেন—আপনার অধিকার উল্লঙ্ঘন করাতে তিনি এক বিন্দুও স্বার্থ দেখিতে পা’ন না। লোকে তাঁহাকে বড় বলুক বা না বলুক্ তিনি আপ-

তার অধিকারের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া তবেই তিনি মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হ'ন। ঈশ্বর যাঁহাকে যে শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন—তিনি সেই শ্রেণীর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেই ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি উচ্চ শ্রেণীতে উঠাইয়া দেন,—এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কাজের লোক কে?

(বালক হইতে উদ্ধৃত)

আজ প্রায় চার-শ বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যবসা বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে—সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্ম্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্ম্মের দিকে—সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোন কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভাল ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্ম্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা নানকের চেহারা নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল। এমন কি নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় না কি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই—নানকও কখন এ গল্প করেন নাই—এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখন শুনি নাই—শুনিলেও বড় বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন নানক যদি নিজের হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন—বলিয়া দিলেন "এক গাঁয় লুণ কিনিয়া আর এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।" নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুণ কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন এই ফকিরদের কাছে ধর্ম্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই—এমনি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড় দয়া হইল—তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন "আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে লুণের ব্যবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ

লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে। দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে, আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া, যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।" বালসিন্ধু কাজের লোক ছিলেন বটে কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল "এ বড় ভাল কথা।" নানক তাঁহার ব্যবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তা-হারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল, তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল—ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এ সকল কথা শুনিয়া নান-কের মনে বড় আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন "কত লাভ করিলে?" নানক বলিলেন "বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধন লাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থা-কিবে।" কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড় একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হই-য়াছে? এত গোল কেন?" যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন "আর যদি কখন নানকের গায়ে হাত তোল ত দেখিতে পাইবে।" এমন কি রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন এই জন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতাধরা সমস্তই গুজব—আসল কথা নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্ত লোক। নানকের উপর আর ত মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলৎ খাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন—তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা।" এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপ-স্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের উপরেই তাঁহার ভাল-বাসা ছিল এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই, তিনি ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"নানক, তুমি আজ-কাল কি লইয়া আছ বল দেখি? এ সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া-দাও। চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।"—ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর—পরের উপকার কর—পৃথিবীর ভাল কর—ঈশ্বরে মন দাও—টাকা রোজকার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশী কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নান-কের মনে লাগিল, যে তিনি চমকিয়া উঠি-

গেলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতেই তিনি গরীব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। কাজ-কর্ম্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্ম্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দ্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল, সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই যে পুরাণো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুণ বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল। এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধন-লাভের আশা ছিল, কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না—তাহার বয়স বেশী হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্‌ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন। হিন্দু ধর্ম্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্ম্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাঙ্গালা দেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভু বলিয়া কোন্ এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। [illegible] নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্টিয়া রাজাকে তিনি ধর্ম্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না—তিনি বলিলেন "যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই আর কাহারো কাছে চাই না।" নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মস্‌জিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতে ছিলেন। তাহাই দেখিয়া একজন মুসলমানের বড় রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল—"তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!" নানক বলিলেন "আচ্ছা ভাই জগতের কোন্‌দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও।" নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোন আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্তলোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল—"আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু—আমাদিগকে একটা কোন আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।" নানক বলিলেন "তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্ম্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না, ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অসার।"

নানক অনেক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া [illegible] গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরাণ পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন [illegible] ঈশ্বরের পূজা কর, ধর্ম্মে মন

দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জ্জনা কর, সকলকে ভালবাস। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্ম্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশী কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশী কাজের লোক ছিল আজ তাহার হিসাব করিয়া দেখদেখি! আজ যে শিখজাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয় এই শিখ্‌জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্ব্বে এই শিখজাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্ম্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল, নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন আজ চার-শ বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে! কে বেশী কাজ করিয়াছে।

সমালোচনা।

The Interpreter. Edited by P. C. Mazumdar.

ব্রাহ্মসমাজের মত ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে সুসময়ে বঙ্গদেশে এই ইংরাজি মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মদিগের মতের অনৈক্যই সকলের চক্ষে পড়িতে হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে যে সুগভীর ঐক্য রহিয়াছে তাহা কেহ আলোচনা করিতেছেন না। এই পত্রে ব্রাহ্ম-সমাজের সেই ঐক্য সাধারণের নিকটে প্রচার করা হইবে। সম্পাদক [illegible] শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সূচনায় লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা মূল মর্ম্ম তাহাই এই পত্রের আলোচ্য, যাহা কিছু গৌণ ও ব্যক্তিবিশেষগত তাহা পরিহার করা যাইবে। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা হইবে। যে সকল ভ্রম ও বিদ্বেষভাব থাকাতে ব্রাহ্মসমাজের উপরে ব্রহ্মের বিমল জ্যোতি বিকিরণের ব্যাঘাত সাধন করিতেছে, সে সমস্ত দূরীভূত করিয়া দেওয়া এই পত্রের মহান্ লক্ষ্য হইবে। আমরা প্রার্থনা করি প্রতাপ বাবুর এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।

প্রথম সংখ্যক “ইণ্টারপ্রিটর” পত্রের প্রবন্ধগুলি সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে সম্পাদকের সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহার সকল লেখার সহিত আমাদের মতের ঐক্য হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনৈক্য গুলির উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কেবল National Christianity অর্থাৎ স্বজাতীয় খৃষ্টধর্ম্ম নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মত ব্যক্ত করিতেছি। খৃষ্টধর্ম্ম এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই এমন অনেক কথা আছে, যাহা সকল জাতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিতে পারে। দেবতাকে ভক্তি করা, সত্য কথা বলা বা পরোপকার করা, এগুলি কোন ধর্ম্মবিশেষের বিশেষত্ব নহে। National Christianity বলিতে যদি প্রতাপ বাবু খৃষ্টধর্ম্মের এমন কোন অংশ বা ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, যাহা আমাদের দেশে আমাদের জাতির মধ্যে নির্ব্বিরোধে গ্রাহ্য হইতে পারে, আমাদের হৃদয়ে সহজেই প্রতিভাত হয়, তবে সেই অংশ-মাত্রকে খৃষ্টধর্ম্ম নাম দেওয়া যাইতে পারে না। খৃষ্ট-ধর্ম্মের যাহা মূল বিশেষত্ব তাহাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম, তাহা কখনই আমাদের স্বজাতীয় হইতে পারে না। যিশু খৃষ্টের রক্তে সমস্ত মানবজাতির পাপ ক্ষালিত হইয়া যাওয়া এবং এই উপায়ে ঈশ্বরের ন্যায়পরতা চরিতার্থ হওয়া, যিশুখৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপনীত হওয়া, এই খৃষ্টধর্ম্মের মূল মর্ম্ম। এ ভাব আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমাদের ন্যায়পরতার আদর্শ স্বতন্ত্র। আমাদের শাস্ত্রে আছে—

> একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
>
> একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতং।

"একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।" অতএব আমাদের দুষ্কৃতির জন্য আর কেহ দায়ী হইতে পারে না।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।—

"ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দেখেন।" অতএব আমরা কেবল ঈশ্বর-প্রসাদে আত্মপ্রভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি, দ্বিতীয় কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী করিবার আবশ্যক নাই।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়

"তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।"

অতএব খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আর যাহাই বলা হউক্ ইহাকে স্বজাতীয় বলা যাইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মের যে সকল সত্য আমাদের গ্রহণীয় তাহা হিন্দুধর্ম্মেও আছে অতএব সে হিসাবে হিন্দুধর্ম্মকেও খৃষ্টধর্ম্ম বলিতে হয়, খৃষ্টধর্ম্মকেও হিন্দুধর্ম্ম বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মূলে অনৈক্য থাকাতেই হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পার্থক্য হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা যে প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ ও পরিপাক করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" প্রতাপ বাবু সূচনায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "এই পত্র ব্রাহ্মসমাজের ঐক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে" উল্লিখিত কথায় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয় নাই। আমরা উন্নত কি অবনত সে কথা হইতেছে না, কোন ব্রাহ্মসমাজ উন্নতির অভিমান করিয়া থাকেন তাহাও আমরা জানি না, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে খৃষ্টধর্ম্মের ... আদি ব্রাহ্মসমাজ আত্মসাৎ (assimilate) করেন ... সকলেই জানেন। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজে ... প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সম্পাদকের উক্তি অসঙ্গত ... "ইন্টারপ্রিটর" পত্রের ... প্রতি আমাদের ... অনুরাগ আছে, পাছে এই শুভ উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয় তাই এত কথা বলিতে হইল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়
" ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" কালীকৃষ্ণ দত্ত
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
" শ্রীনাথ মিত্র
" দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক ও ...।

শ্রীযুক্ত ...মণি চট্টোপাধ্যায়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫০৩ সংখ্যা — আষাঢ় ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ — ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অতিথি।

মরমে মরমে মেঘে বহে জল
মেঘ তা ভাবিয়া আনে না,
প্রাণে প্রাণে পূরে রয়েছে মরুত
সে সম্বাদ সে তো জানে না।

শত রশ্মি রবি না পাইত যদি
সে কি তা ভাবিয়া আনিত?
বিদ্যুতাগ্নি নাহি বহিলে মরমে
বিজলি কি নিজে চকিত?

কেন নদীপূরে সলিলে সাগর
নদীরে যোগায় কেইবা,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে ফল
কালে কালে আনে কেইবা।

যার যা রয়েছে সে তাহা পেয়েছে
যাহার যা পাইবে, প্রীতি,
আপন ভাবনা ভাবে না তো কেউ
জগতে ইহারা অতিথি।

[illegible] গো ইহারা আপন ভাবনা
[illegible] আছে আমাদের

এ তত্ত্ব নিগূঢ় করিলে স্মরণ
আনন্দ উথলে মরমে।

অজ আত্মযোনি অদ্বিতীয় এক
ভাবেন বিশ্বের ভাবনা,
অকাম আপনি পরের লাগিয়া
রাখেন মঙ্গল কামনা।

ঘুম পাড়াইয়া সকলেরে যিনি
আপনি থাকেন জাগিয়া
খেতে দিয়ে মুখে রসনায় দেন
মধুর আস্বাদ আনিয়া।

তাঁরি প্রেম সুধা হয়ে বিকসিত
যার যা অভাব পূরিছে,
তাঁরি গূঢ় প্রেমে মগন সবাই
আপন ভাবনা ভুলিছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরমাত্মার সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধেই আমরা অবিনশ্বর

আত্মা বলিয়া আমাদের পরিচয় দিতে পারি। যাহা আমাদের, তাহা পরমাত্মা ছাড়া আর কোথা হইতেও আসিতে পারে না। বহির্বিষয়-হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আসিতে পারে; আর আমাদের মন যখন সম্যক্‌রূপে তাহাদেরই অধীনতা স্বীকার করে তখন আমরা বহির্বিষয়েরই দল-ভুক্ত হইয়া যাই—তখন আর আত্মা বলিয়া আমাদের পরিচয় দিতে পারি না। যখন আমরা পরমাত্মার অধীনতা স্বীকার করি তখনই আমরা প্রকৃত রূপে আত্মা হই,—সেই আত্মা—যাহার উপরে কালের কোন হস্ত নাই—মৃত্যুর কোন হস্ত নাই। কোন নৈয়ায়িক যদি হঠাৎ শুনেন যে, পরমাত্মার অধীনতাই আত্মার স্বাধীনতা, তবে তিনি হয় ত বলিবেন যে ও কথাটি অতি অসঙ্গত,—পরের অধীনতা কেমন করিয়া আপনার অধীনতা হইবে—স্বাধীনতা হইবে। তিনি জানেন না যে, পরমাত্মা আমাদের পর নহেন,—বরং আমরা আপনারা অনেক সময়ে আমাদের পর হই,—যখন বহির্বিষয়ের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে আমরা আত্ম-সমর্পণ করি—তাহারই ক্রীত দাস হই—তখন আর আমরা আপনার থাকি না, তখন আমরা নিতান্তই আপনার পর হইয়া দাঁড়াই—তখন আমাদের স্বাধীনতা কৃত্রিম স্বাধীনতা—সে স্বাধীনতা ছদ্ম-বেশী পরাধীনতা—তাহাকে বলে স্বেচ্ছাচারিতা। প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা ছদ্মবেশী কপট বন্ধুকে যেমন অধিক ভয় করা উচিত, সেইরূপ প্রকাশ্য পরাধীনতা অপেক্ষা ছদ্মবেশী কৃত্রিম স্বাধীনতাকে অধিক ভয় করা উচিত। ঈশ্বরের অধীনতা কেবল নামেই পরাধীনতা—কাজে স্বাধীনতা। ভক্তিভাজন পিতার অধীনতা কি পুত্রের স্বাধীনতা নহে,—প্রিয়তম স্বামীর অধীনতা কি স্ত্রীর স্বাধীনতা নহে—কে বলে যে, তাহা পরাধীনতা? ভক্তি-ভাজন পিতা কি পুত্রের পর; প্রিয়তম স্বামী কি পত্নীর পর;—তবে আর তাহা পরাধীনতা কি প্রকারে? অন্তরতম পরমাত্মা কি আত্মার পরম প্রেমাস্পদ নহেন;—"তিনি পর" এ কথা কি মুখে আনিবার যোগ্য। অতএব ইহা ধ্রুব সত্য যে, পরমাত্মার অধীনতাই আত্মার স্বাধীনতা। বহির্বিষয় আমাদের মঙ্গল কার্য্যে বাধা প্রদান করে—পরমাত্মা আমাদের মঙ্গল-কার্য্যের সহায়তা প্রদান করেন,—কে আমাদের পর—বহির্বিষয় না পরমাত্মা? বহির্বিষয় আমাদের চক্ষে প্রলোভনের ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে—পরমাত্মা আমাদের জ্ঞাননেত্র ফুটাইয়া দেন,—কে আমাদের পর—বহির্বিষয় না পরমাত্মা? বহির্বিষয় আমাদের হস্ত-পদ বন্ধন করে—পরমাত্মা আমাদিগকে মুক্তি দেন,—কে আমাদের পর—বহির্বিষয় না পরমাত্মা? কেহ বলিতে পারেন যে, "বহির্বিষয় যদি এতই আমাদের পর—এতই অনিষ্ট-জনক, তবে তাহা না থাকিলেই তো ভাল হইত?" এ কথা কোন কাজের কথা নহে। বহির্বিষয়ের যদি কোন প্রয়োজনই না থাকিত—তবে ঈশ্বরের মঙ্গল-রাজ্যে কখনই তাহা স্থান পাইতে পারিত না। বহির্বিষয়ে প্রয়োজন এই যে, আমরা তাহাকে আত্মার বশে আনয়ন করিয়া আত্মার বল-বীর্য্য সাধন করিব,—এ নহে যে, আমরা তাহার অধীনতায় মস্তক পাতিয়া দিব। বহির্বিষয়কে যত আমরা আত্মার অধীন করিতে পারিব, পরমাত্মা-হইতে ততই আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইব; আর, যত আমরা আত্মাকে পরমাত্মার অধীন করিতে পারিব, ততই আমরা বহির্বিষয়কে আত্মার বশীভূত করিতে পারিব। এ কথাটি ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করা আবশ্যক।

সকল আত্মাই পরমাত্মা হইতে স্বাধী-

নতা প্রাপ্ত হইতেছে,—সেই স্বাধীনতাকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইয়া ফল ফলা'ন, তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে তত অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য;—ঈশ্বর যিনি সাক্ষাৎ ন্যায়স্বরূপ তিনি কখন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত ফল লাভে বঞ্চিত করেন না;—যে কেহ তাঁহার প্রদত্ত স্বাধীনতাকে রীতিমত খাটাইয়া বহির্বিষয়কে আত্মার অধীনে আনয়ন করে, তাহারই তিনি স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিয়া দেন,—তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার আত্মাতে স্বাধীনতার সম্বল বৃদ্ধি করিয়া দেন, ও তাহার অলক্ষিত-ভাবে তাহার স্বাধীনতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিয়া দেন।

বহির্বিষয় কেবল যে, বিষয়ী ব্যক্তিরই ভোগে আসে, ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি যে বহির্বিষয়ের ভোগে বঞ্চিত, তাহা নহে,—বরং তাহার বিপরীত। বহির্বিষয়েতেও ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি পরমাত্মার প্রতিরূপ অবলোকন করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন—কিন্তু তাহা প্রতিরূপ-মাত্র। অনুপম পূর্ণ পরমাত্মার কোথাও উপমা নাই। তথাপি, পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে, তখন সেই ক্ষণিক পূর্ণতাতে ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি পরমাত্মার অসীম চিরস্থায়ী পূর্ণতার ছবি অবলোকন করেন; পশু পক্ষীরা যখন পূর্ণ যৌবনে সুখে সঞ্চরণ করে, তখন তাহাতেও তিনি পরমাত্মার অসীম পূর্ণতার আভাস প্রত্যক্ষ করেন,—মনুষ্য-সমাজের তো কথাই নাই। মনুষ্য-সমাজে যখন তিনি কাহাকেও এই বাক্যটির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখিতে পা'ন যে, "তিনি যুবা, তিনি সাধু যুবা, তিনি আশিষ্ঠ দ্রঢিষ্ঠ বলিষ্ঠ" তখন তিনি পরমাত্মার পূর্ণতার আবির্ভাব দেখিয়া কত না আনন্দ লাভ করেন। পুষ্প পশু পক্ষী প্রভৃতির যৌবনের পরেই পূর্ণতার অবসান হয়, মনুষ্যের তাহা নহে; মনুষ্যের আত্মা অনন্তকাল পূর্ণতা-লাভের অধিকারী,—যাহা কিছু আকার-বিশিষ্ট তাহার পূর্ণতার অন্ত আছে—আত্মার পূর্ণতার অন্ত নাই। পৃথিবীর রস পুষ্পেতে পূর্ণতার সঞ্চার করে, পৃথিবীর শস্য জীব-শরীরে পূর্ণতার সঞ্চার করে,—সে পূর্ণতা কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়াই আবার সেই পৃথিবীতেই বিলীন হইয়া যায়। মনুষ্যের আত্মাতে স্বয়ং পরমাত্মা পূর্ণতার সঞ্চার করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম মনুষ্যের আত্মার চিরস্থায়ী সম্বল,—অনন্ত কালের উপজীবিকা। মনুষ্যের আত্মার পূর্ণতা-লাভের অন্ত নাই! মনুষ্য যদি আপনার উচ্চ অধিকার অবগত হইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করে ও মনুষ্যোচিত আনন্দ উপভোগ করে, তবে পৃথিবী তাহাকে আর ধরা-শায়ী করিতে পারে না,—তবে, জ্যোতির্ম্ময় আত্মা মুক্তির আনন্দে উত্থান করিয়া—পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া—প্রেম-ভক্তি-রসে আর্দ্র হইয়া—সেই নূতন জীবন প্রাপ্ত হ'ন—যাহা মৃত্যুর পরপারে অবস্থিতি করে।

হে পরমাত্মন্! আমরা সংসার অন্ধকারে অসহায় হইয়া পড়িয়া আছি তুমি আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—আমরা অসত্যের মোহজালে জড়িত হইয়া পড়িয়া আছি তুমি আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও; আমরা মৃত্যুর রাজ্যের অভ্যন্তরে বাস করিতেছি তুমি আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও! তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের জীবন জীবন্ত মৃত্যু,—তোমার প্রেমময় সান্নিধ্যই আমাদের জীবন! আমাদিগকে সংসার-সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর—তোমার মুখ-জ্যোতি আমাদের অন্তশ্চক্ষে অনাবৃত কর! আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা তোমার পূর্ণতা ধারণ করিতে অসমর্থ কিন্তু তোমার অবলম্বন না পাইলে আমাদের গতি নাই; তুমি আমা-

দিগকে আশ্রয় না দিলে আর কে আমাদিগকে আশ্রয় দিবে—কে আমাদের এমন আপনার যে, আমাদের আত্মার অভাব মোচন করিবে; তোমার এক বিন্দু মুখজ্যোতি আমাদের আত্মাতে নিপতিত হইলে আমাদের রোগ শোক জরা-ব্যাধি ভয় বিপত্তি সমস্তই চলিয়া যাইবে তুমি আমাদের ক্ষুধিত আত্মাকে আশ্রয় দান কর- এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সোণায় সোহাগা।

সমাজ-সংস্কারকদিগের, এই একটি সহজ সত্যের প্রতি, সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, সভ্য সমাজ মাত্রই ভাল মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য সমাজ নাই যাহার ষোলো আনাই মন্দ কিম্বা যাহার ষোলো আনাই ভাল। কোন সভ্য মনুষ্যেরই এমন কোন দায় পড়িতে পারে না যে, তাহাকে তাঁহার স্বজাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও আর-এক জাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককালে ইংলণ্ডে নর্ম্মান্ জাতির বড় বড় প্রতাপ ছিল। নর্ম্মানেরা মনে করিত তাহাদের আপনাদের রীতি নীতি ষোলো আনাই ভাল ও সাক্সন্ রীতি-নীতি ষোল আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদান অধিকাংশই সাক্সন্- তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস্ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রে "পঞ্চভূতের পঞ্চীকরন" বলিয়া একটা মিশ্রণ-পদ্ধতি আছে,—যে কোন ভূত হউক্ না কেন (যেমন জল কিম্বা বায়ু) তাহার নিজের আট আনা ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা দুই আনা করিয়া চারি-দুগুণে আট আনা— এই দুই আট আনার সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা পঞ্চীকৃত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল পঞ্চীকৃত বায়ু, ইত্যাদি); তেমনি ইংরাজি সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে যে, তাহা পঞ্চীকৃত সাক্সন্ সভ্যতা। ইংরাজি সভ্যতার আট আনা সাক্সন্ এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা লাটিন্, দুই আনা গ্রীক্, দুই আনা ফরাসিস্, ও দুই আনা কেল্ট্। সাক্সন্ মূল উপাদান, ইংরাজি সভ্যতার কেন্দ্র বা পত্তন ভূমিকে এমনি বলপূর্ব্বক কামড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাহাকে রাজবংশের দিক দিয়া ফরাসিস্ টানিয়াছে, ধর্ম্মরাজ্যের দিক দিয়া লাটিন্ গ্রীক্ টানিয়াছে, আদিম নিবাসীর দিক্ দিয়া কেল্ট্ টানিয়াছে,—কেহই তাহাকে কেন্দ্র-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। নর্ম্মান্ কঙ্কেস্টের গ্রন্থকার ফ্রীম্যান্ বলেন;—"ইংলণ্ড-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মানেরা ব্যাপক রকমের এক বৈদেশিক অনুপান সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা এরূপ যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজ-নিয়ম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তবুও তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে; পূর্ব্বতন দৃঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবুও, অব্যাহত-রূপে টেঁকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা সাম্‌লাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ করিল।*" অর্থাৎ সাক্সন্ মূল উপাদান কিয়ৎ-

* The Norman conquest brought with it a most extensive foreign infusion, an infusion which affected our blood, our language, our laws, our arts, still it was only an infusion; the older and stronger elements still survived, and in the long run they again made good their supremacy.

কাল গোপনে থাকিয়া আবার তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদান গুলি অব্যাহত রাখিয়া তাহার সঙ্গে কিছু কিছু করিয়া অপর-জাতীয় সভ্যতা অনুপান-স্বরূপে মিশাইয়াছে; আমরা যদি সেইরূপ পঞ্চীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়,—তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উর্ব্বরা করিয়া তুলে, তাহাতে—সোণায় সোহাগা হয়; নচেৎ, যদি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর কোন-জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে আমাদের দেশের শস্য-শালিনী উর্ব্বরা ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থানটি অন্য দেশের কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট্ করিবার জন্য বৃথা আয়াস পাই মাত্র, তাহাতে—হিতে বিপরীত হয়

এড্ওয়ার্ড-দি-কন্‌ফেসর একজন সাক্সন রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন ছিল—সম্পূর্ণ ফরাসিস্। শ্রীমান্ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন; "এড্ওয়ার্ড, সজ্ঞানেই হউক্ আর অজ্ঞানেই হউক, নর্ম্মাণদিগের বিজয়ের পথ আরো নিষ্কণ্টক করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বদেশে উচ্চ-পদের বা লাভের যেখানে যে-কিছু প্রাপ্তব্য স্থান সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত অধিকৃত হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া ঐ বিপত্তি তিনি ঘটাইয়াছিলেন। নর্ম্মাণদিগের কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের সূত্রপাত এড্ওয়ার্ড হইতেই হইয়াছিল।" * এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এডওআর্ড-দি-কন্‌ফেসর্ ইংলণ্ডের বিভীষণ ছিলেন। নর্ম্মান্-কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের মূলই ছিলেন তিনি; তাঁহার মন্ত্রী গড্ওয়াইন আর-এক ধাঁচার লোক ছিলেন বলিয়া—তাই-যা' একটু রক্ষা। শ্রীমান্ বলেন,—"গড্ওয়াইন্ যে, সমস্ত ইংরাজ ভাবের প্রমাণ-স্থল ছিলেন, তিনি যে, সমস্ত জাতীয় আরম্ভোদ্যমের নেতা ছিলেন, তিনি যে, আপনার অসাধারণ গুণ-গৌরবে অন্ততঃ তাঁহার নিজস্ব ভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যার পর নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।" * এখানে এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কেবল এইটি দেখানো যে, আমরা, এডওআর্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের দেশের কোন উপকারেই আসিতে পারি না, —লাভের মধ্যে তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গড্ওয়াইনের ন্যায়, স্বজাতীয় সভ্যতার পত্তন-ভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; তাহার উপরে অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী নানাজাতীয় সভ্যতা মাধুর্য্যের সহিত যথাকালে যথাদেশে যথাপরিমাণে ধীরে-সুস্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হইতে পারে,—তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সোণায় সোহাগা হয়।

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত, কিন্তু

* Edward did his best wittingly or unwittingly, to make the path of the Norman still easier. This he did by accustoming Englishmen to the sight of strangers enjoying every available place of honor or profit in the country. * * * * With Edward then Norman conquest really begins."

* That Godwine was the representative of all English feeling, that he was the leader of every national movement, that he was the object of the deepest admiration of the men at least of his own earldom, is proved by the clearest of evidence.

তাঁহার কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই; আর-এক ব্যক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার দৌড় অনেক দূর পর্য্যন্ত;—যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পা'ন, কিম্বা যদি শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির হৃদয় পা'ন, তবেই সোণায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের পদতলে এবং আমাদের দেশের হৃদয় আমাদের স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের পদতলে বাঁধা রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত্ব, অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোণায় সোহাগা করিয়া তুলে; কিন্তু যদি আমরা আমাদের দেশের হৃদয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি, তবে যে শাখায় আমরা উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা স্বহস্তে কর্ত্তন করি! আমরা আমাদের মূল আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে যদি বা ঝঞ্ঝা-বায়ুর তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম,—আপনাদের মূল আপনারা উচ্ছেদ করিয়া আমরা তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলি।

এক্ষণকার নব্য মহলে "চাই নূতন—চাই নূতন" "কই নূতন—কই নূতন" "এই নূতন—এই নূতন" বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে,—জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস্ না দিলে নূতন এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া "নূতন" যখনই ভুস্ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস্ করিয়া জলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও ফরাসিস্ দেশে সাধারণ-তন্ত্রের পতন ঐ কারণেই ঘটিয়াছিল। হৃদয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জ্জিত করিতে গেলেই ঐরূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর অনেক ভাল ভাল রত্ন আছে, ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল রত্ন ছিল,—কেবল একটি রত্নের অভাব ছিল, সেটি—হৃদয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে, আত্ম-সংযম তপস্যা কঠোরতা প্রভৃতি ধর্ম্মের জন্য যাহা যাহা চাই, সমস্তই আছে,—কেবল একটির অভাবে সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া গেল,—সেটি ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগেরও ঐ দশা হইয়াছিল। ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিলে তাহা হইতে কিই-আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? হৃদয় যদি গেল তবে শুধু শক্তিতে কি হইতে পারে? এক্ষণকার নব্য সমাজ হৃদয়-শূন্য শক্তির এমনি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, সামান্য সামান্য গার্হস্থ্য বিষয়েও তাঁহাদের মনের রুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোন একটি সুসভ্য নব্য উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে হৃদয়-স্নিগ্ধকারী মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে মস্তিষ্ক-মন্থনকারী উদ্ভিদ্-তত্ত্বেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। সেখানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিলে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে—বড় বড় লাটিন্ নামধারী গন্ধহীন রঙচোঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে ও তাহাদের বড় বড় নাম তোমার কর্ণশূল হইবে। তখন তুমি ক্রোটন্ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে "হায়! ক্রোটন্ বৃক্ষ! তুমি পূর্ব্ব জন্মে কত না তপস্যা করিয়াছিলে! এই উদ্যানে, গ্রীষ্মকালে জুঁই বেল গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত হইত—তাহারা উদ্যানের শ্রীসমুজ্জ্বল করিত ও দশ-দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শীতল

সুগন্ধ উপঢৌকন দিত,—তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ। বর্ষাকালে কদম্ব কেতকী সেফালিকা নব-বারিধারায় প্রাণ পাইয়া উঠিয়া সৌরভের মধুর্য্যে দিক্ আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ। শরৎকালে প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিত, ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্য্যন্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে তুমি তাড়াইয়াছ,—ধন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম! বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্যানের বৈচিত্র সাধন কর—তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না,—কিন্তু পোনেরো আনা গন্ধহীন বিদেশী ফুল-গাছের একধারে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধী দেশী ফুল যে, এই বলিয়া দুঃখের গীত সুরু করিবে যে, "এবার মো'লে ক্রোটন হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না! আমাদের মন্তব্য কথাটি এই যে, উদ্যানে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংরাজি পুষ্প-বৃক্ষ সাজাও, কিম্বা আম্র কাঁটাল বট অশ্বত্থ তাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প-ছায়া-প্রদ বৃক্ষ-সকল যথারীতি সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজিও হয় নাই) ওক্ অলিব্ সাইপ্রেস্ প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূর্ব্বক, যথাস্থানে যথা পরিমাণে বসাও—তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে; কিন্তু যদি ওকের খাতিরে বট-অশ্বত্থকে দূর করিয়া দেও, অথবা ষ্ট্রবেরি, পিয়ার, এবং আপেলের খাতিরে আম্র কাঁটাল আতা-প্রভৃতিকে দূর করিয়া দেও, তবে তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে, একুল—ওকুল—দুকুল নষ্ট হইবে।

পুরাতনের ভিত্তি ভূমির উপর কিরূপে নূতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাত্মারা—রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকেরা—আমাদিগকে তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম-হিতৈষী ছিলেন, উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতা-সূচক কুসংস্কার গুলিই কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন, কেমন করিয়া স্বজাতির জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। উঁহাদের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে যখন ইংরাজেরা বড় বড় টাইটেল্ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন-"যে টাইটেল্ আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্ তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না। এই যে উপবীত দেখিতেছ—ইহার সমক্ষে রাজারা পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করে!" ব্রহ্মণ্য ফলাইবার জন্য তিনি যে, ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ও-কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের পিতৃ-পুরুষদের নিকট-হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজ্য,—তোমরা আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিব?

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য-রক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে; কিন্তু কিরূপে সাম্য-রক্ষা করিতে হয়—আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। সাম্য দুইরূপ,(১) ভাব-সাদৃশ্য, (২) আকার-সাদৃশ্য, আকার-সাদৃশ্য এক তো অসম্ভব, তায় আবার, তাহাতে কাহারো কোন পুরুষার্থ নাই; অথচ আমাদের দেশের সাম্য-ভক্তেরা প্রায়ই বাহ্য আকার-সাদৃশ্যের

প্রেমে মজিয়া আর্য্যজাতি-সুলভ আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন। ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বাহ্য আকার-সাদৃশ্য দুইরূপে ঘটিতে পারে—(১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালিরা হ্যাট্ কোট পরিলে তাহা ঘটিতে পারে; এরূপ যখন, তখন উভয় জাতির মধ্যে কোন-এক জাতি [illegible] ছন্দের অনুগামী হয়, তবে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় যে, এক জাতি পরের [illegible]—আর এক জাতি [illegible] এইরূপ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহারা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে [illegible] স্থাপন করিতে যান, তাঁহারা [illegible] ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসেন,—বাহ্য আকার-সাদৃশ্য ঘটাইতে গিয়া আন্তরিক ভাব-বৈসাদৃশ্য জাজ্বল্যরূপে দর্শন করেন। আমরা যদি ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির সাম্য, জাতি-গৌরবের সাম্য, বল-পৌরুষের সাম্য, [illegible] সাম্য সম্বর্দ্ধন করিতে পারি, তবেই আমরা [illegible] কাজ করি; [illegible]-সাম্য [illegible] কিছুই নহে। সহস্র সাবান [illegible] বাঙ্গালির [illegible] বর্ণ হইতে পারে না, ও [illegible] কোট পরিলেও বাঙ্গালির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি বিকট উগ্র হইয়া উঠিতে পারে না। তাহা করিয়া কাজও নাই। অতএব বলি যে, [illegible] দেশ-হিতৈষী যুবা [illegible] আকার সাম্য মন হইতে একেবারেই উড়াইয়া দেও,—আর্য্য জাতীয় ভাব-সাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব লাভে পুরুষার্থ লাভ করিবে! এক জন বাঙ্গালি ভদ্র লোক যদি নিখুঁত ষোলো আনা ইংরাজ সাজেন, তথাপি দাঁড়াইবে যে, ইংরাজেরা আসল ইংরাজ—তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি ষোল আনা ইংরাজ হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি—প্রসাদের কাঙ্গালি—পরিচ্ছদের কাঙ্গালি—অনুগ্রহের কাঙ্গালি—এ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্ততঃ চারি আনা ইংরাজ মনে করে, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা,—কিন্তু তাহা হইবার নহে। ইংরাজ সাজিয়া ইংরাজের দলে মিশিতে গেলে—অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদের নিকট এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে হইবে যে, "দাদেন—তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর।" আমরা বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ উপার্জ্জন করিতে যাওয়ায় অর্থই বা কি—প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের সহিত অল্পে অল্পে বিদেশীয় শক্তি-সামর্থ্য সংযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উপরে অন্ততঃ বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়ান; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তি-পুঞ্জ (অর্থাৎ বাহ্য আকার-পরিচ্ছদ নহে, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-পৌরুষ, কার্য্য-নৈপুণ্য কার্য্যিষ্ঠতা, ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করিতে থাকেন,—তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিবে, তদ্ভিন্ন আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি—সোণায় সোহাগা।

সতীত্বই নারীর প্রধান ভূষণ।

ধন্যা সা জননী লোকে, ধন্যোসৌ জনকঃ পুনঃ।
ধন্যঃ স চ পতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা॥

স্কন্দপুরাণ।

পবিত্র উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেই পুরুষ স্বামীত্ব ও নারী পত্নীত্ব লাভ করেন

এবং এই গুরুতর পবিত্রতর সম্বন্ধ-জনিত নরনারী পরস্পর পরস্পরের সুখ-সম্পদ জ্ঞান-ধর্ম্মোন্নতির ভার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বামী যেমন বয়ঃজ্যেষ্ঠতা ও বল-শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানাধিক্য বশতঃ দুর্গম সংসার-পথে সামান্যত পত্নীর স্বাভাবিক নেতা ও উপদেষ্টা হইয়া তাঁহাকে কল্যাণ-পথ প্রদর্শন করেন, সুশিক্ষিতা সাধ্বী সতী রমণীও সেইরূপ আপনার সৎস্বভাব ও সদ্দৃষ্টান্ত এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্মবল-প্রভাবে অনেক সময়ে সংসার-সঙ্কটে পতিকে নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করেন। স্বামী অশিক্ষিত অধার্ম্মিক অসচ্চরিত্র হইলে যেমন তাঁহার পত্নীরও প্রভূত অমঙ্গল ও অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, তেমনি পত্নী অসতী অসচ্চরিত্রা এবং গৃহ-কার্য্যে অপটু হইলে পবিত্র সংসার-আশ্রম এককালে অসুখ অশান্তির আলয়, পাপ তাপ অপবিত্রতার আকর হইয়া গৃহ-পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি জ্ঞান-ধর্ম্ম অধিক কি বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিয়া থাকে। অতএব পতিব্রতা ভার্য্যাই সংসার-আশ্রমের পত্তন ভূমি, পতি-প্রাণা ভার্য্যাই গৃহের গৃহলক্ষ্মী। ভার্য্যাই গৃহস্থের মূল, ভার্য্যাই গার্হস্থ্য সুখের কারণ, ভার্য্যাই ধর্ম্ম ফল প্রাপ্তির নিদান, ভার্য্যাই বংশবৃদ্ধির হেতু।

ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ।
ভার্য্যা ধর্ম্মফলবাপ্তৌ ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে॥

স্কন্দপুরাণ।

সেই পত্তন-ভূমি দূষিত ও কলঙ্কিত হইলে, সেই গৃহলক্ষ্মী অলক্ষ্মী হইয়া উঠিলে, সংসার-আশ্রমের সকল সুখ তিরোহিত হইয়া যায়। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র উদ্বাহ-সম্বন্ধের ব্যভিচার ঘটিলে, তাহার প্রত্যক্ষ দণ্ড-স্বরূপ পতি-পত্নী উভয়েরই ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার শান্তি-মঙ্গল সুখ-সদ্‌গতির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অসৎ কার্য্য ও অসৎ দৃষ্টান্তের প্রভাবে সমস্ত পরিবারই পাপ-দূষিত হইয়া পড়ে। পতির চরিত্র দূষিত হইলে যেমন পরিবারের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিদূরিত হয়, তেমনি পত্নী অসৎচরিত্রা বা অসতী হইলে পিতৃ কুল মাতৃ-কুল এবং ভর্ত্তৃ-কুল সমুদারই কলঙ্কিত হইয়া যায়, এবং স্ত্রী পতিব্রতা হইলে এই ত্রিকুলই উজ্জ্বল হইয়া তদীয় পুণ্যবলে পরম পবিত্র স্বর্গীয় সুখ সন্তোষে কালাতিপাত করে।

পিতৃ-বংশ্যা মাতৃ-বংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রিভিঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে॥

স্কন্দপুরাণ।

অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে নারীগণের চরিত্র রক্ষা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। নারীগণ অপরাপর সহস্রগুণে বিভূষিতা হইলেও সতীত্বরূপ পরম রত্নের অভাবে তাহার আর সকল গুণই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তাঁহারদিগের অঙ্গসৌষ্ঠব শ্রী-লাবণ্য যতই কেন অনুপম হউক না, তাহার মধ্য হইতে সতীত্বের অমৃতময় জ্যোতি বিকীর্ণ না হইলে নির্গন্ধ পুষ্পের ন্যায় তাঁহারা দেব মনুষ্য কাহারও আদরণীয়া বা পূজনীয়া হয়েন না। একারণ নারীগণ চিন্তা বাক্যে এবং কার্য্যে সর্ব্বদাই সাধ্বী থাকিবেন। ভ্রমেও কখন পাপ-চিন্তা পাপালাপ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বতঃপ্রবৃত্ত বা অন্যের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কদাচ অসদ্ভাব-উদ্দীপক কার্য্যাদি দর্শন শ্রবণ বা পঠনে অনুরক্ত হইবেন না। যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মভাব জাগ্রত, ধর্ম্ম-কার্য্যে মতি এবং পতি-ভক্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। ছায়া যেমন দেহের, চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রমার, সৌদামিনী যেমন জলদের সহগমন করে, সাধ্বী সতী তেমনি সৎপতির উপদেশ অনুবর্ত্তিনী ও অনুগামিনী হইবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পতি বিপথগামী অথবা অসৎচিন্তায়

অসদালাপে বা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বিনয়নম্র বচনে পত্নী ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল এবং পবিত্র-উদ্বাহ-বন্ধন জনিত কর্ত্তব্যতা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সৎপথে সাধুপথে আনয়ন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। ধর্ম্মের এমনই প্রভাব, সতের এমনই মহিমা, সাধু সঙ্গের এমনই স্বর্গীয় পরাক্রম যে, সাধ্বী সতী রমণীর সহবাসে থাকিয়ে কাল-ক্রমে স্বামীকে অসৎপথ হইতে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হয়। সাধ্বী সতী পতি-প্রাণা নারীর গুণে বহু শত অসৎপতি সৎ-স্বভাব লাভ করিয়াছেন, কত শত বিষয়-বিপন্ন স্বামী পত্নীর সদুপদেশে সম্পদ-সৌ-ভাগ্য সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, জন-সমাজের মধ্যে এমন সহস্র সহস্র জীবিত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্যালগ্রাহীরা* যেমন বলপূর্ব্বক গহ্বর বিবরাদি হইতে সর্প বাহির করিয়া মনুষ্যের জীবন রক্ষা করে, সাধ্বী সতী রমণীগণ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-বল-প্রভাবে তেমনি অসৎপথগামী পতিকে উৎকট পাপরূপ যম-কিঙ্করের হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া সৎপথে ধর্ম্মপথে স্বর্গপথে আনয়ন করেন।

* ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
এবমুৎক্রম্য দূতেভ্যঃ পতিং স্বর্গং নয়েৎ সতী॥

পরাশর।

কেবল গৃহে বাস করিলেই গৃহী হয় না, কেবল দারপরিগ্রহ করিলেই গৃহস্থ হয় না, পতিব্রতা পত্নী যাঁহার গৃহলক্ষ্মী, সেই মহাত্মাই যথার্থ গৃহস্থ।

গৃহস্থঃ সতি [illegible]।

স্কন্দপুরাণ।

পত্নী সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা হইলে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় স্বামীর বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, আয়ু আরোগ্য লাভ হয়, তাঁহার পবিত্র সহবাসে স্বামীর চরিত্র আরো বিশুদ্ধ হয়, জ্ঞান-প্রেম আরো উজ্জ্বল হয়, তাঁহার হৃদয় কোমল ও পবিত্র হইয়া থাকে। সেই সহ-ধর্ম্মিণীর সহবাসে ধর্ম্মকার্য্যে রতি মতি বৃদ্ধি পায়, এবং ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনে ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে আরো অনুরাগ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত দম্পতির সাধু উপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তে সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন সকলেরই সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ক্রমশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং পরলোক ও ব্রহ্মলোকের প্রতি ক্রমে আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। পত্নী মনোবাক্ কর্ম্ম-বিশুদ্ধা ও পতির আদেশ অনুবর্ত্তিনী ও সাধ্বী সতী ঈশ্বরপরায়ণা এবং পতি সাধু সচ্চরিত্র ব্রহ্ম-গত-প্রাণ হইলে ধর্ম্ম-সাধনের অব্যর্থ পুর-স্কার স্বরূপ সে বংশে ঈশ্বরপরায়ণ সুসন্তানই জন্ম-গ্রহণ করে, সে কুলে কদাচ অব্রহ্মবিৎ অসৎপুত্র জন্ম-গ্রহণ করে না।

"নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি"।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপুসংযম।

কাম

অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল রিপু দিয়াছেন তাহাদিগের সক-লেরই উদ্দেশ্য অতি শুভ, অতি মঙ্গলকর। রিপুগণের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাদিগের হইতে মঙ্গল ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কুত্রাপি কোন অমঙ্গল হয় না। রিপুগণের উপযুক্ত ব্যবহার কাহাকে বলে সে জ্ঞানও ঈশ্বর আমাদিগের আত্মায় নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই জ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে রিপুগণের

বশীভূত না হইয়া, তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, তাহাদিগকে বশীভূত ও পরিচালনা করিতে পারিলেই তাহাদিগের উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়। রিপুনিচয়ের প্রকৃত সংযমই রিপুগণের উপযুক্ত ব্যবহার। প্রকৃতরূপে রিপুসংযম করিতে পারিলে আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হয়।

মনুষ্যজাতির বৃদ্ধির জন্য, মানব-সৃষ্টি-রক্ষা জন্য ঈশ্বর মানুষকে কাম-রিপু দিয়াছেন। সন্তানোৎপাদন উদ্দেশে এই রিপু প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব কেবল সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই মানুষ ইহা চরিতার্থ করিবে, ঈশ্বরের ইহাই ইচ্ছা ও আদেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কিন্তু মানুষ এই রিপুর সন্তানোৎপাদন উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, ইহা হইতে যে ইন্দ্রিয়-সুখ প্রাপ্ত হয় কেবল তাহাই উপভোগ করিবার জন্য যদৃচ্ছা ইহার চালনা করিয়া থাকে, অপরিমিত রূপে অবিহিতরূপে ইহার সেবা করিয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশানুসারে মানুষ কামরিপু নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করিতে যত্নবান হয় না বলিয়া তাহারা উহার অপরিমিত সেবা করে এবং বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা উল্লঙ্ঘন করিয়া অগম্যাগমন-দোষে দোষী হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হয়। কামরিপুর এইরূপ অপরিমিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ সেবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও তাঁহার পবিত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধ হওয়াতে, মানুষ উহা হইতে নানা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। কামরিপুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে, অযথা সেবা করিলে, শরীর বলহীন ও রোগের আবাস-ভূমি হয়, মন বুদ্ধি মেধা ও প্রতিভা শূন্য হয় এবং আত্মা নিস্তেজ, অপবিত্র ও কলুষিত হইয়া যায়, আত্মায় ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, এবং তাহাতে ব্রহ্ম-প্রেমের উদয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। কামরিপুর অপরিমিত ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সেবক যে ব্যক্তি তাহার চিত্তে কোন পবিত্র বাসনা, কোন পবিত্র সংকল্প, কোন পবিত্র আশা স্থান লাভ করিতে পারে না; সে কোন্ সৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হয় না, সে কোন প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে অসমর্থ হয়। সংক্ষেপতঃ, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হইয়া সে ব্যক্তি পশুনামের বাচ্য হয়।

বর্ত্তমান কালের ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান—যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সম্মুখে আজকাল সকলেই মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত, আর যাহার প্রতি আমাদিগের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের অচলা শ্রদ্ধা, সে বিজ্ঞানও কামরিপুর অপরিমিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ সেবার বিষময় ফল, এবং হৃদয়-মন-আত্মার অবনতিকর প্রভাব মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছে। আমরা এ বিষয়ে কয়েকজন ইংরাজ শারীরতত্ত্ববিদের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

* Dr T. L. Nichols, in his work on Human Physiology, says ;—"Chastity or continence is the conservation and the consecration of the forces of life to the highest use. Sensuality is the waste of life and the degradation of its forces to pleasure divorced from use. Chastity is life. Sensuality is death." The same authority elsewhere observes ; "The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spiritual life. Again ; "It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form the eliments of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is re-absorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve, and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a

কামরিপুর অপরিমিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ সেবা মানুষকে এইরূপে ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন করে বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ উপদেশ এই যে কামরিপুকে জয় করিবে, কুত্রাপি উহার বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম ও মুক্তি লাভের পথে কণ্টক রোপণ করিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,

"কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খং, ১৩ অং ৭ শ্লো।

অর্থাৎ "কাম ও ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।" কাম-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকিলে শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন, মন নিস্তেজ ও উৎসাহবিহীন, এবং আত্মা পাপ-প্রবণ হইয়া যায়, অতএব কোন উচ্চ বা পবিত্র সংকল্প সাধনে মনোযোগী হইলেও মানুষ তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ধর্ম্ম সাধনায় যত্নবান হইলেও তাহাতে সুসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম অর্জ্জনে চেষ্টিত হইলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে,

"কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,

"দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২খঃ, ১০ অং, ৪ শ্লো।

"যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না।" যে ব্যক্তি কামেন্দ্রিয়ের সেবক তাহার হৃদয়ে কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার অপবিত্র চিন্তাই উদিত হয়, অতএব তাহার মনোরাজ্যে কখন পবিত্র আনন্দলহরী ক্রীড়া করে না, কখন স্বর্গীয় শান্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, সে শরীর মন ও আত্মার বল হারাইয়া সকল প্রকার ক্লেশে নিয়ত উৎপীড়িত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে,

"দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন ;—

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড, ২য় অং, ৮ শ্লো।

"স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না ; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।" যাহারা কাম-রিপুর বশ, যাহারা কাম-রিপুকে দমন করিতে পারে নাই, তাহার প্রভাব পরাজয় করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারাই ব্যভিচার-দোষে দোষী হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কেবল যে আপনাদিগের ঘোর দুর্গতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় তাহা

wretched nervous system, epilepsy, insanity, and death." Again ;—"Men can live in perfect continence for years and all their lives in full bodily and mental vigour, all the more strong and vigorous for the disuse of the amative function." Speaking on the consequences of excessive amative indulgence, Dr Nichols makes the following remarks ;"—There is a great expenditure of nervous force in excessive amative indulgence. Nature calls for this expenditure only at maturity, and at rare interval and for a specific purpose." "The brain is exhausted by amative irregularity and excess" "Hysteria, chorea, and epilepsy are generally connected with excitement and exhaustion of the generative system, with amative passion, and unnatural or excessive gratification." Dr O. S. Fowler observes, "Frequent sexual indulgence in any of its forms, will run down and run out any one of either sex." Dr Curtis says, "He who addicts himself to the destructive habit of excessive amative indulgence, loses at once both his physical and moral powers." Dr. Falter remarks ; "Debility of intellect and especially of the memory, chracterize the mental alienation of the licentious." Dr Curtis remark ;—"The great exhaustion of the nervous system, produced by excessive sexual indulgence, occasions considerable injury to the faculty of memory, and sometime its complete ruin The other faculties of the mind are also impaired by sexual excess. Our lunatic asylums afford many instances of insanity being produced by this practice."

নহে সমগ্র লোকসমাজের বিশেষ সাধন করে। কাম-রিপুর বশীভূততা হইতে ব্যভিচার দোষের উৎপত্তি, আর সেই ব্যভিচার দোষ ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত দুর্গতির প্রস্রবণ, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন,

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারোভবেদামরণান্তিকঃ
এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥

এবং আবার বলিয়াছেন.

"বিরক্তঃ পরদারেষু তেন লোকত্রয়ং জিতম্"
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খঃ, ৬ অঃ ৪ শ্লো।

"যিনি পরস্ত্রীতে বিরত তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।"

ব্রাহ্ম জিতেন্দ্রিয় হইবেন, কাম রিপুর শরীর-মন-আত্মার অবনতি-কর, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অযথা সেবা হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে বিরত থাকিবেন, এবং ক্রমে ক্রমে কাম রিপুর আধিপত্য হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে থাকিবেন, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম তিনি এই উপদেশ সম্পূর্ণ রূপে পালন করেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম কাম রিপুকে আপনার উপর আধিপত্য করিতে দেন না। তিনি কুত্রাপি এই প্রবৃত্তির দাস হইয়া উহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অযথা ব্যবহার করেন না। কামেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া তিনি ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শরীর মন ও আত্মার স্বাস্থ্য, বল ও পবিত্রতা সঞ্চয় করেন। যতই তাঁহার বয়স বৃদ্ধি হইতে থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই পৃথিবীর সহিত তাঁহার বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, যতই ইন্দ্রিয়ের তেজ স্বভাবতঃ হ্রাস হইয়া আসে, যতই তিনি আধ্যাত্মিকতায় গভীরতর উন্নতি লাভ করিতে থাকেন, যতই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমে তাঁহার আত্মা জ্যোতিষ্মান ও মহান হইতে থাকে, এবং যতই তাঁহার আত্মা শরীররূপ পিঞ্জর হইতে পরলোকাভিমুখে প্রস্থানোন্মুখ হয়, ততই তিনি এই শরীরমূলক কাম রিপুর প্রভাব হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে থাকেন। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া কামেন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারেন, উহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অপরিমিত সেবা হইতে বিরত না হয়েন, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে উহার বিনাশ সাধন করিয়া উহার প্রভাব হইতে আপনাকে এককালে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃতরূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

ইহা হউক, উহা করিব, উহা ও তাহা পাইব, ইত্যাদি বহু আকারের মানস-ক্রিয়া বা মনোবিকারের নাম বাঞ্ছা ও সংকল্প। বুদ্ধির যে অংশে এই সকল বিকার বা বিক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেই অংশকে আমরা মন বলি, সুতরাং ইচ্ছা ও ইচ্ছাঘটিত সংকল্প বিকল্পাদি বিক্রিয়া সকল মনেরই ক্রিয়া অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

মস্তিষ্কাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিতত্ত্বের মনঃপ্রদেশে যে ইচ্ছা, বাঞ্ছা, সংকল্প, বিকল্প, ইত্যাদি বহু প্রকার ক্রিয়া জন্মে, বিকার উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া বা সেই বিকার বিশেষ কর্ত্তব্যতা নামক অন্য এক প্রকার বিকারের জননী। তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, ত্বগিন্দ্রিয়ের ও রসনেন্দ্রিয়ের বসতি স্থানেই উৎপন্ন হয়, সর্ব্বত্র হয় না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থিতিস্থানে রূপদর্শন ক্রিয়া, কর্ণেন্দ্রিয়ের স্থিতিস্থানে শব্দ শ্রবণ ক্রিয়া, এবং অন্যান্য জ্ঞানক্রিয়া জন্মে। সেই সকল জ্ঞানক্রিয়ার

নাম কর্ত্তব্যতা। কর্ত্তব্যতা সকল বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও মূলবুদ্ধির বিকার, সুতরাং তাহাদিগকেও অভিবুদ্ধি বলা যাইতে পারে।

বুদ্ধিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও ক্রিয়া হয়। সে সকল ক্রিয়ার পৃথক্ পরিভাষা নাই। ইন্দ্রিয়ের নামেই তত্তাবতের উল্লেখ হইয়া থাকে। যথা—বচনক্রিয়া, গ্রহণক্রিয়া, ইত্যাদি। সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল ক্রিয়া নামেই অভিহিত হইল, পারিভাষিক নাম দেওয়া হইল না। ইহাদের মুখ বুদ্ধির দিকে, বুদ্ধি হইতেই ইহারা পারম্পর্য্যক্রমে উৎপন্ন হয়, তৎকারণেই ইহাদিগকে অভিবুদ্ধি নাম দিয়াছি। পাঁচ প্রকার অভিবুদ্ধির ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল, এক্ষণে পাঁচ কর্ম্মযোনির ব্যাখ্যা শুন।

পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥৮॥

কর্ম্মের, শুভাশুভ শক্তির, পাঁচ প্রকার মাত্র যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি নিদান, ইহা অবধারিত হইয়াছে।

ধৃতি, শ্রদ্ধা, সুখাদি, বিবিদিষা, ও অবিবিদিষা, এই পাঁচ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে জীবের কর্ম্ম সঞ্চয় হয়।

ধৃতি।—কর্ত্তব্যতা বিষয়ক ইচ্ছাকে, মনের সঙ্কল্পকে, বাক্যে ও কায়িক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাপিত করার নাম ধৃতি। (আমি ইহা করিব, এই রূপেই করিব, এইরূপ মানস [illegible] উত্থাপিত করিয়া, ঐ প্রকার সংকল্প ধারণ করিয়া, বাক্যে ও কার্য্যে তাহার সমাপ্তি করণের নাম ধৃতি। যে ব্যক্তি তদ্রূপে কার্য্য করে, তৎপ্রতিষ্ঠ হয়, সেই ব্যক্তি ধৃতিমান্ বলিয়া গণ্য।

শ্রদ্ধা।—অসূয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, যাগ, হোম ও দানাদি করা এবং করান, শ্রদ্ধা ব্যতীত হয় না। এ কারণ ঐ সমস্ত কার্য্য আন্তরিক শ্রদ্ধাবৃত্তির লক্ষণ অর্থাৎ পরিচিহ্ন।

সুখ।—সুখের উদ্দেশে, চিত্তনৈর্ম্মল্যের উদ্দেশে বা অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক প্রকাশ উৎপাদনের নিমিত্ত বিদ্যা, কর্ম্ম ও তপস্যারত হইলে ও প্রায়শ্চিত্ততৎপর হইলে, পাপক্ষয়কারী ক্রিয়া অনুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকিলে, সাঙ্খ্যশাস্ত্র তাহা সুখ-নামক কর্ম্মযোনি বলিয়া অভিহিত করেন। বস্তুতঃ ঐ সকল ক্রিয়াই প্রকৃত সুখ ও প্রকৃতসুখের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ।

বিবিদিষা।—জানিবার ইচ্ছার নাম বিবিদিষা। তন্মধ্যে প্রকৃতির একত্ব, প্রাকৃতিক পদার্থের নানাত্ব ও পৃথক্ত্ব, আত্মার বা পুরুষের চেতন ভাব, প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক পদার্থের জড়ত্ব, কারণের সূক্ষ্মত্ব, কার্য্যের ব্যক্ততা ও ব্যক্তীভাবের পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্ব,—এই কয়েকটী জানিবার ইচ্ছাই বিবিদিষা এবং ঐ সমস্ত বিষয়ই বিবিদিষার বিষয়।

অবিবিদিষা।—বিবিদিষার অভাবের বা চরম ফলের নাম অবিবিদিষা। ইহা সুপ্তপ্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির প্রবোধের তুল্য। এবম্বিধ পাঁচ প্রকার কর্ম্মযোনি আছে, ইহার দ্বারাই জীব মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।

পঞ্চ বায়বঃ ॥৯॥

এই স্থূল দেহের মধ্যে পাঁচ প্রকার বায়ু বা বায়বীয় ক্রিয়া বিশেষ আছে। কি কি? তাহা শুন।

শরীরধারীর শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,—এই পাঁচ প্রকার বায়ু (ইন্দ্রিয়সমষ্টির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াবিশেষ) আছে।

প্রাণ।—মুখ নাসিকায় যাহার অধিষ্ঠান, যাহা প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাপারের কারণ, যাহার দ্বারা মরণ ও জীবন নির্ব্বাহ হয়, যাহা প্রক্রম অর্থাৎ যাহা দেহস্থ যান্ত্রিক কার্য্যের আরম্ভক, তাহারই নাম প্রাণ।

অপান।—পায়ুদেশে বা অধোদেশে যাহার অধিষ্ঠান, যে ক্রিয়ার দ্বারা শরীরস্থ মল মূত্রাদি নির্গত হইয়া যায়, যাহা শরীরের

অধোগমনশীল (মূত্রস্রোতস্বিনী ক্রিয়া) তাহাই এ শাস্ত্রে অপান।

সমান।—যাহা বা যে বায়ু (?) নাভিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করতঃ রস রক্তাদি অণুায় ও যথাযথরূপে বিভাগ সাধন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাড়ীপথে লইয়া যায়, তাদৃশ বায়ুর নাম সমান।

উদান।—কণ্ঠদেশে যাহার অধিষ্ঠান, যাহার স্বভাব ঊর্দ্ধগমন, যাহার বলে শরীরের ঊর্দ্ধগামিনী ক্রিয়া অর্থাৎ উৎক্রান্তি ও বমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম উদান।

ব্যান।—এই ব্যান নামক বায়ু শরীরস্থ সর্ব্বনাড়ীর অধিষ্ঠাতা। ইনি বিক্ষেপণ, বিভঞ্জন ও বীর্য্যবৎ কর্ম্ম করেন বলিয়া ব্যান।

পাঁচ বায়ু কি তাহা ব্যাখ্যাত হইল, বলা হইল, এক্ষণে পাঁচ কর্ম্মাত্মার স্বরূপ অবগত হও।

পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ ॥ ১০ ॥

কর্ম্মের আত্মা বা প্রয়োজক কর্ত্তা পাঁচ প্রকার। জীবনিষ্ঠ অদৃষ্ট শক্তির নাম কর্ম্ম, কার্য্যপ্রবৃত্তির উদ্রেক কারক বলের নামও কর্ম্ম, ইহার অন্য নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পুণ্য পাপ। এতাদৃশ কর্ম্মের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল বা আত্মা (প্রয়োজক) পাঁচ প্রকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীরে বৈকারিক, তৈজস, ভূতাদি, সানুমান ও নিরনুমান, এই পাঁচ প্রকার প্রাকৃতিক বিকার আছে। সেই গুলিকেই আবার এখন কর্ম্মাত্মা নামে অভিহিত করা গেল। তাহার কারণ এই যে, উক্ত বিকার পঞ্চকই কর্ম্মবিভাগের আত্মা, স্বরূপ বা উপাদান কারণ। তন্মধ্যে যাহা বৈকারিক তাহাই শুভকর্ম্মকর্ত্তা। যাহার অন্তঃকরণে বৈকারিক অংশ প্রবল বা অধিক সেই ব্যক্তিই শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তিমান্ হয় ও শুভকর্ম্ম করে। আর যাহা তৈজস, তাহাই অশুভ কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ তৈজস বিকারের প্রাবল্যে বা আধিক্যে অশুভ কর্ম্ম সকল কৃত হয়। পূর্ব্বে যাহাকে ভূতাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি, সেই ভূতাদিই এস্থলে মূঢ় কর্ম্মের আত্মা বা মূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। (ভূতাদি নামক বিকারের আধিক্যে বা প্রাবল্যে লোক সকল মোহকর্ম্মকারী হয়, অজ্ঞতার কার্য্য করে)। পূর্ব্বে যাহাকে সানুমান বলিয়াছি, তাহা শুভ মূঢ় কর্ম্মের আত্মা বা প্রযোজক। (কারণ জানে না, কেন করে তাহা জানে না, কোন প্রকার অভিসন্ধি নাই, অথচ শুভ কর্ম্ম করে, এরূপ ভাবে শুভকর্ম্ম করিলে শুভমূঢ় কর্ম্ম করা হয়)। পূর্ব্বে যাহাকে নিরনুমান বলিয়াছি, তাহাকেই আবার শুভ-অমূঢ়-কর্ম্মের কর্ত্তা বা আত্মা বলিলাম। (জ্ঞান পূর্ব্বক শুভকর্ম্ম কৃত হইলে তাহাকে শুভ অমূঢ় কর্ম্ম বলা যায়)। সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপেই কর্ম্মাত্মপঞ্চকের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

পঞ্চ পর্ব্বাবিদ্যা ॥ ১১ ॥

অবিদ্যা বা অজ্ঞান পঞ্চপর্ব্বান্বিত। অবিদ্যার পাঁচটী মাত্র প্রধান্ পর্ব্ব (গাঁইট বা বিভাগ) আছে। তাহাদের নাম তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। প্রথম পঠিত তম ও মোহ নামক পর্ব্বের আট প্রকার অবান্তর প্রভেদ আছে। মহামোহের দশ প্রকার প্রত্যেক ক্ষুদ্র পর্ব্ব আছে। তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই দুইএরও অষ্টাদশ প্রকার বিভাগ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্ব (গাঁইট) আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ—

সাধারণতঃ তমঃ, অজ্ঞান, ভ্রম, দুর্ব্বুদ্ধি এ সকল সমানার্থক শব্দ বলিয়া জান। বস্তুতঃ যাহা আত্মা নহে তৎপ্রতি আত্মজ্ঞানাভিমান করার নাম তমঃ। অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং সুক্ষ্মতম পঞ্চতন্মাত্র, এই আট প্রকার প্রকৃতির কোনটীই আত্মা নহে, অথচ উক্ত আট প্রকারের কোন একটীকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইলে তাহা অবি-

দ্যার তমো নামক পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত হইবে। আট প্রকৃতিতে পৃথক্ পৃথক্ আত্মজ্ঞানাভিমান হইয়া থাকে, এজন্য উহা আট প্রকার বলিয়া অভিহিত হইল।

দৃষ্টজ্ঞান অর্থাৎ লৌকিক বুদ্ধি আর আনুশ্রবিক জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়াই যদি "আমি কৃতকৃত্য হইলাম, মুক্ত হইলাম" এতদ্রূপ অভিমান হয়, তাহা হইলে,তাহার তাদৃশ অজ্ঞতাকে আমরা মহামোহ নাম দিই। ইহা আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দশ প্রকার বিষয় ঘটিত হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়াই দশ প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল।

প্রকৃতির আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার শব্দাদি বিষয় না পাইলে কিংবা তদ্ভাবৎ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে যে দুঃখ হয়, সেই অযুক্ততম দুঃখের নাম তামিশ্র এবং যাহা মূল মিথ্যা জ্ঞান, যাহার অন্য নাম অভিনিবেশ (মরণত্রাস, দেহের প্রতি আত্মাভিমানের অনুবৃত্তি, আমি যেন না মরি, এতদ্রূপ কামনা বা প্রার্থনা বিশেষ) তাহাই এস্থলে অন্ধতামিশ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। দেবতারাও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি দশ বিষয়ের ভোগ করেন, ভোগের অভাবে তাঁহারাও ভোগ প্রতিবন্ধকের প্রতি বিদ্বেষ করেন ও দুঃখী হন। অবিদ্যার পাঁচ পর্ব্ব এবং অবান্তর প্রভেদ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

অষ্টাবিংশতি বধ অশক্তিঃ ॥ ১২ ॥

অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) প্রকার বধ অর্থাৎ বিঘাত হইতে অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি (অক্ষমতা বা জ্ঞানহানি) হইয়া থাকে। আটাইশ প্রকার বধ ও আটাইশ প্রকার অশক্তি কি কি? তাহা বলা যাইতেছে। একাদশ ইন্দ্রিয়-বধ ও সপ্তদশ বুদ্ধি-বধ, এই আটাইশ প্রকার বধ বা ক্রুরবিঘাত হইয়া থাকে। তদ্ধেতুক আটাইশ প্রকার অশক্তি (অক্ষমতা বা জ্ঞানহানি) ঘটনা হয়। ইন্দ্রিয় বধ কি তাহা বলা যাইতেছে।

১ শ্রোত্রবধ। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বধ বা বিঘাত; তজ্জনিত বাধির্য্য নামক অশক্তি অর্থাৎ শব্দজ্ঞানক্ষমতার অভাব। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সর্ব্বাঙ্গীন অভাব হইলে জীব আদৌ শুনিতে পায় না, অংশ বিশেষের ব্যাঘাত হইলে কিছু কিছু শুনিতে পায়, অসম্পূর্ণতা থাকিলে শব্দ বিষয়ে সম্পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতাবশতঃই লোকে তালকাণা ও সুরকানা হয়, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিগণের শ্রোত্রবধজনিত অশক্তি অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা থাকে না ইহা অবধারণ করিতে হইবে। যোগসাধন না করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা হয় না, ইহাও সত্য জানিবে। এই কারণেই যোগীরা শব্দতত্ত্ব বিষয়ে অভ্রান্ত, অন্যে ভ্রান্ত।

২ জিহ্বাবধ। জিহ্বাবধ থাকিলে জড়ত্ব নামক (রস জ্ঞান রহিত) অশক্তি থাকে, ইহা স্থির করিতে হইবে। বধ অনেক প্রকার। বিনাশের নামও বধ, অসম্পূর্ণতার নামও বধ এবং অংশ হানির নামও বধ। বিনাশ হইলে রসজ্ঞতা আদৌ থাকে না, অংশ বিশেষের হানি থাকিলে কিছু না কিছু থাকে, অসম্পূর্ণতা থাকিলে মাত্র ব্যবহারোপযোগী স্থূল রস বুঝিবার শক্তি থাকে, সূক্ষ্ম রস বিজ্ঞান বিষয়ে ক্ষমতা থাকে না। যোগী ব্যতীত, যোগ সাধনার দ্বারা জিহ্বেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত, অভ্রান্ত-রসবিজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

৩ ত্বক্‌বধ। ত্বক্‌বধ থাকিলে কুষ্ঠিতা নামক অশক্তি (অসাড়—সাড় না থাকা) থাকে। ত্বগিন্দ্রিয়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিনাশে স্পর্শজ্ঞান আদৌ থাকে না, প্রাদেশিক বিনাশে কিছু কিছু থাকে, অসম্পূর্ণতা নামক বধ বিশেষ

থাকিলে স্থূলস্পর্শক্ষমতা থাকে মাত্র; কিন্তু দিব্য ও সূক্ষ্ম স্পর্শ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

৪ চক্ষুর্বধ। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পূর্ণবধ থাকিলে অন্ধতা বা রূপগ্রহণবিষয়ে অশক্তি থাকে। আংশিক বধ বা অপূর্ণতা থাকিলে রূপ-গ্রহণ-শক্তির অনেক অংশে অভাব থাকে। যাহার চক্ষু নাই অথবা যাহার চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে সে কিছুই দেখিতে পায় না, পরন্তু যাহার চক্ষুর আংশিক বধ বা অসম্পূর্ণতা থাকে সে ব্যক্তি রূপের (রঙের) তারতম্য বিবেচনা করিতে পারে না। সেই জন্যই ইহ সংসারে অনেক রঙ্‌ কাণা লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই কারণেই অনেক মনুষ্য বর্ণবিজ্ঞান বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া থাকে। যোগ-সাধন-প্রভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, সম্পূর্ণতা লাভ করে, তখনই তাদৃশ যোগী দিব্যাদিব্য ও স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত রূপ গ্রহণ করিতে পারেন অন্য সময়ে ও অন্য ব্যক্তি পারেন না।

৫ নাসাবধ বা ঘ্রাণপাক। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বধ থাকাতেই অঘ্রাণতা অর্থাৎ ঘ্রাণশক্তির অভাব হইয়া থাকে। ইহারও সর্ব্বাঙ্গীন বধ ও আংশিক বধ এবং তদনুসারে ঘ্রাণবিষয়ের অশক্তি আংশিকও সর্ব্বাঙ্গীন জানিবে।

৬ বাগ্বধ। বাগিন্দ্রিয়ের বা বাক্‌যন্ত্রের বধ হইলে বা থাকিলে, মূকতা নামক অশক্তি হয়। মূক অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণে অক্ষম, বাক্‌শক্তির অভাব (বোবা); বাগ্‌যন্ত্রের অল্প বধ থাকিলে, অপূর্ণতা থাকিলে, বাক্‌শক্তি অল্প ও অপূর্ণ থাকে।

৭ হস্তবধ। হস্তেন্দ্রিয়ের বধ হইলে কুণিত্ব অর্থাৎ আদান, প্রদান, আকর্ষণ, বিকর্ষণ ইত্যাদিবিধ হস্তক্রিয়ায় অসমর্থ হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার পক্ষাঘাত।

৮ পদবধ। পাদ নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিঘাতে পঙ্গুতা নামক অশক্তি জন্মে। বিহরণ বা পাদবিক্ষেপাদি কার্য্যে অসমর্থতা আর পঙ্গুত্ব তুল্য কথা।

৯ পায়ুবধ। পায়ু-ইন্দ্রিয়ের বধ হইতে উদাবর্ত্ত (ইহা এক প্রকার রোগ) অর্থাৎ মলত্যাগকারিণী শক্তি তিরোহিত হয়।

১০ উপস্থবধ। উপস্থেন্দ্রিয়ের বধ হইতে ক্লৈব্য নামক অশক্তি জন্মে।

(ধ্বজভঙ্গ রোগ আর উপস্থবধ তুল্য কথা।)

১১ মনোবধ। মন নামক ইন্দ্রিয়ের বধ হইতে উন্মাদ নামক অশক্তি জন্মিয়া থাকে। অনবস্থিতচিত্ততা, বস্তুবিষয়ক অযথা জ্ঞান, সংকল্পবিকল্প করিবার সামর্থ্য না থাকা, প্রণিধান শক্তির অভাব হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক প্রকার মনোবধ-জনিত অশক্তি থাকা দৃষ্ট হয়।

একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়-বধ ও তজ্জনিত অশক্তি সকল বর্ণিত হইল; এক্ষণে সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ ও তদ্ঘটিত অশক্তি কিরূপ তাহা জ্ঞাত হও।

তুষ্টি নামক ও সিদ্ধি নামক ১৭ প্রকার বুদ্ধি অবস্থা আছে। সেই সপ্তদশ বুদ্ধি অবস্থার বৈপরীত্য হইতে বুদ্ধিবধও সপ্তদশ প্রকার বলিয়া কথিত হয়। তুষ্টি অবস্থা ৯ প্রকার। কি কি? তাহা পরে বলিব। সেই বক্ষ্যমাণ ৯ প্রকার তুষ্টির বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অতুষ্টি প্রভৃতি অবস্থা হইলে, তাহা হইতে ৯ প্রকার বুদ্ধিবধও, ৯ প্রকার অশক্তি ঘটনা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

ষোড়শ ব্যাখ্যান (গত বর্ষের পত্রিকার ৯৭ পৃষ্ঠার পর।)

শান্তি সুখ কোথা বল ছাড়িয়া ঈশ্বর?
চিরশান্তি আনন্দের তিনিই আকর।
তিনি তব চির ধন, তিনি সুখ সম্পূরণ,
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আপন অন্তর॥

প্রচুর বিভব মান করহ অর্জ্জন।
চৌদিকে বিস্তার কর প্রভুত্ব আপন।
সংসারের বস্তু চয়, সকলি অসার হয়।
আত্মার গভীরে শান্তি দেয় কি কখন?

শুন ব্রহ্ম রসে মগ্ন ঋষির বচন।
"হে কিসয়ি! কারে তুমি করিছ আপন।
এত ভাল বাস যারে, রাখিতে নারিবে তারে,
নিমেষে করিবে সে যে দূরে পলায়ন॥

মরণ-অধীন হয় প্রিয় যে তোমার।
বিচ্ছেদ তাহার সহ হবে অনিবার।
ধন জন সমুদয়, কিছু দিন তরে হয়,
তবে কেন মজ তাহে—করি আপনার॥"

এক্ষণে করহ মুক্তি তাঁহার সাধন।
যাঁর সনে চিরকাল করিবে যাপন।
নিরন্তর তাঁরে ভজ, তাঁর প্রেমরসে মজ,
প্রেম-ভরে কর তাঁরে হৃদয়ের ধন॥

জানি তাঁরে প্রেমদাতা সবার জীবনে,
রাখ রাখ সদা তাঁরে হৃদয় আসনে।
তাঁহার বচন ধর, আত্মারে পবিত্র কর,
তাঁর কাজ কর তুমি একান্ত যতনে॥

কর সেই চির ধনে এখানে সঞ্চয়।
সে ধনের ক্ষয় কভু হইবার নয়।
ঐহিকের যত [illegible] তাহার কাছে,
সে ধনের ধনী যারা সবে [illegible]॥

সে ধন পাইলে আর সব দেওয়া যায়।
সকল অভাব দুঃখ সে ধন ঘুচায়।
যেন কিবা স্পর্শমণি, কিবা অমৃতের খণি
যাঁর গুণ ভক্তগণ প্রেমানন্দে গায়॥

সকল সুখের তিনি হন আস্বাদন।
সকল দুঃখের তিনি হন প্রশমন।
যে কাতরে চায় তাঁরে, দেন তারে আপনারে,
বলেন অন্তরে কত অমিয় বচন॥

ত্যজিয়া অসার ভবে তাঁরে কর সার।
অন্তের সম্বল তাঁরে কর আপনার।
তাঁরে প্রেম কর হেথা, চিরকাল যিনি সেথা
তুষিবেন প্রেম-সুধা দিয়া অনিবার॥

তিনি বিনা শান্তি সুখ আছয়ে কোথায়?
তিনি বিনা পরিত্রাণ কে দিবে তোমায়?
পরম সম্পদ ধন, তাঁরে হয়ে বিস্মরণ,
কেন হরিতেছ, আহা! জীবন বৃথায়॥

এস সবে তাঁর পদে করি নমস্কার।
তাঁহারে সকলে দিই প্রীতি উপহার।
তাঁহারে হৃদয়ে রাখি, তাঁরে ভক্তি ভরে ডাকি,
তাঁর কাছে ধর্ম্মবল যাচি বার বার॥

এস তাঁর প্রেম মুখ দেখি হেন ক'রে,
যেন তার ছবি হৃদে নিয়ত বিহরে।
করি তাঁর প্রীতি পান, করি সবে প্রীতি দান,
তাঁর প্রীতি রাখি দিই [illegible] কন্দরে॥

তবে তাঁর উপাসনা হইবে সফল,
জীবনে যখন তাহা প্রকাশিবে ফল।
যবে তুমি কায় মনে, সাধিবে সে প্রেমধনে,
প্রলোভন দুঃখে তুমি হইবে অটল॥

বিনীত হইয়া কর ধর্ম্মের [illegible]।
আত্ম বল লভিবারে করহ যতন।

আপনা জিজ্ঞাসা করি, পাপ চিন্তা পরিহরি,
প্রতিদিন সাধু ভাব কর উপার্জ্জন ॥

প্রতি দিন ত্রিসন্ধ্যায় তাঁর কাছে যাও,
হৃদয়ের দ্বার তাঁর কাছে খুলে দাও।
পাপ তাপ বিনাশিতে, তাঁর প্রতি মতি দিতে,
একান্তে কাতর প্রাণে তাঁর কাছে চাও ॥

প্রাণদাতা যিনি হন জীবন জীবন।
তাঁহারে করহ তুমি জীবন অর্পণ ॥
নিজ অভিসন্ধি আর, না ভাবিহ একবার,
তাঁর ইচ্ছা কর শুধু জীবনে পালন ॥

ভয় ব্যাকুলতা সব ঘুচিবে তোমার।
কিছুর অভাব তব থাকিবে না আর।
তুমি প্রাণ পণে, তাঁরে সদা রাখি মনে
তাঁর পদে দাও যাহা আছে আপনার ॥

বিদেশী স্বদেশে যায় আনন্দ হৃদয়ে।
সে রূপ হইবে তব মৃত্যুর সময়ে।
যাঁর দয়া প্রতিক্ষণে, ভুঞ্জিতেছ এ জীবনে,
লইয়া যাবেন তিনি অমৃত নিলয়ে ॥

হে নাথ! তোমার প্রেমে হইয়া মগন।
করিতে তোমারে পারি আত্ম-সমর্পণ ॥
হেন মতি দাও এই দীন অকিঞ্চনে।
লয়ে যাও আমাদের তব শ্রীচরণে ॥
ইতি ষোড়শ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার হইতে উদ্ধৃত।

THE NEGATIVE AND THE POSITIVE ASPECT OF LIFE.

RELIGION—a word, in which we sum up the highest aspirations of life—is too often supposed to be nothing more than the duty of restraining our hankering after earthly happiness, and subduing our passions. Asceticism and self-denial thus come to be looked upon as the highest or the only virtues, the supreme end for which they are merely a preparation being forgotten. The conception that is thus formed of the glorious destiny of man is most poor. Life is assumed to be a purely negative something. We are to say 'No' to everything, to refuse admittance to the heart to everything, we are to welcome nothing, seek nothing. The duty of conquering desire, which has been called the 'initial moral law,' is almost imagined to be the end of existence. It is a certain narrowness of spirit—a want of power to rise to the height of human destiny—which causes men to confine their attention only to the negative aspect of life, and to lose sight of the final purpose to which sacrifice and renunciation lead the way. The heart is most insecure,—it is yet under the power of evil—which is not filled by fervent hopes and bright visions of the higher world for the sake of which we are required to renounce this world. The soul was not made to shut its doors for ever. Impurity is to be driven out that Purity may come in, selfish desire is to be destroyed that Love may reign supreme, the tumult of the world is to be kept at a distance in order that the voice of God may be heard. But our poor energies are often so sorely taxed by the sacrifices which God exacts from us, that we have not the strength to look up to the world of love and beauty to which the road lies through the sorrows and trials of this life. When clouds gather around us, we find it hard to think hopefully of the sun that shines above. Our hopes are faint; they live only as long as things wear a bright aspect, but disappear at the approach of darkness, and as intervals of lucid calm are rather rare in this world, as struggles and trials abound, our view of life is associated with the most melancholy thoughts. Our hearts do not stand at a sufficient height above this world to see the circle of eternal light surrounding the little dark spot of earthly life.

We stand on very unsafe ground as long as our conception of life and religion continues to be a negative one, as long as the foremost thoughts suggested by obedience to God are not of life and love, but of hardship and sacrifice. Can we say, we truly believe that the soul is destined to grow in love and beauty, and to perceive more and more of the infinite beauty of God through eternity, until the light of such a faith subdues all earthly darkness

and keeps the fountain of hope and love playing in the heart even when our dearest ones abandon us? The soul cannot live on negations, it yearns for something positive to feed upon. We must realise the truth that life is something more than the moral discipline which consists in giving up cherished things. We were made to possess, and not to renounce; to have, and not to give up; to grow in love, and not to starve our affection to death. We renounce for a short season in order that we may have, for ever; our base and impure affections are to be conquered, in order that we may learn to love God. We obtain by giving up. We obtain most when we give up most readily. We give up the transitory in order that we may obtain the eternal. He possesses himself most truly, who surrenders self unreservedly to the will of God. Self-denial is the assertion of one's highest right—the right to love God and to give up everything for his sake.

Renunciation is not religion. People often renounce from the worst of motives. A wicked passion may become so strong as to make a man sacrifice all his other interests and desires for the sake of it. Courage equal to that with which martyrs have submitted to their fate has been displayed in the worst causes. Renunciation is of value only when it proceeds from the love of God. A man may subdue his passions without being at all religious, without loving God or even believing in the existence of God. A heart which is free from impure desires but does not love God, is like a house in which things are in perfect order, but which has no inmates. Self-conquest is precious only as the preparation for complete self-surrender to God. We must obtain perfect mastery over ourselves, in order that we may give ourselves wholly up to God. Where there is no growth in faith and love, there is no true spiritual life, though sacrifices may have been made for the sake of duty. It is a disastrous error to imagine that self-control is the highest virtue, that the destiny of man is fulfilled merely by the attainment of a negative purity. It is not our highest mission to despise this life, but to love the higher life. Life is not barrenness, life is not poverty, life is rich, precious, sweet,—it is the highest wealth. Life is something more than bereavements and partings. We are impoverished and made to suffer, in order that we may be enriched and blessed. Let us ever pray to God that he may teach us to love him more and more, that his beauty may completely possess our hearts. We must say 'No' to many an intruder only in order that we may welcome God with the whole soul. Life is not a set of 'Noes,' it is the affirmation of affirmations: GOD IS AND HE IS OUR OWN.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৭।০ টার সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ বার্ষিক উৎসব হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে আষাঢ় মাস হইতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ট্রষ্টী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেন। যত দিন পুনঃ পরিবর্ত্তিত না হয়, তত দিন ইহাঁরা স্ব স্ব পদে স্থায়ী হইবেন। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়
" ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" কালীকৃষ্ণ দত্ত
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
" শ্রীনাথ মিত্র
" দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পা

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

শ্রাবণ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ

৫০৪ সংখ্যা । ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিদ্যুৎ পুরুষ।

হিয়া কি আঁধার ঘোর! মেঘের মতন
সে হিয়া আঁধার পুরে বিদ্যুৎ পুরুষ স্ফুরে,
বিদ্যুৎ আঁধার মেঘে যথা সুশোভন।

এক কৃষ্ণ মেঘে ভায় বিদ্যুৎ চঞ্চল।
বিদ্যুৎ-পুরুষ দিব্য নিখিল জগৎ সেব্য
নিখিল দুঃখের মেঘে ব্যক্ত অবিরল।

যেখানে মাতার চক্ষু পুত্র-শোকে ঝরে,
বিদ্যুৎ পুরুষ সেথা মুছাতে হৃদয় ব্যথা
ঢালেন সহস্রকর শান্তি-রূপ ধ'রে।

বিপদের মেঘে তিনি বিদ্যুৎ সম্পদ।
দুখের জলদ যেথা, সুখ জ্যোতি তিনি সেথা,
বন্ধনের মাঝে তিনি জ্যোতি মুক্তি-পদ।

মৃত্যুতে অমৃত-রূপে অনন্ত প্রকাশ।
দুর্ব্বলের মহাবল নিরাশে আশার স্থল
নিরানন্দে আনন্দের বিমল উচ্ছ্বাস।

যেখানে সেখানে হের—শূন্যে অন্ধকারে,
দিব্যপ্রভা নিরমল, রয়েছে তাঁহার খোলা
শত অমঙ্গল মেঘ তাহাতে নিবারে
কেন তবে হে মানব হও হতাশ্বাস?
যে আলো এ বিশ্বপরে সকল তিমির হরে,
দেখ চেয়ে তিনি তব হৃদয়ে প্রকাশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১ আষাঢ় রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরমাত্মা আমাদের লক্ষ্য, জগৎ সংসার উপলক্ষ, এবং আমাদের বাস দুয়ের মধ্য-স্থলে। সংসারের দিক্ দিয়া দেখিলে সেই উপলক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটের বস্তু, লক্ষ্য সুদূর-গম্য; ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন "দূরাৎ সুদূরে"। আত্মার দিক্ দিয়া দেখিলে উপলক্ষ সে বাহিরের বস্তু, লক্ষ্য যিনি তিনিই অন্তরের বস্তু; ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন "তদিহান্তিকে চ। পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং"। তিনি নিকটে এইখানে। যাঁহারা দেখেন তাঁহারা এইখানেই তাঁহাকে আত্মার অন্তরতম প্রদেশে নিহিত দেখেন।

পরমাত্মা নিরন্তর আমাদের অন্তরে বর্ত্তমান আছেন, তবুও যে আমরা তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি না—ইহার কারণ কেবল আ-

মাদের লক্ষ্যের বৈপরীত্য। বাহিরের বস্তুরাশিতে আমাদের লক্ষ্য এমনি তন্ময় হইয়া রহিয়াছে যে, তাহারাই আমাদের অন্তরের বস্তু—পরমাত্মা "দূরাৎ সুদূরে"। দৈহিক বা ঐহিক জীবনের গাত্রে স্পষ্ট করিয়া লেখা রহিয়াছে—"এ কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র"; কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না—দৈহিক জীবনই আমাদের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের নিকট কিছুই নহে। পরিমিত একটা উপলক্ষ, যাহা দুই দিনের জন্য বই নয়, তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য—প্রধান অবলম্বন,—বালির একটা বাঁধ আমাদের প্রস্তরের দুর্গ। মৃগতৃষ্ণিকার ছলনা ইহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যাহা লক্ষ্য, তাহাই আদর্শ; যেমন আদর্শ তেমনি পরিণাম। সংসারই যদি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের জীবন সেই আদর্শেই গঠিত হইতে থাকিবে, তাহার পরিণামও তদনুরূপ হইবে। জগৎ সংসার যেমন পরিবর্ত্তনশীল, সাংসারিক বা দৈহিক জীবনও অবিকল সেইরূপ; যেমন উষাকালের পর প্রাতঃকাল, তেমনি শৈশবের পর বাল্য; যেমন প্রাতঃকালের পর মধ্যাহ্ন, তেমনি বাল্যের পর যৌবন; যেমন মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ণ, তেমনি যৌবনের পর প্রৌঢ়াবস্থা; যেমন অপরাহ্নের পর সায়াহ্ন, তেমনি প্রৌঢ়াবস্থার পর বার্দ্ধক্য; সংসার যাঁহার লক্ষ্য, সংসারই তাঁহার জীবনের আদর্শ,—দৈহিক জীবনই তাহার একমাত্র জীবন;—আধ্যাত্মিক জীবন তাঁহার নিকট নিতান্তই প্রহেলিকা;—"দূরাৎ সুদূরে"।

এইরূপ লক্ষ্যের বৈপরীত্যই আমাদের আধ্যাত্মিক সকল রোগের মূল; অতএব কূলানুসারিণী নৌকার কর্ণধার যেমন সর্ব্বপ্রথমেই নৌকার কর্ণকে ঠিক্ করিয়া ধরিয়া থাকে সেইরূপ মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বপ্রথমেই তিনি আপনার লক্ষ্য ঠিক্ করিয়া গন্তব্য পথে প্রয়াণ করেন। শুভ বুদ্ধি—লক্ষ্য ঠিক্ করিবে; প্রযত্ন—দাঁড় টানিবে, হৃদয়ের উৎসাহ—পাল পাইবে; এইরূপ হইলেই মনো-নৌকা ক্রমে ক্রমে কূলাভিমুখে অগ্রসর হইবে, এবং আত্মা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মধাম লাভ করিবে।

পরমাত্মাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের লক্ষ্যকে পরিশুদ্ধ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। শাস্ত্রে ইহাকে বলে চিত্তশুদ্ধি। চিৎ বা চেতন পদার্থের প্রথম স্ফুরিতাবস্থাকেই চিত্ত কহে;—চিত্ত কি-না সন্ধানাত্মক মনোবৃত্তি,—যেমন অভিসন্ধি, অনুসন্ধান লক্ষ্য ইত্যাদি। চিত্ত অন্তঃকরণের মূল প্রদেশ। অন্তঃকরণের মূল পরিশুদ্ধ হইলে তাহার আপাদ-মস্তক সমস্তই পরিশুদ্ধ হয়, এই জন্য শাস্ত্রে চিত্ত-শুদ্ধির এতাধিক প্রশংসা।

পরমাত্মাকে লাভ করাই চিত্ত-শুদ্ধির চরম লক্ষ্য;—চিত্ত-শুদ্ধির উপায় প্রধানতঃ চারিটি;—আত্মসংযম, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, এবং ঈশ্বরেতে হৃদয়-সমর্পণ।

প্রথম, আত্ম-সংযম। যখন আমরা অন্য ব্যক্তির অসৎ অভিসন্ধি বুঝিতে পারি, তৎক্ষণাৎ আমরা তাহার প্রতি রুষ্ট হই,—তবে কেন আমাদের নিজের অভিপ্রায় অসৎ হইলে আপনার প্রতি আমরা রুষ্ট না হই? যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহারই আমরা দোষ সংশোধন করিতে সচেষ্ট হই, তবে কেন আপনার লক্ষ্য-ভ্রংশ-দোষের প্রতিকার না করি? আপনাকে আমরা যৎপরোনাস্তি ভালবাসি,—তবে কেন আপনার মর্ম্ম-প্রদেশে সাধ করিয়া বিষ-বীজ পোষণ করি? আমরা যখন যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখনই মনকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত "তোমার নিগূঢ় অভিসন্ধি কি আমাকে তাহ

ঠিক্ করিয়া বল, তুমি আমার হইয়া আমাকে ভাঁড়াইও না—অকপটে তোমার মন্তব্য কথা সমস্ত খুলিয়া বল”। আমাদের মনোমধ্যে যদি কোন প্রকার কু-অভিসন্ধি দেখিতে পাই, তবে তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য যে, আমরা আপনাকে তজ্জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিই,—যেন মনে করি যে, আমাদের কোন প্রিয়তম আপনার লোককে তিরস্কার দ্বারা সংশোধন করিতেছি, এবং সংশোধন না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছি না। এইরূপ যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান পূর্ব্বক আপনার মন হইতে সমস্ত কু-অভিসন্ধি একে একে উন্মূলন করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাই যে, মনের আরোগ্য শরীরের আরোগ্য অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। যদি আমরা মনকে এরূপে গঠন করিতে পারি যে, তাহা কোন দিকে না হেলিয়া না ঢুলিয়া আপনার প্রকৃত লক্ষ্যে অটল রূপে সমাহিত হইতে পারে—তবে সেরূপ মন কি-যে অমূল্য রত্ন তাহা বলা যায় না, তাহা পবিত্রতার আলয়—তাহা স্বর্গ।

দ্বিতীয়, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান। পূর্ব্বে বলিয়াছি পরমাত্মা আত্মার লক্ষ্য, সংসার উপলক্ষ। প্রথমতঃ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমক্ষে যেরূপ যেরূপ উপলক্ষ উপস্থিত হইবে, তাহার উপযুক্ত সেইরূপ সেইরূপ সৎকার্য্যে যত্ন নিয়োগ করা আবশ্যক। এইরূপ হইলেই লক্ষ্য এবং উপলক্ষ দুয়ের মধ্যে যোগ সংস্থাপিত হইয়া আমাদের জীবন-বৃক্ষ ফল-পুষ্পে সমৃদ্ধি-শালী হইয়া উঠিতে পারে। বৃক্ষ যেমন উপর হইতে সূর্য্যালোক পান করিয়া পত্র-পুষ্প-ফল-সমূহে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণ এবং বিচিত্র সৌরভ উদ্গীরণ করে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রসাদজ্যোতিকে আমরা নানা উপলক্ষে নানা সৎকার্য্যে প্রতিফলিত করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আধ্যাত্মিক পদবীতে আরোহণ করে।

তৃতীয়, সৎসঙ্গ। আমাদের আধ্যাত্মিক পথ দৃঢ় করিতে হইলে সৎসঙ্গ অতীব আবশ্যক। আত্মা আরোগ্য-লাভ করিতে না পারিলেও যদি কুসঙ্গের দূষিত বায়ু তাহার গায়ে সিঞ্চন করে, তবে তাহা আর মস্তক তুলিতে পারে না; কিন্তু যদি সুসঙ্গের পবিত্র বায়ু তাহার আরোগ্যে সহায়তা করে, তবে অচিরাৎ তাহাতে স্বর্গীয় বলের সঞ্চার হয়। পোষা হস্তীকে বনে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন ক্রমে ক্রমে বন্য হস্তী হইয়া যায়, সেইরূপ সংযত মনকে কুসঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে তাহা ক্রমে ক্রমে অসংযত হইয়া যায়; সাধুসঙ্গের পবিত্র ছায়াতেই সংযত মনের যথোচিত বিকাশ সম্ভবে।

চতুর্থ, পরমাত্মাতে হৃদয়-সমর্পণ। আত্মসংযম করিয়া, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, সৎসঙ্গ করিয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্যকে দৃঢ়রূপে স্থির করিলাম, কিন্তু তখনও যদি আমাদের হৃদয় সংসারের টানেই আবদ্ধ থাকে, যদি এরূপ হয় যে, আমাদের লক্ষ্য পরমাত্মার প্রতি আবদ্ধ কিন্তু আমাদের হৃদয় সংসারের মোহপাশে জড়িত, তবে আমাদের জ্ঞান এবং হৃদয় দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া একটা তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলে। অনুকূল বায়ু এবং প্রতিকূল স্রোত দুইই প্রবল হইলে যেমন তরঙ্গ-তাড়নে নৌকা অধীর হইয়া উঠে, সেইরূপ অনুকূল জ্ঞান এবং প্রতিকূল হৃদয় দুয়ের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে মনকে সামলানো দুষ্কর হয়। যেখানে আমাদের জ্ঞান বলিতেছে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” সেখানে যদি আমাদের হৃদয় বলিতে পারে “আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি,” এবং হৃদয় ও জ্ঞান

উভয়ের যোগে আত্মা বলিতে পারে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" তবেই আমাদের সমস্ত আ-আর ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। অদ্যকার দিনে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, সকল সত্যের মূলে এক মূল সত্য বর্ত্তমান আছেন, সকল জ্ঞানের মূলে এক মূল জ্ঞান বর্ত্তমান আছেন—সকল অন্ত-বিশিষ্ট পদার্থের মূলে অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম বর্ত্তমান আছেন—তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না; কিন্তু কয়জনের হৃদয় তাঁহাকে চায়?—হৃদয় যদি তাঁহাকে চায় তবে অবশ্যই তাঁহাকে পায়,—চায় না তাই পায় না। জ্ঞান সত্য চায়—কিন্তু সত্য চাহিলেই কিছু আর সত্য পায় না,—অনুসন্ধান আলোচনা পরীক্ষা প্রভৃতি নানা উপায়ে, জ্ঞান, সত্য উপার্জ্জন করে। কিন্তু হৃদয় যাহা চায় সে তাহা পায়ই পায়। ক্রোড়-স্থিত শিশুর ক্ষুধার উদ্রেক হইবামাত্র সে যেমন তৎক্ষণাৎ মাতার স্তন্য দুগ্ধ পায়,—তাহার চাওয়া এবং পাওয়া দুয়ের মধ্যে যেমন এক মুহূর্ত্তও কাল-বিলম্ব হয় না;—সেইরূপ সরল হৃদয়, পরমাত্মার জন্য যখনই কাঁদে—যখনই পরমাত্মাকে চায় তখনই তাঁহাকে পায়—প্রীতির এইরূপ প্রবল আকর্ষণ। অনেক জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি বলেন যে, "ঈশ্বর যাহা দিবার তাহা আপনিই দে'ন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা আবার কি।" প্রার্থনা আর কিছুই নহে—হৃদয়ের চাওয়া। যে ব্যক্তি ভালবাসা চায়, সেই ব্যক্তিকেই ভালবাসা দেওয়া যাইতে পারে,—যে ব্যক্তি তাহা চাহে না সে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক ভালবাসা গ্রহণ করানো যায় না। অতএব পরমাত্মাকে যিনি হৃদয়ের সহিত চা'ন—তিনি তাঁহাকে পা'ন, যিনি চা'ন না তিনি পা'ন না,—ঈশ্বরারাধনার এইটি সর্ব্বোচ্চ মূলতত্ত্ব।

হে পরমাত্মন্! তুমি সমস্ত জগতের পিতা মাতা সুহৃৎ—তোমার মহান্ হৃদয় আমাদের সকলেরই প্রতি আকৃষ্ট রহিয়াছে;—আমরা আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় তোমাকে সমর্পণ করিয়া যাহাতে আমরা সংসারের সমস্ত দুঃখ শোক অতিক্রম করিতে পারি ও তোমার অমৃত রস পানে অমর হইয়া সংসারের সমুদয় কর্ত্তব্য সাধনের মধ্যেও সংসারের অতীত প্রদেশে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি, তুমি আমাদের প্রতি সেইরূপ করুণাবারি বর্ষণ কর, এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত।

পাপ শব্দের অর্থ পতন(১)। কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পতনের নাম পাপ। বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা এই পতনটী সাধিত হয়(২)। পতন অবশ্য ত্রিবিধ হইতেছে কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে আত্মার পতনেই আর দুইটীর কার্য্য হয়। মনে কর লোভ একটী পাপ। ইহাতে কায়িক পতন হইল বটে কিন্তু লোভটী অধ্যাত্ম। বাচিক পতনও এইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মা মলিন না হইলে বাক্যে পাপ ব্যক্ত হয় না। এখন সাহস করিয়া অবশ্য বলা যায় যে পাপ মাত্রই আধ্যাত্মিক। কিন্তু মনুষ্য সামাজিক। সে স্বকৃত কার্য্যের নিজেই যেমন ফলভোক্তা তেমনি সমাজও অল্পাধিক তাহার অংশী হইয়া থাকে। আমার পাপে আমার আত্মা মলিন হয় সত্য কিন্তু আমি সমাজ ছাড়া

---

(১) প্রপততি।

(২) বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি। যাজ্ঞবল্ক্য।

নই, আমার অনেক পাপ সমাজের হৃদয় স্পর্শ করিয়া হয়। এই জন্য পাপ যেমন আধ্যাত্মিক তেমনি তন্মধ্যে কতকগুলি কতকটা সামাজিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বিহিত ও নিন্দিতের অনুমাপক কে? আত্মা না মনুষ্য-সমাজ? ভগবান মনু ব্যবহারিক ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যবহার ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ-কালে কহিয়াছেন, যে ধর্ম্ম রাগদ্বেষশূন্য সাধু বিদ্বান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, এবং তাঁহাদের হৃদয় অসঙ্কোচে যাহাতে অনুজ্ঞা দিয়াছে তোমরা তাহা শ্রবণ কর(১)। মনুর এই প্রমাণে বুঝা যায় একমাত্র আত্মাই ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপ পুণ্যের প্রমাপক। কিন্তু ইহা কৃতাত্মা লোকের আত্মা। যাঁহার কোনও রূপ পক্ষপাত ও বিদ্বেষ নাই, যিনি সাধু ও জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন তাঁহার আত্মা। প্রস্তরে অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হয় কি? তজ্জন্য অবশ্য মৃত্তিকা প্রস্তুত করা চাই। এই বুঝিয়াই মনু বলিয়াছেন কৃতাত্মা লোকের আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্যের প্রমাপক। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বেদাদি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপ-পুণ্য-নির্ণয়ে যদি সন্দেহ উপস্থিত হয় সে স্থলে আত্মতুষ্টিই প্রমাণ(২)। তোমার হৃদয় যাহাতে প্রসন্ন হইবে সন্দিগ্ধস্থলে তাহাই ঠিক্ বুঝিও। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র শীর্ষস্থানীয় বেদকে ধরিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্য নির্ণয় করিয়াছে। মনুও তাহা ছাড়েন নাই। তিনি বেদকে যথেষ্টই সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু কৃতাত্মা লোকের আত্মা যে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাপক এবং সন্দিগ্ধ স্থলে তোমার আত্মতুষ্টিই যে তদ্বিষয়ে বলবৎ প্রমাণ, অর্থাৎ যে দিকে হৃৎপ্রত্যয় তাহাই ঠিক্ তিনি এই সকল কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। বস্তুতও যে সমস্ত শাস্ত্রকার প্রকৃত জ্ঞানী সাধু ও সরল-স্বভাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে প্রকৃত সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই গুলি দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় ইহা পূর্ব্বাচার্য্য-দিগের মতবিরোধি। মনুর এই স্থলটীতে তাহাই ঘটিয়াছে। কৃতাত্মা লোকের আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ বলাতে একটী ভয়ানক বেদবিরুদ্ধ কথা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু টীকাকারেরা বড় সাবধান। তাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধ স্থল পাইলে অমনি বেদমোহে তাহার অর্থান্তর করিয়া দেন। আবার সকল টীকাকার তাহা করিতে চান না। মনু কহিলেন কৃতাত্মা লোকের আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্যের প্রমাপক। টীকাকার গোবিন্দরাজ তাহার যথাযথ অর্থ করিয়া মনুর অনুমোদন করিলেন। মেধাতিথিও প্রথমে সম্পূর্ণ মত দিয়া বেদভয়ে শেষে "অথবা" বলিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন কিন্তু অসরল কুল্লুকভট্টের গোবিন্দরাজকৃত ব্যাখ্যা সহ্য হইল না। তিনি চান বেদকে বজায় রাখিতে। কাজেই গোবিন্দরাজকে অনাদৃত করা তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল(১)। যাই হউক মনুর প্রমাণ এবং টীকাকারদিগের বাক্‌বিতণ্ডা এই দুইটী অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে আত্মাই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্যের প্রমাপক এইটী বৃদ্ধ মনুর প্রাণের কথা। এই জন্য

১ বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত।

আত্মনস্তুষ্টিরেব চ। মনু। বৈকল্পিকে আত্মতুষ্টি প্রমাণং। গর্গব্যাস।

১ গোবিন্দরাজস্তু হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাত ইত্যন্তঃকরণ বিচিকিৎসাশূন্য ইতি ব্যাখ্যাতবান্। তন্মতে বেদবিদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ সংশয়রহিতশ্চ ধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মলক্ষণং স্যাৎ, এতচ্চ দৃষ্টার্থগ্রামগমনাদিসাধারণং ধর্ম্মলক্ষণং নিষ্কৃষ্যা ন শ্রদ্ধধতে। মেধাতিথিস্তু হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাত ইতি যত্র চিত্তং প্রবর্ত্তয়তীতি ব্যাখ্যায় অথবা হৃদয়ং বেদঃ সম্যধ্যেতৃভাবনাদিরূপেণ কৃতহৃদয়স্থিতি হৃদয়মিত্যাচক্ষতে ইত্যুক্তবান্। কুল্লুকভট্ট।

তিনি পাপপুণ্যনির্ণয় স্থলে ঐ শ্লোকটী সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন। পরে বেদাদির কথা।

এই পাপ পদার্থটী কি ভীষণ। ইহার বাস নরকে, সঙ্কোচ ও অশান্তি ইহার মস্তক, লোভ ও মোহ ইহার পদ, রোগ ও অবসাদ ইহার দক্ষিণ, দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র ইহার বাম এবং আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ইহার পৃষ্ঠ। এই ভীষণ পিশাচ সুপরিচ্ছদে এই ভীম মূর্ত্তিটি প্রচ্ছন্ন করিয়া নিয়তই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। লোকে স্বর্ণপাত্রস্থ শোভন সুরার ন্যায় ইহাকে পান করে কিন্তু ইহার স্বভাব উদরস্থ হইলে বিষবিকার উৎপাদন করিবে। ইহা চম্পাকবর্ণা বিষকন্যার ন্যায়(১) মন প্রাণ হরণ করিয়া থাকে কিন্তু ইহার আলিঙ্গনে মৃত্যু। কিন্তু মনুষ্য-প্রকৃতি কি চমৎকার! এই জড়দেহে দেখা যায় যদি তীব্র বিষ কোনরূপে পাকস্থলীতে গিয়া পড়ে তাহা হইলে জড় শক্তি কোনও রূপে তাহাকে বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পায়। কখন কৃতকার্য্য হয় কখন বা হয় না। কিন্তু জড় অপেক্ষা আত্মার শক্তি অনন্ত গুণে অধিক। মনুষ্য না বুঝিয়া এই পাপবিষ পান করে কিন্তু আত্মার শক্তি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। ইহাকে বলে ভোগাধীন পাপক্ষয়। কিন্তু জল আইল ছাপাইয়া উঠিলে আপনাপনিই বাহির হয় এই বলিয়া কে পরীবাহ বা প্রণালী-প্রতিক্রিয়ায় বিরত থাকে? এই জন্যই শাস্ত্রে নানারূপ প্রায়শ্চিত্তের সৃষ্টি।

ঋষিরা বুঝিয়াছিলেন মনুষ্যসমাজের সৌন্দর্য্যের হেতু ধর্ম্ম ও মৈত্রীভাব। এই দুএর এমনি ঘনিষ্ঠ যোগ যে একের অভাবে অন্যটি স্থায়ী হয় না। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই মৈত্রী আবার যেখানে মৈত্রী সেই-খানেই ধর্ম্ম। কিন্তু পাপ উভয়েরই প্রতি-পন্থী। মনুষ্যের কায় মন ও বাক্যে পাপ প্রবেশ করিলে ধর্ম্ম থাকে না আবার ধর্ম্ম না থাকিলে মৈত্রী কেবল নামমাত্র হয়। মনে কর এক জনের অধিকারে কতকগুলি স্ত্রীপুত্র পরিবার ও সকলের ভরণপোষণের উপযোগী কিছু অর্থ আছে। তুমি যদি লোভের বশী-ভূত হইয়া এইগুলি আত্মসাৎ কর ইহাতে ধর্ম্ম ও মৈত্রী থাকে না, কাজেই সমাজের শান্তিভঙ্গ হয়। এই জন্য পরস্ত্রীরতি চৌর্য্য প্রভৃতি গুরুতর পাপ। সমাজ হইতে এই সকল পাপ দূর করিতে না পারিলে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব তো দূরের কথা গঠনই হয় না। আবার আর একটী দিক দেখ। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি পারিবারিক বন্ধনের প্রাণও প্রতিষ্ঠা। এদেশে একান্নবর্ত্তিতা চিরাগত প্রথা। কর্ত্তব্যবুদ্ধি এই ভাবটী রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নতুবা বিভিন্নপ্রকৃতি স্ত্রীপুরুষের একটী প্রাচীরে বদ্ধ রাখা অসম্ভব হইত। একের অধীনতা যে প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা করে তাহা এই কর্ত্তব্য বুদ্ধি। এখন মনে কর যদি তুমি পিতাকে অপহেলা কর, কি জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে গুরুপত্নী বা স্নুষা বলিয়া না বুঝ এবং তন্নিবন্ধন যদি তোমার সদাচারের কোনও রূপ ব্যতিক্রম ঘটে তবে নিশ্চয় ইহা দ্বারা পারিবারিক শান্তিভঙ্গ হইবে। এই জন্যই পিতৃদ্রোহ ও স্নুষাগমন প্রভৃতি পাতকের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ফলত ধর্ম্ম এই পারি-বারিক বন্ধনের জনক, পাপ ইহার নাশক, সুতরাং পাপ দূর করিতে না পারিলে জনসমাজের ন্যায় পারিবারিক গঠনও সম্ভব হয় না। এই কারণে ঋষিরা যেমন সমাজকে তেমনি প্রত্যেক পরিবারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সামাজিক নিয়ম রক্ষা না করিলে যেমন পাপ পারিবারিক ব্যক্তিগত নিয়ম রক্ষা না করিলে তেমনি পাপ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন তরঙ্গ

(১) পূর্ব্বকালে রাজায় রাজায় বিরোধ হইলে এই বিষকন্যা প্রয়োগ করিয়া অভীষ্ট সাধন করিত।

একস্থলে উঠিলে সমস্ত সরোবর আলোড়িত হয়। সমাজের এক কোণে অগ্নি লাগিলে তাহা ক্রমশই প্রসারিত হইয়া পড়ে। এক সময়ে ঋষিদিগের অনুবীক্ষণের পরীক্ষায় অনেক পাপ বাহির হইয়া পড়ে, তাই আজও আমরা গৃহে ও সমাজে শান্তিসুখ পাইতেছি। আজও আমাদের পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয় নাই এবং সমাজও অব্যাহত আছে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার পাপের কথা বলি। ইহা স্বধর্ম্মত্যাগ ও জাতিভ্রংশকর কার্য্য। এই উদার হিন্দুধর্ম্মের একটা স্থল আছে, তথায় জাতিভেদের সম্পর্ক নাই। সে স্থল ব্রহ্মজ্ঞানী পরমহংস। যদি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে তখন ভেদজ্ঞানের মূল জাতি আর থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যদি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে তবে জাতিভ্রংশকর কার্য্য পাপ। এক সময়ে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অনুলোমে বিবাহ চলিত। এই রীতি যুগধর্ম্মপ্রভাবে রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনে কর যদিই অনুলোম ও বিলোমে ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তনা হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা পাতিত্ব জন্মিবে, বর্ণ নষ্ট হইবে, বিলোমজ পুত্র বর্ণসঙ্করের মধ্যে গণ্য হইবে কিন্তু তোমার জাতিত্ব লোপ হইবে না। কিন্তু অনুলোম বা বিলোমক্রমেই হউক যদি কোন আর্য্যেতর জাতির সহিত তোমার যৌনসম্বন্ধ ঘটে এবং স্বধর্ম্মত্যাগ হয় ইহাতেও কেবল তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইল, জাতি নষ্ট হইল না; কিন্তু এই অনুলোম বা বিলোমসূত্রে যে সন্তান জন্মিল জাতি তাহারই যাইবে, কারণ জাতিত্ব জন্মাধীন। মোট কথা যতক্ষণ হিন্দুর সহিত হিন্দুর রক্তসংস্রব ও ধর্ম্মসম্বন্ধ ততক্ষণ সে হিন্দু। ইহাই শাস্ত্র এবং ইহাই অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যবহার। এস্থলে প্রসঙ্গত একটী কথা আসিতেছে। এই স্বধর্ম্মত্যাগ ও জাতিভ্রংশকর কার্য্য শাস্ত্রসম্মত একটী পাপ বলিয়া বোধ থাকাতে হিন্দুজাতির বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যে জাতি জয়পরাজয় নিবন্ধন অন্য জাতির সহিত যৌনসম্বন্ধে মিশিয়াছে তাহার মূলজাতিত্ব বিলুপ্ত এবং সে জিত জাতির জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেখ, এই হিন্দুজাতির মস্তকের উপর দিয়া কত জয়পরাজয় চলিয়া গেল কিন্তু ইহারা সেই সরস্বতীতীরের যে হিন্দু এখনও সেই হিন্দু। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল হিন্দুর স্বধর্ম্মত্যাগ ও জাতিভ্রংশকর কার্য্যের উপর পাপজ্ঞান।

যাক্। এই সমস্ত পাপ শাস্ত্রে অতিপাতক মহাপাতক প্রভৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল পাপের যিনি বুদ্ধি দেন, যিনি অনুমোদন করেন এবং যিনি উপকরণ দেন তিনিও পাপী। পাপীর সংস্রবে পাপ। অন্যের পাপকার্য্য দর্শন শ্রবণ ও অনুধ্যানে পাপ। এস্থলে তুমি বলিতে পার পাপীর সংস্রব না রাখিলে তাহার উদ্ধারের উপায় কি। কিন্তু ঋষিরা তাহাদের উদ্ধারের কথা বিস্মৃত হন নাই। ইহা ক্রমেই ব্যক্ত হইবে। কিন্তু তুমি কি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পার যে পাপের বিষবায়ুর মধ্যে থাকিলে তোমার নির্ম্মল আত্মায় কখন না কখন কালিমা পড়িবে না? যদি তুমি ইহা বলিতে পার তবে তুমি মনুষ্য নও দেবতা। ঋষির ব্যবস্থা তোমার পক্ষে নয়। কিন্তু ঋষিরা জানিতেন যাঁহাদের সমস্ত জীবন তপঃকৃচ্ছ্রসাধনে উৎসৃষ্ট, যাঁহাদের পুণ্যজ্যোতি ত্রিভুবন পবিত্র করিত, আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতার অনুরোধে তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না, কিন্তু সেই সমস্ত ঋষিরাও পাপীর সংস্রবে আশ্রম কলঙ্কিত করিয়া যান।

এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলি। প্রায়শ্চিত্ত পাপের মহৌষধ। প্রায় রূপে-

তপ, চিত্ত নিশ্চয়(১) যে কার্য্য পাপক্ষয় সাধন বলিয়া নিশ্চিত তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত বলে। সূর্য্য উদয় হইলে যেমন অন্ধকার নষ্ট হয় সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ নষ্ট হইয়া থাকে (২)। পাপ জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃতই হউক পুনর্ব্বার তাহার অনুষ্ঠান না করিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় (৩)। স্বকৃত কার্য্যের খ্যাপন অনুতাপ তপস্যা অধ্যয়ন ও দান এই গুলি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় (৪)। শরীরশোষণ ও ইন্দ্রিয়সংযম ইহাও উপায়(৫)। পাপ করিয়া অনুতাপ করিলেই পাপমুক্ত হয় কিন্তু এইরূপ গর্হিত কার্য্য আর করিব না এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলে তবে পবিত্র হওয়া যায়(৬) প্রাচীন ব্যবস্থাশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধি এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে এই গুলি প্রকৃত বিধি কি না তাহার আলোচনা আবশ্যক। মনুষ্য ইন্দ্রিয় দমন করে না, বিধি নিষেধ মানে না এই জন্য পাপ করে। পাপ করিবার পর যদি শত বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা তাহার অন্তর দগ্ধ করিতে থাকে তাহাকে বলিব অনুতাপ। এই হইল প্রায়শ্চিত্ত। কারণ লক্ষণের সহিত সমন্বয় করিয়া বুঝা যাইতেছে ইহা পাপের ক্ষয়সাধনত্বে নিশ্চিত। কিন্তু পাপমুক্তি ও পবিত্রতা দুইটী স্বতন্ত্র কথা। এই জন্য স্থির হইল দৃঢ়পণ করিয়া পাপের পুনরাবৃত্তি নিবৃত্ত করাই পবিত্রতা। কিন্তু মনে কর অনুতাপে পাপমুক্তি ও পুনরাবৃত্তি নিরোধে পবিত্রতাও হইল। অথচ ফলে কিছুই হইল না। কারণ অল্পপ্রাণ মনুষ্যের দৃঢ়তা বড় ব্যাপক কাল থাকে না। এই জন্য বলা হইল পাপক্ষয় বিষয়ে অধ্যয়ন ও তপস্যা চাই। অধ্যয়নে বিধিনিষেধ বোধ হইবে। আর তপস্যা অর্থে শমদমাদি সাধন। বিধি নিষেধ বোধের সহিত যদি শমদমাদি সাধন থাকে তাহা হইলে পাপের কি সাধ্য যে সে আর ত্রিসীমায় আইসে। এই হইল আধ্যাত্মিক পাপে আধ্যাত্মিক প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু ইহাতেও যদি দুষ্ট অশ্ব পথভ্রষ্ট হয় তবে তাহার অদৃষ্টে কশাঘাত। এইটী হইল শরীর-শোষণ ও দান। শরীরশোষণে বীর্য্যহানি এবং তাহার সহিত সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ই নিস্তেজ হইবে। আর দান অর্থে স্বার্থনাশ। স্বার্থনাশে মানুষ পথে আইসে। এখনও যে পাপে অর্থদণ্ড হয় ইহার অর্থ এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রসঙ্গে একজন পুরাণকার অতি সার কথা বলিয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক। তিনি কহিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত বিধি তো অনেক প্রকারই আছে কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মানুস্মরণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট(১)। এইটী বস্তুতই সার কথা। এই ব্রহ্মানুস্মরণের সহিত আত্মবোধ অনুস্যূত। আমি কে, এই কর্ম্মভূমিতে আমার জন্ম কেন, আর আমার লক্ষ্যই বা কি, মানুষ এই সকল যখন আলোচনা করে তখন নরকের ঘূর্ণাবর্ত্ত আর কি তাহাকে টানিতে পারে।

১ প্রায়েনাম তপঃপ্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতং।
অঙ্গিরা।

২ উদ্যন্নেব যথাদিত্যস্তমঃ সর্ব্বং ব্যপোহতি।
তদ্বৎ কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি।
কল্যাণং প্রায়শ্চিত্তং। ঐ

৩ অজ্ঞানাৎ যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতং।
তস্মাৎ বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ।
মনু।

৪ খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি।
মনু।

৫ শোষণেন শরীরস্য তপসা ধারনেন চ।
পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ দানেন চ দমেন চ।
মনু।

৬ কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈতৎ কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে নরঃ।
মনু।

১ প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষাং অশেষাণাং ব্রহ্মানুস্মরণং পরং।
বিষ্ণুপুরাণ।

এই তো গেল শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত। আমরা প্রথমে বলিয়াছি পাপ সমাজের হৃদয় স্পর্শ করিয়া হয় এই জন্য তন্মধ্যে কতকগুলি কতকটা সামাজিক। পূর্ব্বে এই সামাজিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিমিত্ত একটী সভা হইত। ইহার নাম পরিষৎ। ইহার সভ্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ একবিংশতি। এই সমস্ত সভ্যের বেদ-বেদাঙ্গ ও মীমাংসা জ্ঞান আবশ্যক। হেতু ও তর্কবাদে বিশেষ নিপুণতা চাই। ইহারা ধর্ম্মপাঠক (১)। মনুষ্য পাপ করিয়া সত্বরে ইহাদের শরণাপন্ন হইত এবং ইহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু এইরূপ অনুসন্ধিৎসুকে যিনি জানিয়াও বিধি ব্যবস্থা না বলিতেন তিনি পাপভাগী (২)। আর যিনি স্নেহ লোভ ও মোহবশতঃ বিধি ব্যবস্থার অন্যথা করিতেন তিনিও পাপভাগী (৩)। কিন্তু অনুগ্রহের স্থল আছে। যাহারা দুর্ব্বল শিশু বা বৃদ্ধ তাহারা অনুগ্রাহ্য (৪)। এস্থলে ব্যবস্থাসংকোচে পাপ হয় না। ইহাই শাস্ত্র।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

কম্‌টির যাঁহারা অনুরক্ত ভক্ত তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে যাঁহাদের ঈশ্বরে ও পরকালে শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারা কম্‌টির ধর্ম্ম-বিজ্ঞান পড়িলে তাঁহাদের ধর্ম্মে মতি হয়। নানা মনুষ্যের নানা প্রকৃতি,—লোকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজকও নানা প্রকার; কম্‌টির বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মতত্ত্ব যে, লোক-বিশেষকে ধর্ম্ম-পথে আকর্ষণ করিবে—ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি কোন প্রকৃতি অন্বেষণ করিয়া লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহের একটি উপায় আবিষ্কার করিলে কোনদিন লোক মাত্রেই তাহা ভাল-ভাবে গ্রহণ করিবেন—ইহা না করিবার কোন কারণ নাই। যে উপায়েই হউক না কেন, রাজশাসনই হউক—লোক-নিন্দার ভয়ই হউক—বিজ্ঞানের অনুরাগই হউক, যাহাতে লোক-সমাজ কথঞ্চিৎ ধর্ম্মপথে রক্ষিত হইতে পারে তাহাই সমাজের যথেষ্ট লাভ; কিন্তু তাহাতেই যে, মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিবে, ইহা মনে করাই ভুল। লোক-সমাজ রাজনীতির কলে চলিতে পারে, কিন্তু মনুষ্য তো আর কলের পুতুল নয় যে, তাহাতেই ঘাড় পাতিয়া দিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কাল-যাপন করিবে: লোক-সমাজ রাজ-শাসনের বলে চলিতে পারে,—কিন্তু মনুষ্য তো আর জড়পিণ্ড নহে যে, বলের তাড়নায় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পথে ধাবিত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। মনুষ্য কলের পুতুল হইতে সম্মত নহে, বলের বাধ্য হইতেও সম্মত নহে: মনুষ্য বুঝিয়া সমঝিয়া সজ্ঞান ভাবে চলিতে চাহে—বাহিরের কোন-কিছু দ্বারা চালিত হইয়া সৎপথে চলিতেও ভার বোধ করে। কম্‌টির বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মতত্ত্ব যদি মনুষ্যের এই স্বাধীনতা-প্রিয়তার যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে, তবেই "নূতন আবিষ্কার" বলিয়া কৃতবিদ্য মহলে তাহার যে-এত নাম রটিয়া গিয়াছে, তাহার যাথার্থ্য হয়, নচেৎ তাহা সম্পূর্ণ না হউক্ কতক পরিমাণে পীনাল কোডেরই সামিল হইয়া দাঁড়ায়। রাজশাসন-

---

১ একবিংশতিসংখ্যাকৈর্মীমাংসাবেদপারগৈঃ ।
বেদাঙ্গকুশলৈশ্চৈব পরিষৎ সংপ্রকল্পয়েৎ।

অঙ্গিরা।

ত্রৈবিদ্যো হেতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ। ইত্যাদি

মনু।

২ আর্ত্তানাং মার্গমানানাং প্রায়শ্চিত্তানি যে দ্বিজাঃ।
জানন্তো ন প্রযচ্ছন্তি তেপি তদ্দোষভাগিনঃ।

যম।

৩ স্নেহাদ্বা যদি বা লোভাৎ মোহাদজ্ঞানতোপি বা।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং যেতু তৎপাপং তেষু গচ্ছতি।

পরাশর।

৪ দুর্ব্বলেঽনুগ্রহঃ কার্য্যস্তথা বৈ শিশুবৃদ্ধয়োঃ।
অতোন্যথা ভবেদ্দোষ স্তস্মান্নানুগ্রহী ভবেৎ।

পরাশর।

নের পরিবর্ত্তে তিনি যদি বর্ত্তমান শতাব্দীর জন-সাধারণের মতকে, কিম্বা কয়েক জন কৃত-বিদ্য লোকের মতকে রাজত্ব দেন, তবে তাহাতে লোককে একপ্রকার বল-দ্বারা বাধ্য করা হয়, লোকের জ্ঞানকে যথোচিত স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। লোকের আত্মা চায় সত্য সত্য অমরত্ব—তুমি লোককে জোর করিয়া বলাইতে চাও যে, মরণশীল লোক প্রবাহের যে চির-স্থায়িত্ব, দশশালা বন্দোবস্তের ন্যায় মৃত্যুর যে-একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—তাহাই আমাদের যথেষ্ট অমরত্ব, অন্য কোন অমরত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। লোকের আত্মার স্ফূর্ত্তি অনন্ত জীবনের দিকে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের দিকে, অনন্ত সত্যের দিকে, তুমি তাহাকে বল পূর্ব্বক পৃথিবীতে খুঁসড়িয়া রাখিতে চাও। তুমি বলিতেছ কর্ত্তব্যানুসারে পরের জন্য কার্য্য করিবে, আমাদের শাস্ত্রও বলিতেছে কর্ত্তব্যানুসারে পরের জন্য কার্য্য করিবে, তোমার আমার মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, তোমার লক্ষ্য শতায়ু পার্থিব জীবনের অস্থায়ী সুখ-স্বচ্ছন্দ, আমার লক্ষ্য চিরায়ু আধ্যাত্মিক জীবনের অটল আত্মপ্রসাদ ও তাহার অনুগত আর আর সুখ। মনুষ্যের আত্মার অনন্ত সত্য-প্রিয়তা ও মঙ্গল-প্রিয়তাকে বল-পূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রোথিত করিয়া রাখিলে মনুষ্যের আত্মা না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না—তুমি তাহাকে কাঁদিতেও দিবে না—তোমার নূতন আবিষ্কৃত বিজ্ঞান-শাস্ত্র দিয়া তাহার মুখ চাপা দিয়া রাখিবে!—এরূপ শাসন পীনাল্ কোড্ অপেক্ষা কিসে যে, ন্যূন, তাহা বুঝা যায় না।

পরলোকের ভয়ে বা পীনাল্ কোডের ভয়ে যাঁহারা কুকার্য্য হইতে বিরত হ'ন, আমাদের দেশে তাঁহারা ধর্ম্মের কনিষ্ঠ অধিকারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কমটির যেরূপ অভিপ্রায় যে, লোকে বুঝিয়া সমুঝিয়া ধর্ম্ম-পথে চলুক, আমাদের দেশের ভগবদ্গীতা প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রেরও সেইরূপ অভিপ্রায়,—উভয়ের প্রভেদ কেবল এই যে, কম্‌টি আত্মার পায়ে লৌহ-শৃঙ্খল বাঁধিয়া তাহাকে পার্থিব খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিতে চা'ন, আমাদের শাস্ত্র আত্মার স্বাধীনতা-ক্ষেত্র অনাবৃত করিয়া মনুষ্যের আত্মাতে জীবন সঞ্চার করে; আমাদের শাস্ত্রের যাহা সার মর্ম্ম তাহা এই,—

একদিকে আমাদের এই নশ্বর দেহ—আর একদিকে অবিনশ্বর আত্মা। নশ্বর দেহের এই যে, প্রাণ, ইহা অজ্ঞান-ভাবে আপনার অন্ধ উদ্দেশ্য সাধন করে,—মনুষ্যকে শৈশব হইতে কৌমারে, কৌমার হইতে যৌবনে, যৌবন-হইতে বার্দ্ধক্যে অলক্ষিত ভাবে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়,—এ প্রাণের স্ফূর্ত্তি-ক্ষেত্র বিষয়-রাজ্য—এ প্রাণের তৃপ্তি পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ইন্দ্রিয়-সুখ। অবিনশ্বর আত্মায় যে প্রাণ, তাহার উদ্দেশ্য ওরূপ অন্ধ উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু সজ্ঞান উদ্দেশ্য, তাহার স্ফূর্ত্তি-ক্ষেত্র অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, তাহার তৃপ্তি ব্রহ্মানন্দ। যে ব্যক্তি আত্মার অনন্ত জীবনের মর্ম্মগ্রাহী সে ব্যক্তি অবিনশ্বর আত্মার চিন্ময় আনন্দময় উদ্দেশ্যকেই আপনার উপর আধিপত্য দে'ন; অনুচিত ইন্দ্রিয়াসক্তি ও স্বার্থপরতা সে উদ্দেশ্য-সাধন-পথের কণ্টক-স্বরূপ, এই জন্য তাহা হইতে তিনি বিরত হ'ন। প্রাণ যেমন শরীরকে নশ্বর জীবন-পথে অগ্রসর করে, ধর্ম্ম সেইরূপ আত্মাকে অবিনশ্বর জীবন-পথে অগ্রসর করে; প্রাণ যেমন শরীরের স্ফূর্ত্তি-সাধন করে, ধর্ম্ম সেই-রূপ আত্মার স্ফূর্ত্তি সাধন করে; প্রাণ-ক্রিয়া অজ্ঞান-ভাবে সাধিত হয়, ধর্ম্মক্রিয়া সজ্ঞান-ভাবে সাধিত হয়; ধর্ম্মই আত্মার প্রাণ। অবিনশ্বর আত্মার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োজন, নশ্বর

দেহের জন্য ধর্ম্মের অতি অল্পই প্রয়োজনীয়তা।

বর্ত্তমান সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, নানা লোকে নানা উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি রাজ-শাসনের ভয়ে চুরি ডাকাতি হইতে বিরত থাকিয়া কৃষি-বাণিজ্যাদি হিত-কার্য্যে নিযুক্ত হয়—রাজ-শাসন এখানে সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক। কোন ব্যক্তি লৌকিকতা রক্ষার জন্য অতিথি-সৎকারে প্রবৃত্ত হ'ন—সামাজিক শাসনই এখানে সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক। কোন ব্যক্তি স্বীয় রাজস্ব-বৃদ্ধির উদ্দেশে প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করেন,—বিষয়-বুদ্ধি এখানে সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক। কোন ব্যক্তি কোন কাব্য বা নাটকের নায়ককে আদর্শ করিয়া লোক-হিতকর কার্য্য-বিশেষের অনুষ্ঠান করেন. এখানে রসজ্ঞতা সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, লোক বিশেষের অনুষ্ঠেয় সৎকার্য্য—প্রবর্ত্তক-বিশেষের উপর নির্ভর করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে কম্‌টি যখন বলিয়াছেন যে, "পরের জন্য কার্য্য করিবে" তখন সে কার্য্যের প্রবর্ত্তক তিনি কি স্থির করিয়াছেন? সে প্রবর্ত্তক বোধ হয় এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি পরের জন্য কার্য্য করে, তাহা হইলে সমাজান্তর্গত সকল ব্যক্তিই পরাকাষ্ঠা উন্নতি প্রাপ্ত হয়; এটি অবশ্য উচ্চ অঙ্গের বিষয়-বুদ্ধির কথা, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির কথা ইহা অপেক্ষাও উচ্চ। কম্‌টির অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, আমি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে সুখী করিতে পারি তবে তাহার সুখই আমার সুখ;—লোক-সমাজের ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধি আমাদের প্রতিজনের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, আমি যদি আপন-চেষ্টায় তাহার বিশেষ কোন সহায়তা করিতে পারি তবে সমাজের সেই ভবিষ্যৎ সুখে আমি আপনাকে যথেষ্ট সুখী জ্ঞান করি—অন্য কোন সুখ আমার নিকট তেমন পূজ্য নহে। কিন্তু যাহার সুখে আমি সুখী হইতে ইচ্ছা করিতেছি—তাহার সুখই বা কয়দিনের জন্য? আমারই হউক্ আর অন্যেরই হউক—কাহারো পার্থিব সুখ একশত বৎসরের অধিক হইতে পারে না;—আত্মার চিরস্থায়ী সুখের তুলনায় একশত বৎসরের পার্থিব সুখ কিছুই নহে। আপনার বা অন্যের শুদ্ধ কেবল সেই অস্থায়ী পার্থিব সুখ-টুকুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কোন কার্য্য করিলে, তদুপলক্ষে আমরা এ কথা বলিতে অধিকারী নহি যে, তিনি কর্ত্তব্য-বোধে ঐ কার্য্য করিতেছেন;—হইতে পারে তিনি কর্ত্তব্য বোধে ঐ কার্য্য করিতেছেন,—হইতে পারে তিনি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ঐ কার্য্য করিতেছেন। যিনি রাজ-শাসনের ভয়ে কোন কার্য্যকে কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাঁহার সে কর্ত্তব্য-বোধকে আমরা কর্ত্তব্য বোধই বলি না, আমরা বলি যে, রাজ-শাসন ভয়ে তিনি উহা করিতেছেন—কর্ত্তব্য-বোধে নহে। যে কর্ত্তব্য-বোধের প্রবর্ত্তক রাজ-শাসন তাহাকে যেমন আমরা কর্ত্তব্য-বোধ বলি না, সেইরূপ যে কর্ত্তব্য-বোধের প্রবর্ত্তক বিষয় বুদ্ধি, বা বৈষয়িক ক্ষতিলাভ গণনা, তাহাকেও আমরা কর্ত্তব্য-বোধ বলি না; কর্ত্তব্য-বোধ বলি তাহাকে যাহার প্রবর্ত্তক—বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-বুদ্ধি। ধর্ম্ম-বুদ্ধির মূল—বিষয় নহে, কিন্তু আত্মা। বিষয়-দ্বারা চালিত না হইয়া যে-কোন কার্য্য করা যায় তাহাই বিশুদ্ধ রূপে আত্মার কার্য্য; আর, বিষয়-দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিব না—আত্মার স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে কার্য্য করিব—এই যে বুদ্ধি, ইহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধি। অবিনশ্বর আত্মার ধর্ম্মই ধর্ম্ম; নশ্বর দেহাদির ধর্ম্ম আর এক সামগ্রী। আমার কৃত কার্য্য-সকলে আত্মার ধর্ম্ম প্রকট হউক্—

ইহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধির মর্ম্মাভিসন্ধি। এইরূপ ধর্ম্ম-বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করার নামই কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করা। কার্য্য একই—কিন্তু তাহা পাঁচ-ভাবের পাঁচটি প্রবর্ত্তক অনুসারে কৃত হইতে পারে; প্রথম, রাজ শাসন-ভয়ে, দ্বিতীয়, সামাজিক শাসন-ভয়ে; তৃতীয়, বিষয়-বুদ্ধি অনুসারে; চতুর্থ, পরলোক-ভয়ে; পঞ্চম, ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে; এখন দেখিতে হইবে যে, অনুষ্ঠিত কার্য্যের মূল্য প্রবর্ত্তকের উচ্চ-নীচতার উপরেই নির্ভর করে; অতএব, জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্‌টি অপেক্ষা-কৃত উচ্চ অঙ্গের প্রবর্ত্তক—বিষয়-বুদ্ধি না ধর্ম্মবুদ্ধি? কম্‌টি বলেন, পরের জন্য কার্য্য করিবে; কেন? না পরের তাহাতে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে; কয় দিনের জন্য? না এক শত বৎসরের জন্য; কার্য্য-কর্ত্তার তাহাতে কি ফল-লাভ হইবে? না তাঁহার নাম অমর হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বলে: পরের জন্য কার্য্য করিবে; কেন? না পর-ব্যক্তি তাহাতে নির্ব্বিঘ্নে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে; কয় দিনের জন্য? অনন্ত কালের জন্য; কার্য্য-কর্ত্তার তাহাতে কি ফল লাভ হইবে? স্বার্থ-পরতা পরাজিত হইয়া আত্মাতে অমায়িক মুক্ত-ভাব এবং নির্ম্মল প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইবে—চিন্ময় আনন্দময় পরব্রহ্মের আবির্ভাবের পথ উন্মুক্ত হইবে; এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, তাহার বিচার-কার্য্য পাঠক-বর্গের সদ্বিবেচনায় সন্ন্যস্ত হইল।

বিষয়ী লোক এবং ধার্ম্মিক লোক, দুয়ের মধ্যে মর্ম্ম-গত প্রভেদ এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি পরমাত্মাকে জগতের কেন্দ্র-স্থান জানিয়া সেই দিক্ হইতে জগৎ অবলোকন করেন: বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়-রাজ্যকেই কেন্দ্র-স্থান জানিয়া সেই দিক্ হইতে জগৎ অবলোকন করেন। সূর্য্যের দিক্ হইতে সৌর জগৎ অবলোকন করা যেমন বিজ্ঞান-দৃষ্টির অনুরূপ কার্য্য, সেইরূপ পরমাত্মার দিক্ হইতে জগৎ অবলোকন করা অধ্যাত্ম-দৃষ্টির অনুরূপ কার্য্য। এখানে এই একটি কথার প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, জগৎ যেহেতু পরমাত্মার আয়ত্তাধীন, এ জন্য যাঁহারা পরমাত্মাকে প্রীতি করেন তাঁহারা তাঁহারই প্রীতির মধ্য দিয়া জগৎকে প্রীতি করেন,—কিন্তু পরমাত্মা যেহেতু জগতের আয়ত্তাধীন নহেন, এজন্য যাঁহারা শুদ্ধ কেবল জগৎকে প্রীতি করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন তাঁহারা পরমাত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া অস্থায়ী পৃথিবীতেই মনকে নিমগ্ন করিয়া রাখেন; তেমনি বলা যাইতে পারে যে, দৈহিক প্রাণ যেহেতু আধ্যাত্মিক প্রাণের আয়ত্তাধীন, এজন্য যাঁহারা রীতিমত আধ্যাত্মিক প্রাণের স্ফূর্ত্তি সাধন করেন, দৈহিক প্রাণের স্ফূর্ত্তি-সাধনও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে; কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রাণ যেহেতু দৈহিক প্রাণের আয়ত্তাধীন নহে, এ জন্য যাঁহারা শুদ্ধ কেবল দৈহিক প্রাণের স্ফূর্ত্তি সাধন করেন তাঁহারা আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে জরাজীর্ণ হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণে অভিভূত হইয়া পড়েন। বিষয়ী লোক যদিচ পরমার্থ রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আত্মার স্ফূর্ত্তি হারাইয়া ফেলে, কিন্তু ধার্ম্মিক লোক বিষয়-রাজ্য ছাড়িয়া দেন না—বিষয়-রাজ্যকেও তিনি পরমার্থের অন্তর্ভূত করিয়া লন;—পরমাত্মার দিক্ দিয়া তিনি বিষয়-রাজ্য অবলোকন করেন; পরমাত্মার প্রীতির মধ্য দিয়া তিনি সুখ-রূপে বিষয়-রাজ্য উপভোগ করেন; পরমাত্মার আধিপত্যের অনুগামী হইয়া তিনি বিষয়-রাজ্যে আত্মার আধিপত্য বিস্তার করেন। কি ইন্দ্রিয়-সুখ, কি দাম্পত্য প্রেম, কি সংসার সুখ, কি ঐশ্বর্য্য-সুখ, সকলই তিনি

যথা ন্যায়ে, যথা-পরিমাণে, যথা-দেশে, যথা-কালে উপভোগ করেন,—কিন্তু কেন্দ্র প্রদেশের সিংহাসন তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও দে'ন না ;—ইহরই নাম সংসারে থাকিয়া অনাসক্ত চিত্তে সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করা ;—আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শাস্ত্রে ইহাই মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া ভূয়োভূয় গীত হইয়াছে।

বাহিরের প্রকৃতিকে মনুষ্যের বশে আনয়ন করাতে যেমন বিজ্ঞানের একটি অসাধারন উপকারিতা ও চমৎকারিতা প্রতীয়মান হয়, মনকে আত্মার বশে আনয়ন করাতে ধর্ম্মবুদ্ধির সেইরূপ একটি অসামান্য উপকারিতা ও চমৎকারিতা জাজ্বল্যরূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতিকে বশ করিয়া বিজ্ঞান যেমন বৈষয়িক ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য ভোগের পথ খুলিয়া দেয়, মনকে বশ করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধি সেইরূপ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য ভোগের পথ খুলিয়া দেয়,—সে ঐশ্বর্য্য এবং সে সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের দিক্ দিয়া আইসে—বিষয়ের দিক্ দিয়া নহে।

ফল কথা এই যে, পরমাত্মাকে মধ্যস্থলে পাইলে—জগতের সমস্ত যোগেরই মূল পাওয়া যায় ; সেই চিন্ময় প্রেমময় মহান্ পুরুষের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিলে—আত্মায় আত্মায় যোগ—আত্মায় শরীরে যোগ—আধ্যাত্মিক জগতে ভৌতিক জগতে যোগ—যেখানে যত প্রকার যোগ আছে সমস্তেরই মূল পাওয়া যায়—সমস্তই বিশদ হইয়া উঠে, নচেৎ ক্ষুদ্র বিষয়-রাজ্যের উপরে—এবং ক্ষুদ্রতর অভিমানের উপরে—দাঁড়াইয়া জগৎ দর্শন করিলে—চারিদিক্ ঘোর জটিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ;—তাহাতে আমাদের নিজের দৃষ্টি ঘনাচ্ছন্ন হইয়া যায়—আমরা মনে করি সূর্য্য ঘন-মেঘে আচ্ছাদিত। সূর্য্যকে ছাড়িয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ন্যায় পরমাত্মাকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে—ইচ্ছা পূর্ব্বক এমনি এক জটিল গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করা হয় যে, তাহার গর্ভাভ্যন্তরে প্রবেশ করাও দুষ্কর—তাহার মধ্য হইতে বাহির হওয়াও দুষ্কর।

কম্‌টির স্বপক্ষে এই একটি বলিবার কথা আছে যে, ঈশ্বরের, পরকালের, ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা-না-করায় বিজ্ঞানের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না,—আমরা ইহা অপেক্ষাও অধিক এই বলি যে, ধর্ম্ম-কার্য্যের কর্ত্তব্যতা স্বীকার করা-না করাতেও বিজ্ঞানের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। এক জন সাধু লোক যদি কোন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেন, তবে তাহাতে বিজ্ঞান যেমন উপকৃত হইবে, এক জন পাপী লোক সেই সত্য আবিষ্কার করিলে বিজ্ঞান যে কোন অংশে, তাহা অপেক্ষা অল্প উপকৃত হইবে—ইহা বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞান পাপপুণ্যদর্শী আত্মার প্রতি নিতান্তই উদাসীন। যাহা স্বভাবের উত্তেজনায় ঘটে, ও যাহা ইন্দ্রিয়-গোচরে প্রকাশ পায়, তাহাই বিজ্ঞানের মূল উপাদান, কিন্তু আত্মা স্বয়ং না করিলে যাহা ঘটিবার নহে—প্রকৃতির অন্ধ উত্তেজনায় ঘটিবার নহে—এরূপ স্বা[illegible] ভবিতব্য ঘটনা নহে কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্য, মূলেই বিজ্ঞানের আলোচ্য-বিষয় হইতে পারে না। ধ্রুব বিজ্ঞান-তত্ত্ব যদি কিছু থাকে তবে তাহা গণিত-তত্ত্ব ;—কিন্তু গণিত শুদ্ধ কেবল বিষয়-রাজ্যেই খাটে—আধ্যাত্মিক রাজ্যে খাটে না। কম্‌টি যদি "ধ্রুব-তত্ত্ব" এই অর্থে পজিটিবিসম্ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—তবে গণিত-বিজ্ঞান গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল ; কেননা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যে যে প্রদেশে গণিতের গতিবিধি নাই, সেই সেই প্রদেশই অধ্রুব-

তত্ত্বে পরিপূর্ণ; অধ্যাত্ম-প্রদেশের তো কথাই নাই—সেখানে গণিতের গতিবিধি মূলেই চলিতে পারে না। জীবতত্ত্ব হইতে সমাজ-তত্ত্ব পর্য্যন্ত গণিতের অগম্য বিস্তীর্ণ একটা জাঙ্গলা-রাজ্য পড়িয়া আছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সময়ে সময়ে নবোৎসাহে মাতিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যায়, আর অমনি—নত-শির হইয়া ফিরিয়া আইসে;—বিজ্ঞান কতবার রাবণের ন্যায় স্তরে স্তরে সোপান প্রস্তুত করিয়া জড়পথ দিয়া আত্মাতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইয়াছে—শেষে দেখিয়াছে যে, কিছুতেই তাহার সে চেষ্টা সফল হইবার নহে। আত্মার গুরুত্বও তৌল করা যায় না—তাহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থও পরিমাণ করা যায় না—সুতরাং কোন কালে তাহা যে গণিতের আয়-ত্তাভ্যন্তরে আসিবে তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই; ইহা বুঝিয়াই কম্‌টি বৈজ্ঞানিক রাজ্যের চারিদিকে প্রাচীর গাঁথিয়া তাহার ও-দিকে যাইতে তাঁহার শিষ্যদিগকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার বিরোধী পক্ষকে তিনি নানা ভয় দেখাইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, ও তাঁহার ভক্তদিগকে নানা প্রলোভন দে-খাইয়া বৈজ্ঞানিক রাজ্যে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ধ্রুব আত্মতত্ত্ব তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি একেবারেই ঠিক্ ঠাক্ স্থির করিয়া বসিয়া আছেন যে, কোন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারেই তাহা পাওয়া যায় না; তাঁহার এ কথাটিতে কিছু অতিরিক্ত বল-দর্প প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যেমন ধ্রুব গণিত-তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে সেইরূপ ধ্রুব আত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া যায়,—এবং তাহাই মনুষ্য-সমাজের ধর্ম্মনীতির ধ্রুব ভিত্তি মূল।

উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে অম্বরীষ নামে সপ্তদ্বীপা পৃ-থিবীর কোন এক রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যের দুর্লভ এরূপ অতুল বিভব লাভ করিয়াও তাহা স্বপ্নলব্ধ দ্রব্যের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বুঝিতেন। যাহার প্রাপ্তি বা নাশে মানুষ মোহে নিমগ্ন হয় অম্বরীষ সেই বিভব যে অস্থায়ী তাহা জানিতেন। তিনি ভগ-বদ্ভক্ত এবং সাধুপ্রিয় সেই জন্য বিভব তাঁহার চক্ষে লোষ্ট্রতুল্য ছিল। হরিপদারবিন্দে তাঁহার মন, হরিগুণবর্ণনে তাঁহার বাক্য, হরি-কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার কর্ণ এবং হরির পাদ-বন্দনে তাঁহার মস্তক। হরির প্রসাদ স্বীকা-রের জন্য তাঁহার ভোগ কিন্তু ভোগের ইচ্ছাতে নহে। কারণ প্রসাদস্বীকারে ভগ-বদ্ভক্তিই বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইরূপে অম্বরীষ নিজের সমস্ত কর্ম্ম হরির চরণে অর্পণ পূর্ব্বক ধর্ম্মশীল বিপ্রগণের সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার ও হস্ত্যশ্বাদি ভোগ্য বস্তুতে তাঁহার আসক্তি হ্রাস হইয়া আসিল। কলতঃ এইরূপ লোকের রাজ্য-শাসন ও শত্রুদমন অসম্ভব, কিন্তু বলিতে কি, ভক্তবৎসল হরি নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি অম্বরীষের ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহার রক্ষাবিধানার্থ শত্রুভয়াবহ চক্রকে আদেশ করিলেন।

এদিকে অম্বরীষ তুল্যশীল মহিষীর সহিত বৎসরব্যাপী দ্বাদশীব্রতে দীক্ষিত। তিনি ব্রতান্তে কার্ত্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কালিন্দীজলে স্নান করিলেন এবং মধুবনে হরিকে তন্ময় আন্তর ভাবে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণের অনু-জ্ঞাক্রমে পারণার উপক্রম করিতেছেন এই অবসরে মহর্ষি দুর্ব্বাসা অতিথিরূপে উপস্থিত। তিনি

রাজদ্বারে অতিথি। রাজা অম্বরীষ প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে ভোজনে অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বাসাও সম্মত হইলেন এবং আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কালিন্দীতে গমন করিলেন। তিনি উহার পবিত্র জলে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে পারণা চাই। অম্বরীষ এই ধর্ম্মসঙ্কটে অতিমাত্র চিন্তিত হইলেন এবং ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ। ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করা দোষ, আবার দ্বাদশীতে পারণা না করাও দোষ। এক্ষণে এরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক যাহাতে আমার শ্রেয় হয় এবং অধর্ম্মও না জন্মে। ব্রাহ্মণেরা কহিয়াছেন জলপান করা খাওয়া না-খাওয়ার তুল্য। অতএব আমি কেবল জলপান করিয়া দ্বাদশী ব্রতের পারণা করি। এই বলিয়া তিনি কিঞ্চিৎ জলপান পূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহর্ষি দুর্ব্বাসা কালিন্দী-জলে আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিয়া উপস্থিত। তিনি বুদ্ধিবলে অম্বরীষের কার্য্য বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত এবং মুখ ভ্রূকুটীতে ভীষণ হইয়া উঠিল। তিনি অতিমাত্র বুভুক্ষিত। তিনি রাজার এই ব্যতিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রোষগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, এই রাজা ঐশ্বর্য্যমত্ত নিষ্ঠুর ও অবৈষ্ণব। দেখ ইহার কতদূর অধার্ম্মিকতা। আমি অভ্যাগত অতিথি। এই ব্যক্তি আমাকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল কিন্তু অগ্রে আমায় না দিয়া স্বয়ং আহার করিয়াছে। আমি ইহার এই পাপের প্রতিফল এখনই দেখাইব। এই বলিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রোধভরে মস্তকের জটা উৎপাটন করিলেন। জটা অসিরূপে পরিণত হইল। তদ্দৃষ্টে অম্বরীষ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্থির পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হরির চক্র ভক্ত-রক্ষায় আদিষ্ট। অগ্নি যেমন রুষ্ট সর্পকে দগ্ধ করে তদ্রূপ ঐ চক্র অসি দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এই অবসরে মহর্ষি দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিলেন। করাল দাবানল যেমন লকলক শিখায় সর্পের অনুসরণ করে তদ্রূপ ঐ বিষ্ণুচক্র দুর্ব্বাসার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। দুর্ব্বাসা সুমেরুগুহায় প্রবিষ্ট হইবেন তথায় ঐ চক্র। আকাশ পাতাল সমুদ্র যথায় যান তথায় ঐ চক্র। যখন তিনি দেখিলেন আর কোথাও নিস্তার নাই তখন তিনি ভীতমনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, দেব! আমায় রক্ষা কর। ব্রহ্মা কহিলেন ঋষে! দুই পরার্দ্ধ সংখ্য কাল গত হইলে যখন দাহোদ্যত কালদ্বন্দ্বরূপের ক্রীড়া অবসান হইবে তখন সমস্ত বিশ্বের সহিত আমারও এই স্থান তাঁহার ভ্রূভঙ্গি মাত্রেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। আমিই বল, রুদ্র দক্ষ ও ভৃগুই বল, আমরা সকলেই লোকহিতার্থ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আছি। তুমি তাঁহার ভক্তদ্রোহী, তোমাকে রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে।

অনন্তর দুর্ব্বাসা কৈলাসবাসী শিবের শরণাপন্ন হইলেন। শিব কহিলেন, বৎস! আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি সেই ভূমা ঈশ্বরে এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে। আমি বল, সনৎকুমার নারদ ও কপিলই বল আমরা সকলে তাঁহার মায়ায় আচ্ছন্ন। সেই বিশ্বপতির এই অস্ত্র আমাদের সকলেরই দুর্বিষহ। অতএব তুমি হরিরই শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।

তখন দুর্ব্বাসা নিরাশ হইয়া বৈকুণ্ঠে যাত্রা করিলেন। তথায় শ্রীনিবাস শ্রীর সহিত অধিবাস করিয়া আছেন। দুর্ব্বাসা কম্পিত দেহে তাঁহার পদতলে পড়িয়া কহি-

লেন, অনন্তদেব! আমি কৃতাপরাধ, তুমি আমায় রক্ষা কর। আমি তোমার প্রভাব না জানিয়া তোমার ভক্তকে দুঃখ দিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার নাম কীর্ত্তন মাত্র যখন নরকস্থ ব্যক্তিও মুক্ত হয় তখন তোমার অসাধ্য আর কি আছে। ভগবান কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ভক্তের অধীন এই জন্য যেন কতকটা অস্বতন্ত্রের ন্যায় হইয়া আছি। ভক্ত আমার প্রিয়। তাহারা আমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। আমি যাহাদের একমাত্র গতি সেই সমস্ত ভক্ত ব্যতীত আমি আত্যন্তিকী বিভূতি অধিক কি আপনাকেও চাহি না। দেখ যাহারা গৃহ পুত্র বিভব প্রাণ ইহকাল ও পরকাল সমস্তই ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে আমি তাহাদিগকে কিরূপে ত্যাগ করি। যে সমস্ত সমদর্শী সাধু আমাতে হৃদয় বাঁধিয়াছেন তাঁহারা সৎস্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে সেইরূপ আমাকে বশীভূত করেন। সাধুরা আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। তাহারা আমায় ব্যতীত আর কাহাকেই জানে না, আমিও তাহাদিগের ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না। এক্ষণে যার উপর তোমার হিংসাপ্রবৃত্তি হইয়া ছিল তুমি শীঘ্র তাহার নিকট যাও। আমি সাধু ভক্তকে যে তেজ দিয়া থাকি তাহাই প্রহর্ত্তার অশুভ সাধন করে। দেখ, তপ ও বিদ্যা দুইই ব্রাহ্মণের নিঃশ্রেয়সকর কিন্তু এই দুইই আবার দুর্বিনীত কর্ত্তার সম্বন্ধে বিপরীত ফল উৎপাদন করে। তোমার যে অনর্থ উপস্থিত ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নাই। এক্ষণে তুমি অম্বরীষের নিকট যাও, গিয়া ক্ষমা চাও, ইহাতেই তোমার স্বস্তি ও শান্তি হইবে।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রাজা অম্বরীষের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুঃখিত মনে তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন। অম্বরীষ পাদস্পর্শে অতিশয় লজ্জিত। দুর্ব্বাসার উপর তাঁহার অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি চক্রকে স্তব করিতে লাগিলেন, চক্র! তুমি সকল ধর্ম্মের সেতু ও অধার্ম্মিকের ধূমকেতু। ত্রিলোক তোমারই প্রভাবে রক্ষিত হইতেছে। তোমার ধর্ম্মময় তেজে অন্ধকার বিনষ্ট ও আলোক উদ্ভাসিত হয়। তুমি খলস্বভাবকে বিনাশ করিবার জন্য আদিষ্ট। এক্ষণে আমাদের কুলসৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ। যদি আমি দান করিয়া থাকি, যদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি আমার কুলে ব্রাহ্মণই দেবতা হন তবে এই সমস্ত পুণ্যে এই ব্রাহ্মণ নিরাপদ হউন। সর্ব্বগুণাধার অদ্বিতীয় ঈশ্বর যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন তবে সেই পুণ্যবলে এই ব্রাহ্মণ নিরাপদ হউন।

রাজা অম্বরীষ এইরূপ স্তব করিবামাত্র দুর্ব্বাসা অস্ত্রতাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, অহো! আজ যথার্থই ঈশ্বরসেবকের মহত্ত্ব দেখিলাম। রাজন্! আমি কৃতাপরাধ তথাচ তুমি আমার মঙ্গল কামনা করিতেছ। আশ্চর্য্য! অথবা যাঁহারা ভগবানকে হৃদয়ে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সমস্ত সাধুর দুষ্কর কি আছে। যাঁর নাম শ্রবণমাত্র লোক পবিত্র হয় তাঁর সেবকের অত্যজ্য কি আছে। রাজন্! তুমি অতি দয়ার্দ্রস্বভাব। তুমি যখন আমার অপরাধ তুচ্ছ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিলে তখন ইহা অপেক্ষা অনুগ্রহ আর কি হইতে পারে। এক্ষণে তুমি সুখে থাক, আমি স্বস্থানে চলিলাম।

তাৎপর্য্য।

যে ভক্তি অহৈতুকী তাহাই প্রকৃত ভক্তি। আর যে ভক্তি স্বার্থমিশ্রিত তাহাকে

ভক্তি বলিতে যাও বল কিন্তু তাহার ব্যভিচার আছে। স্বার্থলাভ ও স্বার্থনাশ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে সুতরাং তাহা ব্যভিচারী। কিন্তু জানি না কি জন্য, অথচ প্রাণ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না ইহাকে বলে অহেতুকী ভক্তি। হেতু, তর্ক ইহার ত্রিসীমায় নাই। আত্মবিস্মৃতি এই ভক্তির প্রাণ এই জন্য ইহার নিকট ইহকাল ও পরকাল বিস্মৃত। ভক্তি যখন আত্মবিস্মৃতি আনে তখন কি ইহকাল কি পরকাল সকল কালই তাহার চক্ষে সমান। এই ভক্তি নিজের হৃদয় ঈশ্বরকে দেয় এবং নিজে ঈশ্বরের হৃদয়কে পায় ইহাতেই তাহার পূর্ণ তৃপ্তি। সে আর কিছু দেখে না, আর কিছু চায়ও না, ভাগবতকার এই উপাখ্যানে সেই ভক্তিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু যে আত্মবিস্মৃত ঈশ্বরই তাহার রক্ষক। ভাগবতকার স্পষ্টই বলিতেছেন ঈশ্বরের তেজ বা শক্তিই তাহাকে রক্ষা করে। তুমি ভক্তের অপকার করিয়া কোথায় পরিত্রাণ পাইবে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন স্থান নাই যথায় ঈশ্বরের ঘাতিনী শক্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পার। আকাশ পাতাল যথায় যাও সে তোমার অনুসরণ করিবে। কিন্তু ভক্ত। ঈশ্বরের শক্তি তোমার রক্ষক বলিয়া আপনাকে প্রশ্রয় দিও না। ক্ষমাই তোমার মহত্ত্ব। অপরাধীর মঙ্গল কামনাই তোমার ধর্ম্ম।

সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

নবধা তুষ্টিঃ ॥ ১৩॥

নয় প্রকার তুষ্টি (জ্ঞানের সন্তোষাত্মক পরিণাম) হইয়া থাকে।

কেহ প্রকৃতিকেই পরমপদার্থ বিবেচনা বা কল্পনা করিয়া পরিতুষ্ট থাকেন। তাঁহার তাদৃশ তুষ্টি, তাদৃশ চিত্তপরিতোষ বা তাদৃশ চিত্তপ্রসাদ শাস্ত্রীয় ভাষায় "অম্ভ" সংজ্ঞায় কথিত হয়। কোন কোন সাধক বুদ্ধিকেই পুরুষ বা আত্মা ভাবিয়া পরিতুষ্ট থাকেন। তাঁহাদের তাদৃশী পরিতুষ্টির নাম "মলিনা" যাঁহারা অহঙ্কার তত্ত্বকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করত পরিতুষ্ট—তাঁহাদের তুষ্টি অমোঘা। ভোগকারণ তন্মাত্রা বা সুক্ষ্মভূত যাঁহাদের জ্ঞানে পরম পরিতুষ্টির কারণ, তাঁহাদের তাদৃশ পরিতোষের নাম "তৃপ্তি"। এতদ্রূপে চারি প্রকার মাত্র আধ্যাত্মিকা তুষ্টি আছে; ইহা বলা হইল। এতদ্ভিন্ন আরও তাঁহাদিগের বাহিক তুষ্টি আছে, তাহা অর্থের অর্জ্জন দোষ, রক্ষন দোষ, ভোগ দোষ ও হিংসা প্রভৃতি দোষ দর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থ উপার্জ্জনের অনেক দোষ আছে। তাহা দেখিয়া অনেকেই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হন। এই এক প্রকার তুষ্টি, ইহার শাস্ত্রীয় নাম পরা, তত্ত্বজ্ঞান না থাকায় ঐরূপ তুষ্টিতে মুক্তি হয় না। ধন থাকিলে তাহা রাজা, তস্কর, অগ্নি ও জলাদি হইতে নাশ প্রাপ্ত হয়, এজন্য উহা বিশেষ দুঃখপ্রদ, যাহা দুঃখপ্রদ তাহাতে কাজ নাই, এইরূপ ভাবিয়াও অনেকে বিষয় হইতে উপরত হন, ও পরিতুষ্ট থাকেন। এই দ্বিতীয় প্রকার তুষ্টির নাম সুপার, ইহাতেও মোক্ষ নাই। বহু আয়াস স্বীকার করিলে ধন উপার্জ্জিত হয়, কিন্তু তাহা ক্ষণভোগেই ফুরাইয়া যায়! অতএব তাহা আদৌ উপার্জ্জন না করাই ভাল। এই ভাবিয়া যাঁহারা বিষয়বিমুখ হন, হইয়া পরিতুষ্ট থাকেন, তাঁহাদের সেই তৃতীয় প্রকার তুষ্টির নাম পরা। বিষয়ভোগ যতই করিবে ততই তাহার ইচ্ছা বাড়িবে, ইচ্ছাকালে তাহা না পাইলে দুঃখ হইবে, অতএব,

ভোগস্পৃহা ত্যাগ করাই ভাল, এরূপ ভাবিয়া যাঁহারা বিষয় হইতে উপরত হন, তাঁহাদের সেই চতুর্থ প্রকার তুষ্টির নাম উত্তমা। এইরূপ তুষ্টিই উত্তম; মোক্ষের প্রকৃত সহায়। এইরূপেই নয় প্রকার তুষ্টির ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

সপ্তদশ ব্যাখ্যান।

যথা পক্ষীচয়, বৃক্ষের আশ্রয়, পাইয়া সুখেতে রয়।
ঈশ্বরে তেমন, থাকে জগজন, তিনি হন সর্ব্বাশ্রয়॥
এ সুন্দর বিশ্ব রচনা যাঁহার।
মহিমা তাঁহার অসীম অপার॥
তাঁহার মহিমা গগনে গগনে।
ঘোষে কত চন্দ্র তারক তপনে॥
তাঁহার মহিমা নিশির শিশিরে।
তুষার মণ্ডিত হিমাচল শিরে॥
ভূধর নীরবে তাঁহারে ধেয়ায়।
সাগর কল্লোলি তাঁর গুণ গায়॥
তাঁর নাম গায় বিহঙ্গ নিচয়।
বরষার ধারা তাঁর দয়া কয়॥
হরিত-বসনা ধরা মনোহরা।
তাঁর প্রেম রূপ কত ফুলে ভরা॥
হে মানব! যাঁর সকল ভুবন।
তার স্বরে নাম করে অনুক্ষণ॥
কি সম্বন্ধ তব হয় তাঁর সনে।
কে তিনি তোমার ভেবে দেখ মনে॥
তিনি পিতা মাতা প্রভু বন্ধু হ'ন।
প্রেম-শান্তি-দাতা অভয় শরণ॥
হেন পিতা নাই যে তাঁর সদনে।
ডরে যেতে কাছে পুত্র কন্যাগণে॥
তাঁর সিংহাসন নহে হেন স্থানে।
যাইতে পারে না কেহ সেই খানে॥
যে তাঁরে হৃদয়ে পাতি সিংহাসন।
সকাতরে তথা করে আবাহন॥
তিনি আসি তথি দিয়া দরশন।
শোক তাপ তার করেন মোচন॥
দরিদ্রে দেখিয়া দেন সেই ধন।
যে ধন সকল দুঃখ নিবারণ॥
যে ধন পাইলে সব দেওয়া যায়।
আর সব তুচ্ছ যার তুলনায়॥
কি হয় সে ধন?—তাঁর সহবাস।
তাঁতে রতি মতি হৃদয়-উচ্ছ্বাস।
ভক্ত তাঁরে যবে হৃদি ধামে পায়।
ইহ স্বর্গ ভোগ কিছু নাহি চায়॥
তাঁর নাম গান—তাঁহার স্মরণে,
প্রেমানন্দে তাঁর ভজন সাধনে,
ভক্ত সদা থাকে তাঁহারে লইয়া।
তিনিও তাহার নিকটে থাকিয়া,
দেন কত আশা কত ধর্ম্ম-বল।
মুছেন তাহার শোকাশ্রু সকল॥
নব প্রেমে তার রসান হৃদয়।
স্বর্গ মুক্তি তার এই খানে হয়॥

অনাদি পুরুষ যিনি ঈশ্বর মহান্!
সৃষ্টির পূরব হ'তে তিনি বিদ্যমান।
নাহি ছিল সৃষ্টি যবে, কেবল চৌদিকে তবে,
অন্ধকার ঘন এক ছিল শয়মান॥

গ্রহ তারা চন্দ্র কিবা নক্ষত্র-তপন।
এ সকল কিছু নাহি আছিল তখন।
সকল কারণ যিনি, বিরাজিত তবে তিনি,
স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন আদি পুরাতন॥

ইচ্ছা হ'ল তাঁর বিশ্ব করিতে সৃজন।
অমনি হইল এই অদ্ভুত ভুবন।
হ'য়ে তাঁর ইচ্ছা হ'তে, রহে তাঁর ইচ্ছামতে,
তিনি ইচ্ছা করি ইহা করেন ধারণ॥

তাঁর ইচ্ছা এখনও আছে প্রবাহিত।
চরাচর হইতেছে তাঁ হতে চালিত।
সে ইচ্ছায় অগ্নি জ্বলে, গ্রহ নিজ পথে চলে,
রবি শশী কর দিতে হ'তেছে উদিত॥

বীজ হ'তে ধান্য যথা সহজেই হয়।
সেরূপ তাঁ হতে বিশ্ব প্রকাশিত নয়।

বদ্ধ লতিক তিনি নন, প্রেম ইচ্ছা পূর্ণ হন,
করিলেন আপন ইচ্ছার সমুদয় ॥

অসংখ্য প্রাণিরে তিনি করিয়া সৃজন।
তাহাদের অন্ন পান করেন যোজন।
কি কীটাণু কি মাতঙ্গ, প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গ
করিছেন কি কৌশলে সুখের সাধন ॥

হে মানব! আপনারে দান করিবারে।
যে জন ডাকেন তোমা, ভাব তুমি তাঁরে।
কর তাঁর নাম গান, তাঁর প্রেম-সুধা পান,
এখনো ভজহ তাঁরে, "শেষে ক'বে কারে ॥"

ক্রমশঃ

ব্রহ্মস্তুতি।

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব
আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুবউদীরিতকালবেগ-
ধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে।

মুনিরা তোমার প্রভাব কীর্ত্তন করেন, তুমি জগতের আত্মা ও আত্মদ, এই জন্য যে সমস্ত দেবতা তোমার ভ্রূভঙ্গীতে চালিত কালের বেগে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আছেন আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বরণ করিয়াছি।

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যোনাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যোহ্যাত্মবঞ্চকঃ।

যে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ তোমার প্রসাদলব্ধ এই মনুষ্য লোক অধিকার করিয়া তোমার চরণ সেবা না করিল সেই আত্মবঞ্চক শোচনীয়।

যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরং
বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্।

তুমি আত্মা প্রিয় ঈশ্বর। যে মনুষ্য অনীশ্বর ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য তোমাকে ত্যাগ করে সে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ পান করিয়া থাকে।

তং ত্বাং জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং
সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবং।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং
ভবাপবর্গায় ভজাম দেব।

হে দেব তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশের হেতু। তুমি সর্ব্বত্র সম প্রশান্ত সুহৃৎ ও আত্মদেব। তুমি অদ্বিতীয় ও এক। তুমি জগতের ও আত্মার নিকেতন। আমি তোমাকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তির নিমিত্ত ভজনা করি।

মহারাষ্ট্রীয় ভজন।

উষাকালে উঠিয়া প্রভুকে স্মর প্রেম ভাবে। (প্রভুকে)
আত্ম সমর্পণ করিলে তাঁকে শান্তি লাভ করিবে ॥
রাত্তে শয়নে রক্ষা পাইয়া, সুখে ঘুমিয়াছিলে। (তোমরা)
প্রভাতকালে তাঁহার মহিমা জ্যোতিকে দেখিলে ॥
পূর্ব্বদিকে হইয়া রাঙা, সূর্য্য নভোমণ্ডলে। (রাঙা)
মস্তক উত্থিত করিয়া তমঃ শত্রুকে তাড়াইলে ॥
এ অদ্ভুত ভাব ভাবিয়া তোমরা অবাক্ যে হইলে। (তোমরা)
আত্ম সমর্পণ করিলে তাঁকে শান্তি লাভ করিবে ॥ ১ ॥
দয়াময় সব দিন তোমাদের করুন প্রতিপালন। (তোমাদের)
সুবুদ্ধি দেউন যাতে সুস্থির থাকে প্রাণ দেহ মন ॥
হো'ক তোমাদের হাতে সর্ব্বদা পুণ্য কর্ম্ম আচরণ। (সর্ব্বদা)
দান অহিংসা সত্য প্রবাহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ॥
তজ্জন্য তোমরা সবে প্রভাতে প্রার্থনা করিবে। (প্রভাতে)
আত্ম সমর্পণ করিলে তাঁকে শান্তিলাভ করিবে ॥ ২ ॥

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। প্রথম খণ্ড শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

২। প্রকৃতি-চর্চ্চা। শ্রীউমাপদ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩। তত্ত্বসার। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ পরম হংসের উপদেশ অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, এফ, সি, এস, কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

৪। বেদান্তদর্শন। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক ব্যখ্যাকৃত ও প্রকাশিত।

৫। হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত

৬। সঙ্গীত পুষ্পাপাদপ। শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ড প্রণীত।
৭। হিন্দু শাস্ত্র। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষাল কর্তৃক সঙ্কলিত।
Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LIV. Part 1. No 11. 1883.
Proceedings of the Asiatic Society of Bengal No 111. March 1885.
No 1V. April „
No V. May „
Theosophist July 1885.
Interpreter July 1885.
Indian Agricultural Gazette No 11 31 May 1885.

নবজীবন	আষাঢ়
প্রচার	ঐ
ভারতী	ঐ
বালক	ঐ
ধর্ম্মপ্রচারক	ঐ
আর্য্যদর্শন	জ্যৈষ্ঠ
নব্য ভারত	জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়
বামাবোধিনী পত্রিকা	জ্যৈষ্ঠ
ধর্ম্মবন্ধু	আষাঢ়
কৃষি গেজেট ২য় সংখ্যা	
ব্রাহ্মণ ২য় খণ্ড ৬।৭।৮ সংখ্যা	
আলোচনা	চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

আয় ব্যয়।

চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫ এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২১৮৮‖/৯
পূর্ব্বকার স্থিত	২৬৮৩।/৬
সমষ্টি	৪৮৭১৷৵৩
ব্যয়	১৯৮২ ‖ ৯
স্থিত	২৮৮৯।৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৭৭।৵৩
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
„ যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
„ শিবচন্দ্র নন্দী	১০৲
শ্রীযুক্ত মতিলাল মল্লিক	৪৲
„ বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	২৲
„ ভুবনেশচন্দ্র বসু	২৲
„ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	‖০
নব বর্ষের দান।	
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
„ নিত্যগোপাল বসু	৫৲
শ্রীমতী দীপময়ী দেবী	২৲
শ্রীযুক্ত রসিকলাল পাইন	২৲
„ শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
„ বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
„ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
„ প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১৲
„ ব্রজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি	১৲
„ রাজেন্দ্রনাথ শেঠ	১৲
„ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী	‖০
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	‖০
„ কাশীনাথ মজুমদার	।০
অল্প দানের সমষ্টি	৵৩
শুভকর্ম্মের দান।	
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	১৲
দানাধারে দান প্রাপ্ত।	৩।/০
	৭৭।৵৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৭২‖৵০
পুস্তকালয় ...	১০৩‖/৩
যন্ত্রালয় ..	১৫৩৭‖/০
গচ্ছিত	৩৬৸৵৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৩।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	১৩৫৲
দাতব্য	১১২৲
সমষ্টি	২১৮৮‖/৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৭০৮/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	৫৭৫। ৬
পুস্তকালয়	১৫৯‖৵৬
যন্ত্রালয়	৫৫০।৵৩
গচ্ছিত	৯৪‖০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	১৩৭৲
দাতব্য	৯৩৲
সমষ্টি	১৯৮২‖ ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫০৪ সংখ্যা · ভাদ্র ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ · ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ শ্রাবণ রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

জ্ঞান দ্বারা, হৃদয় দ্বারা, আত্মা দ্বারা, সমুদায় অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান করা, হৃদয়ের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করা এবং আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত মঙ্গলকার্য্য সাধন করা, তিনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রথম জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান করা। ধ্যানই আত্মার চক্ষু। আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা পরমাত্মাকে ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" তিনি সত্য-স্বরূপ অর্থাৎ সকল সত্যের মূল-সত্য। যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহাই সত্য—সুতরাং সত্যের মূল জ্ঞানেতেই অন্বেষিতব্য। বিকল-সকল জ্ঞানেতে প্রকাশ পায় বলিয়া তাহারা যদি সত্য নামের যোগ্য হইল, তবে স্বয়ং জ্ঞান কত না সত্য। আমার জ্ঞান না থাকিলে আমার নিকট সত্য কিছুই থাকিতে পারে না—মূলে জ্ঞান না থাকিলে কাহারো নিকটে কোন সত্যই থাকিতে পারে না; অতএব যিনি মূল-সত্য তিনি জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি জড়জগতের ন্যায় সত্যের প্রতিরূপ নহেন—তিনি সত্যের স্বরূপ,—জগতের প্রকাশ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হ'ন না—তাঁহারই প্রকাশ দ্বারা সমস্ত জগৎ অনুপ্রকাশিত হইতেছে,—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ তাঁহারই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইতেছে, তাঁহারই প্রকাশেই সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে।" জগতের ন্যায় তিনি ছায়া-সত্য নহেন—তিনি জ্ঞান-পূর্ণ প্রেম-পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মূল সত্য—তিনি জাগ্রত জীবন্ত পরমাত্মা। জগতের মূলে একমাত্র তিনিই কেবল বর্ত্তমান তদ্ভিন্ন এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই যাহা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন ক-

[illegible] বা বিচলিত করিতে পারে—[illegible] অপরিচ্ছিন্ন কালে অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম। এই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যখন আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রকাশিত হ'ন—তখন সর্ব্বাঙ্গীন সত্তা অবলোকন করিয়া আমাদের জ্ঞান পরম চরিতার্থতা লাভ করে।

দ্বিতীয়, হৃদয় দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করা। জ্ঞান না থাকিলে যেমন কোন সত্তাই থাকিতে পারে না, প্রাণ না থাকিলে সেই রূপ কোন সৌন্দর্য্যই থাকিতে পারে না। প্রাণ যাহা চায় তাহাই সুন্দর। প্রাণ চায়—প্রাণের আবির্ভাব,—তাহাই সুন্দর,—জীবন্ত সত্যই সুন্দর। প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। ইনি প্রাণ-স্বরূপ যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আমরা কেবল জ্ঞানের কথা শুনিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারি না—প্রাণের কথা শুনিলে তবে আমাদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। যিনি প্রাণের সহিত সম্পর্কশূন্য শুষ্ক জ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁহার সে জ্ঞান অঙ্গহীন—তাহাতে সত্যের কেবল একদিক্ প্রকাশ পায়, আর এক দিক্ প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে;—এইরূপ প্রাণশূন্য জ্ঞানের অনুশীলন হইতেই নিরীশ্বর বিজ্ঞান-শাস্ত্রসকল জন্ম গ্রহণ করে,—তাহাদের মস্তকই তাহাদের শরীরের অর্দ্ধভাগ—হৃদয়ের স্থান অল্প। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "প্রিয়মুপাসীত"—পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। "স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হ'ন না। আমাদের পূর্ব্বতন [illegible] প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন বলিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [illegible] সেইরূপ বলিয়াছেন "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি" যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে তাঁহারা উদাসীনের ন্যায় দেখিতেন না। তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত প্রীতি করিতেন; তাঁহারা বলিয়াছেন "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ, প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।" এত জোরের কথা কখনই মুখের কথা নহে—মুখের কথাও নহে—শুধু কেবল মনের কথাও নহে—অভিলাষ মাত্র নহে,—ইহা প্রাণের কথা। প্রাণ যাহা চায় তাহাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু, আমাদের প্রাণ যেখানে অবাধে স্ফূর্ত্তি পায় তাহাই আমাদের আনন্দের আলয়। আমাদের শারীরিক প্রাণ যেমন আপনার স্ফূর্ত্তির জন্য বিষয়ক্ষেত্র চায়, আমাদের আধ্যাত্মিক প্রাণ সেইরূপ আনন্দ-স্বরূপ অমৃত-স্বরূপ পরমাত্মাকে চায়। শারীরিক প্রাণক্রিয়া অন্ধ-প্রকৃতি, আত্মার প্রাণ-ক্রিয়া চিন্ময় আনন্দ; কোন নশ্বর বস্তুই সে আনন্দকে কুলাইয়া উঠিতে পারে না,—তাহার জীবিকা যোগাইতে পারে না, সে আনন্দ চায় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি" তাহা ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি মানে না। জড় জগতের সৌন্দর্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয় সমস্তে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে আমাদের আত্মাতে প্রাণের [illegible]—আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয়। [illegible] মহান্ পুরুষকে ধ্যান করিয়া [illegible] [illegible] করিলে আত্মা [illegible]

প্রশান্ত আনন্দ-রস উপভোগ করে, তাহা সাক্ষাৎ প্রাণ-স্বরূপ অমৃত স্বরূপ,—তাহাতে মৃত্যুর সংস্পর্শ মাত্র নাই।

তৃতীয়, আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া মঙ্গল-কার্য্য সাধন করা। পরমেশ্বর স্বয়ং যেমন সকল মঙ্গলের পরম মঙ্গল, তাঁহার কার্য্য সেইরূপ সকল মঙ্গল-কার্য্যের পরম আদর্শ। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রশান্ত অক্ষুব্ধ এবং অতন্দ্রিত ভাবে সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন; শান্তং শিবং অদ্বৈতং তিনি শান্ত মঙ্গল এবং অদ্বিতীয়। এই মহান আদর্শকে চক্ষে রাখিয়া আমরা যেন স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। প্রথমতঃ মনকে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে প্রশান্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রশান্ত হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; এইরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য—যেন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের এক আত্মাই আমাদের সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় মূল-প্রবর্ত্তক, সমস্ত ইন্দ্রিয় একমাত্র আত্মারই আজ্ঞাবহ ভৃত্য। এইরূপে জ্ঞান দ্বারা হৃদয় দ্বারা ও সমস্ত আত্মা দ্বারা আমরা যদি ঈশ্বরের উপাসনাতে দিন দিন নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে কালের রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা কালের হস্ত এড়াইতে পারি—এবং ঈশ্বরের আনন্দময় সহবাসে ইহ জীবনেই মুক্তির অমৃত নিকেতনে বিচরণ করিতে পারি।

হে পরমাত্মন্! আমাদের মোহ-অন্ধকারে তোমার জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ কর, আমাদের ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার প্রেমামৃত বর্ষণ কর, আমাদের আত্মাতে তোমার অপরাজিত শক্তি সঞ্চারিত কর। যাহাতে আমরা সংসারের সমুদায় মোহ-শোক ভয় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তোমার আনন্দময় সহবাসে কৃত-কৃতার্থ হইতে পারি—তুমি আমাদের আত্মাতে সেইরূপ মধুময় প্রাণের সঞ্চার কর এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সমালোচনা।

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের নব্য ভারতে পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর লিখিত "ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ" এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পক্ষপাতীদিগকে কিরূপে নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতা পথে ফিরাইয়া আনিতে হয়, তাহা শাস্ত্রী-মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধটিতে সুন্দর-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির দুই স্থান একটু অসাবধানে লিখিত হইয়াছে—তাহা আমরা পরে দেখাইব; কিন্তু সাকল্যে—প্রবন্ধটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই (বিশেষতঃ ইংরাজি বিজ্ঞান-প্রিয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের) সুপাঠ্য সুফল-প্রদ ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, ইহাতে আর সংশয়-মাত্র নাই। প্রবন্ধটির ভাষা এবং ভাব উভয়ই নির্ম্মল নির্ঝরিণীর ন্যায় এমনি সহজ-ভাবে হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়া চলিয়াছে যে, তাহাতে সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই মন সদা ঈশ্বরাভিমুখে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। এই প্রবন্ধটির জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি এবং আশা করি—মধ্যে মধ্যে তিনি এইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক এবং প্রেমামৃত বর্ষণে দেশীয় জন-সাধারণের মনঃ-প্রাণ শীতল করিয়া আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির সার্থক্য সম্পাদন করিতে থাকেন।

যে দুই স্থানের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপর আমাদের আপত্তি

শুধু এই যে, তাহার যুক্তি-প্রণালী তেমন পাকা হয় নাই—নচেৎ তাহার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যের সহিত আমাদের মতের কোন অনৈক্য নাই।

প্রথম;—শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের দেশের ন্যায়-শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া যুক্তি দ্বারা এইটি সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে

"কার্য্যের গুণ সকল কারণের গুণাবলীর অনুযায়ী হইয়া থাকে।"

এবং সেই দুর্ব্বল যুক্তিটির স্কন্ধে তিনি এই গুরুতর সিদ্ধান্তের প্রমাণের ভার চাপাইয়াছেন যে, জগৎ কার্য্যে যখন জ্ঞান পদার্থের সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জগৎকারণেও জ্ঞানের সত্ত্বা আছে। কিয়ৎপরে তিনি আপনিই প্রতিপক্ষের হইয়া এই এক তর্ক তুলিয়াছেন যে,

"চূণ ও হরিদ্রা এই উভয়ের কেহই লোহিত বর্ণবিশিষ্ট নহে, অথচ উভয়ের সংযোগে রক্তবর্ণের আবির্ভাব হয়। অথবা দশখানি দ্রব্য মিশাইয়া ঔষধ প্রস্তুত হইল, তাহাদের কোন একটির বিরেচন-শক্তি নাই, কিন্তু দশখানি মিলিত হইলে বিরেচন-শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যেমন দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যে এমন গুণের আবির্ভাব হইতেছে যাহা কারণীভূত পদার্থনিচয়ের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না; সেইরূপ ইহাও বলা যায় যে, চৈতন্য এই দেহের নিদানভূত পদার্থসকলের মধ্যে কোন একটিতে ব্যষ্টিভাবে না থাকিয়াও সমষ্টিভাবে তাহাদের সংযোগসিদ্ধ দেহপিণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে।"

শাস্ত্রী মহাশয় এই তর্কের খণ্ডন-ছলে বলিয়াছেন যে,

"ইহা উপমা মাত্র হইল, প্রমাণ হইল না।"

তাঁহার এ কথা আমাদের মনে ধারণা হইতেছে না।—শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, কোন কার্য্যেই এমন কোন গুণ থাকিতে পারে না, যাহা তাহার কারণে নাই; তাঁহার প্রতিপক্ষ বলিতেছে যে, এমন অনেক কার্য্য আছে যাহার গুণ তাহার কারণে নাই; শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন আচ্ছা—এমন একটা কোন কার্য্যের একটা-কোন গুণ আমাকে দেখাও যাহা তাহার কারণে নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ অমনি চূর্ণে হলুদে মিশাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধারণ-পূর্ব্বক বলিতেছে—"দেখিতে চাও—এই দেখ!" ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ—প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি আছে? শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রমেয় বিষয়টি আর একরূপে প্রমাণ করিলেই ভাল হইত,—তিনি বলিতে পারিতেন,—

কার্য্যের গুণ কারণের গুণ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যের সত্তা কারণের সত্তা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। মনে কর চূণ এবং হরিদ্রা এই দুই বস্তু মিলিয়া-মিশিয়া একটি লোহিত বর্ণ দ্রব্যে পরিণত হইল; মিশ্র বস্তুটির সেই-যে লোহিত বর্ণ তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইটি মূল বস্তুর দুইটি বর্ণ হইতে অন্য—তাহা তৃতীয় একটি বর্ণ; কিন্তু ঐ দুই মূল বস্তুর যে দুই সত্তা, তাহার অতিরিক্ত কোন সত্তাই মিশ্র বস্তুটিতে থাকিতে পারে না।—তৃতীয় বর্ণের ন্যায় তৃতীয় সত্তা থাকিতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের গুণ যদিও এমন হইতে পারে যাহা কারণে নাই, কিন্তু তা' বলিয়া কার্য্যের সত্তা এমন হইতে পারে না—যাহা কারণে নাই। এই যুক্তিতে পাওয়া যায় যে, মূল কারণে যদি চেতন-পদার্থের সত্তা না থাকিত, তবে জগতে তাহা কোন প্রকারেই আসিতে পারিত না। এখানে এইটি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক যে, চেতন-পদার্থের সত্তা এবং জড়পদার্থের সত্তা দুয়ের মধ্যে একটি মূল-গত প্রভেদ আছে; সে প্রভেদ এই যে, চেতন পদার্থের সত্তা তাহার আপনার জন্য—চেতন পদার্থ আপনি আপনার সত্তা অনুভব করে,—জড়-পদার্থের সত্তা পরের জন্য—চেতন-পদার্থই জড়-পদার্থের সত্তা অনুভব করে; এক কথায়—চেতন-সত্তা আত্মগত,

জড়-সত্তা পরার্থিকী ; চেতন-সত্তা এবং জড়-সত্তার মধ্যে এইরূপ এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর উত্থাপিত রহিয়াছে। এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের সহজেই মীমাংসা হইতে পারে, যথা,—কার্য্যেতে যখন এমন কোন সত্তা-ই থাকিতে পারে না যাহা কারণেতে নাই, তখন ইহা মানিতেই হইবে যে, মূল কারণে চেতন-সত্তা বিদ্যমান থাকাতেই জগতে চেতন-সত্তা আবির্ভূত হইতে পারিতেছে। আর এক কথা এই যে, মনে কর যে জগতের কোথাও কোন-একটিও জীব নাই, তাহা হইলে জড়ের যত কিছু গুণ আছে সমস্তই গতি ও সংহতি (Solidity) এই দুই গুণে পর্য্যবসিত হয়. জড়-বস্তুর ঐ দুইটি গুণ ভিন্ন তাহাতে আর যে কোন গুণ লক্ষিত হয়, সমস্তই জীবের অস্তিত্ব সাপেক্ষ ;—কামানের বারুদে অগ্নি সংযুক্ত হইলে সেই বারুদের পরমাণুগণের মধ্যে যে-এক-প্রকার গতি উৎপন্ন হয়, তাহাই কেবল জীবের অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে না—তাহাই বিশুদ্ধ-রূপে জড়-গুণ, কিন্তু তদ্ভিন্ন শব্দাদি আর যে কোন গুণ আবির্ভূত হয় সমস্তই জীবের অস্তিত্ব-সাপেক্ষ ; —জগতের কোথাও যদি কোন জীব বর্ত্তমান না থাকে, তবে "শব্দ" বলিয়া একটা আবির্ভাব জগতের কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া যাবে না। ইহাতে এইটি প্রমাণ হইতেছে যে, চূণে হলুদে মিশ্রিত হইলে তদুৎপন্ন বস্তুটিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা মুখ্য-রূপে কেবল গতির পরিবর্ত্তন; চূণের আণব (Molecular) গতির সহিত হলুদের আণব গতি মিলিত হইয়া তৃতীয় একপ্রকার আণব গতি উৎপাদন করে,—অর্থাৎ বায়ুর বেগ এবং স্রোতের বেগ মিলিত হইয়া নৌকাতে যেমন তৃতীয় এক-প্রকার বেগ উৎপাদন করে,—সেইরূপ। জীব একটি সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেই উক্ত মিশ্র-বস্তুটির ঐ আণব গতি জীবের প্রাণে কার্য্য করিয়া তাহার চক্ষে রক্তবর্ণরূপী একটি অবভাস উৎপন্ন করে। সুতরাং ঐ যে অবভাস, উহা জীবাশ্রিত। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, জড়-বস্তু হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাতে এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে, জড় বস্তু হইতে জীবও উৎপন্ন হয়, কেননা জীব আগে আছে—তাই তাহাকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি পরে উৎপন্ন হয়, এরূপ নহে যে, আগে শব্দাদি উৎপন্ন হয়—তাহার পরে জীব উৎপন্ন হয়। এক দিকে জীব আর এক দিকে জড়—শব্দাদি গুণ-সমূহ দুয়ের মধ্যস্থলে ; শব্দাদি গুণ সম্বন্ধে জড়বস্তুর যত নিকট-বর্ত্তী, জীব তাহা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী; —জড়-বস্তু যখন জীবের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই নিকট-বর্ত্তী গুণ-গুলিই স্বতঃ উৎপাদন করিতে পারে না, তখন দূরবর্ত্তী জীব উৎপাদন করা তাহার পক্ষে কত যে দূরে হাত বাড়ানো—কত যে অনধিকার চর্চ্চা—কত যে অন্যায় ব্যাপার,—তাহা পাঠক-বর্গ বুঝিতেই পারেন। অতএব, শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া চলিলে, তাঁহার মন্তব্য কথা তিনি অকাট্যরূপে সংস্থাপন করিতে পারিতেন।

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় আর-একটি অপক্ব সিদ্ধান্ত যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন,—সে সিদ্ধান্তের মূলে যে, একটি দারুণ দোষ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা তিনি দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন

"যে ব্যক্তি কখনো দেখে নাই যে, শক্তি হইতে গতির উৎপত্তি হয়, সে কি ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন শীল ঘটনা-রাজি দেখিয়া শক্তির অনুমান করিতে পারে ?"

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, শক্তি হইতে গতির উৎপত্তি কেহই দেখে নাই—দেখিতে পারেও না ; আমরা যাহা দেখি

তাহা এইমাত্র যে, দিন যেমন রাত্রির নিয়ত পরবর্ত্তী, হস্ত-চালনা সেইরূপ বল-প্রয়োগের নিয়ত পরবর্ত্তী;—বল-প্রয়োগের চেষ্টা-টি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়ে অনুভব করি, হস্ত-চালনা-টি আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অবলোকন করি, কিন্তু কার্য্য-কারণের বন্ধন-সূত্রটি আমরা বহিরিন্দ্রিয়েও উপলব্ধি করি না, অন্তরিন্দ্রিয়েও উপলব্ধি করি না,—অথচ আত্মপ্রত্যয়ে ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি। মনে কর একটা কবাটকে এই দেখিলাম স্থির রহিয়াছে, ক্ষণ পরে দেখি তাহা বিচলিত হইয়াছে;—তাহার অবশ্যই কোন না কোন কারণ আছে—এইটি প্রথম প্রস্তাব; তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিকট-বর্ত্তী কোন-একটি ঘটনাই তাহার কারণ—এইটি দ্বিতীয় প্রস্তাব; কবাটখানির গতির অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং কবাটের অব্যবহিত নিকটে বায়ু সহসা বেগে বহিয়াছিল—অতএব তাহাই তাহার কারণ—এইটি চরম সিদ্ধান্ত। হস্ত-চালনা-ব্যাপার টিরও কারণ-নির্দ্ধারণ ঐরূপ পদ্ধতিতে হইয়া থাকে,—উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, বায়ু-বেগ স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচর—প্রযত্ন-বেগ অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর, কিন্তু উভয়ত্রই কার্য্য-কারণের সম্বন্ধটি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহে—তাহা শুদ্ধ কেবল আত্মপ্রত্যয়েরই গোচর। আমার হস্ত বিচলিত হইল—ইহার অবশ্যই কোন-না-কোন কারণ আছে—এইটি প্রথম প্রস্তাব; তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী কোন একটি ঘটনাই তাহার কারণ, এইটি দ্বিতীয় প্রস্তাব; হস্ত-চালনার চেষ্টাই তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী ঘটনা, অতএব তাহাই তাহার কারণ, এইটি চরম সিদ্ধান্ত। আপনার হস্ত-চালনাই দেখি, আর একটা কবাটের সহসা বিচলিত হওয়াই দেখি—তাহা দেখিবামাত্রই, কোন পরীক্ষার অপেক্ষা না রাখিয়া—তৎক্ষণাৎ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলি যে, ঐ ঘটনাটি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন ঘটনার সহিত কার্য্য-কারণ সূত্রে সম্বদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী দুইটি ঘটনা আমরা উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি—কিন্তু সহস্র পরীক্ষা করিলেও কার্য্য-কারণের বন্ধন-সূত্র উভয়ের কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাইব না; তাই আমরা বলি যে, তাহা বহিরিন্দ্রিয়-মূলক এবং অন্তরিন্দ্রিয়-মূলক উভয়-বিধ পরীক্ষারই অগম্য—শুদ্ধ কেবল আত্ম-প্রত্যয়েরই গম্য। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটির সার্ব্বভৌমিকতা স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কালের মুহূর্ত্ত-পরম্পরার প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহাতে সহজে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারিবে। কালের কোন একটি মুহূর্ত্তই যেমন পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত হইতে যোগচ্যুত অথবা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইতে পারে না, সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন-ঘটনাই এমন হইতে পারে না, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন-না-কোন ঘটনার সহিত কার্য্য-কারণ-সূত্রে সম্বদ্ধ নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—কালের শ্রেণীবদ্ধ মুহূর্ত্ত-পরম্পরায় আমরা কেবল প্রবৃত্ত কারণেরই ছবি দেখিতে পাই, স্বাধীন কারণের বা মূল-প্রবর্ত্তক কারণের—ছবি দেখিতে পাই না। শাস্ত্রী মহাশয়ের উচিত ছিল এইরূপ বলা যে, আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন কোন ভৌতিক শক্তিতেই মূল-প্রবর্ত্তকের ভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না;—ভৌতিক কারণ মাত্রই কালের অন্তঃপাতী প্রবৃত্ত কারণ; যথা—তরঙ্গের কারণ কি? না বায়ু-বেগ; তাহার কারণ কি? না পৃথিবীর গতি ও তাপ-বৈষম্য; তাহার কারণ কি? না আকর্ষণ বিকর্ষণ ও ঘনত্বাদির বৈষম্য; তাহার কারণ কি?

ইহার উত্তর দিতে হইলে জ্যোতিষ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, আরও কত না বিদ্যা আয়ত্ত করা আবশ্যক,—অথচ তাহার যে, একটা-না-একটা কারণ আছেই আছে এবিষয়ে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না,—এই রূপ কার্য্য-কারণের সূত্র ধরিয়া আরোহ-পদ্ধতি অনুসারে যে কোন ভৌতিক কারণে উত্তীর্ণ হও না কেন—দেখিবে যে, তাহা প্রবৃত্ত কারণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জড় বস্তুর সত্তা পরার্থিকী অর্থাৎ উঁহার সত্তা শুধু কেবল পরেরই জন্য,—চেতন বস্তুই উঁহার সত্তা অনুভব করিতে পারে ; এখন বলিতে চাই যে, জড়বস্তু পরের দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইয়া স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে না ; নিরুদ্যমতাই Inertia জড়বস্তুর মর্ম্ম-নিহিত ধর্ম্ম—তাহাই আদ্য ;—অদ্বিতীয় মূল কারণ দ্বিতীয় কোন কারণের বশবর্ত্তী নহেন সুতরাং তিনি স্বয়ং-প্রবর্ত্তক স্বাধীন কারণ ; তবেই হইল যে, তিনি নিরুদ্যম প্রবৃত্ত কারণ নহেন —প্রকৃতি নহেন—তিনি পরমাত্মা। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, মূল-প্রবর্ত্তকের ভাব আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই না—কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে গিয়া বলিয়াছেন এই যে, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-তত্ত্বটি আমরা আপন বল-চেষ্টার পরীক্ষা হইতেই উপার্জ্জন করিয়াছি। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ তত্ত্বকে আগন্তুক পরীক্ষা-সিদ্ধ তত্ত্বের গণ্ডীতে দাঁড় করাইয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই, তাহাতে তিনি আপনারই মূল শিথিল করিয়াছেন। তাহা না করিয়া তিনি যদি এইটি প্রমাণ করিতেন যে, মূল-প্রবর্ত্তকতা আত্মার্থিকী চেতন-সত্তারই ধর্ম্ম, এবং তাহা পরার্থিকী জড় সত্তার বিরোধী ধর্ম্ম, তাহা হইলেই তাঁহার কথার উপর আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারিত না। প্রবন্ধটির দুই স্থানের দুই দোষ যাহা আমাদের চক্ষে ঠেকিয়াছে তাহা দেখাইলাম ;—অবশিষ্ট সমস্ত অংশ নির্দোষ বলিলে অতি অল্পই বলা হয়—এক জন শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মের লেখনী হইতে যেমন-টি প্রত্যাশা করা যায় তাহা তাহার কোন অংশেই ন্যূন নহে। যে অংশ-গুলি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে যে এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি বিদ্যমান, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের সমুদায় সত্য যাঁহারা উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও স্বরূপকে যাঁহারা মানবের অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মহাশক্তির বিদ্যমানতা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের Nineteenth Century নামক মাসিক পত্রিকাতে হর্বার্ট স্পেন্সার এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহার উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"There is an Infinite and Eternal Energy from which every thing proceeds."

"অর্থ—জগত মধ্যে এক অনন্ত ও অবিনাশী শক্তি আছে, যাহা হইতে চরাচর বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে।" জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রণীত Three Essays on Religion নামক গ্রন্থে প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেনঃ -

"It would seem then that, in the only sense in which experience supports in any shape the doctrine of a First Cause—viz, as the primeval and universal element in all causes the First Cause can be no other than Force"—Mill's Essay on Theism.

অর্থ।—"কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, এবং কারণ শব্দের অর্থ আমরা যাহা বুঝিয়াছি, অর্থাৎ সমুদায় কারণের আদি ও সর্ব্বব্যাপী কারণ রূপে যাহা বিদ্যমান; সেই অর্থে, শক্তি ভিন্ন আর কিছুকেই কারণ বলিতে পারা যায় না।"

উক্ত উভয় পণ্ডিতের মতেই এক অনির্ব্বচনীয় মহা-

শক্তি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল তাহারই মতে, এই আদ্যাশক্তি এক, অনন্ত ও অবিনাশী। প্রথম প্রশ্ন এই—এই শক্তি যে এক, তাহার প্রমাণ কি? কে বলিল, এই ব্রহ্মাণ্ড দুই বা তদবিধ শক্তির সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় নাই? ইহার উত্তর জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল উক্ত গ্রন্থে দিয়াছেন।

"The force itself is essentially one and the same; and there exists of it in nature a fixed quantity, which is never increased or diminished."

অর্থ—"এই শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আছে, যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।"

এই শক্তি এক ও অক্ষয় এবং ইহা হইতেই বিশ্বের সকল কার্য্য হইতেছে, সুতরাং ইহা সর্ব্বব্যাপী। তবে এই মহা পণ্ডিতদিগের সাহায্যে আমরা এইটুকু সত্যে উপনীত হইতেছি যে, বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান, যাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অবিনাশী ও অনন্ত।

কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতি কি? মিলের কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি এই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জড়শক্তি বলিয়া অনুভব করেন; যেমন তাড়িত বা ম্যাগ্‌নেটিজীম্, শক্তি বটে, কিন্তু অন্ধ জড়শক্তি মাত্র সেইরূপ এই আদি শক্তিও অন্ধ জড় শক্তি মাত্র। স্পেন্‌সার বলেন, এই শক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞেয়, অথচ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত মাসিক পত্রিকার পরবর্ত্তী এক সংখ্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে, মানব চৈতন্যে এই শক্তির প্রকাশ "It wells up in consciousness"—"এই শক্তি মানবের চিৎশক্তি মধ্যে উৎসারিত হইতেছে" আর ও একস্থানে বলিয়াছেন—"Some thing more than consciousness" অর্থাৎ চিৎশক্তি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এই শক্তি তাহা অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক।

এখন একবার বিচার করিতে হইবে যে, এই আদ্যাশক্তির বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু জানিতে পারা যায় কি না? স্পেনসারের যে উক্তিটী সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, চরাচর বিশ্ব এই মহাশক্তি হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই মহাশক্তি সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু ইহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তিল হইতে যেমন তৈল নিঃসৃত হয়, জল হইতে যেরূপ বাষ্প নিঃসৃত হয়, সেইরূপ জগৎ এই শক্তিরই বিবর্ত্তিত স্বরূপ মাত্র।

এখন প্রশ্ন এই, মানবের চিৎশক্তি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মানবাত্মা কি আশ্চর্য্য বস্তু! কি গভীর প্রহেলিকা! এই অদ্ভুত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন চৈতন্য কোথা হইতে সৃষ্টির রাজ্যে দেখা দিল? আবার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই জগতের অবস্থা এক কালে উষ্ণ বাষ্পাকার ছিল এবং তখন সেই উষ্ণ বাষ্পরাশির মধ্যে মানব চৈতন্য দূরে থাকুক, কোন প্রকার জীবাঙ্কুরেরও থাকা সম্ভব ছিল না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের এক স্থলে মিল বলিয়াছেন:—

"There is a vast amount of evidence that the state of our planet was once such as to be incompatible with animal life, and that human life is of very much more modern than animal life"—Essay on Theism.

অর্থ।—"ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থা এককালে এমন ছিল যে, ইহা কোন জীবের জীবন রক্ষার উপযোগী ছিল না, এবং মানব জীবন অপর জীবনের অনেক পরে উদ্ভূত হইয়াছে।"

Encyclopedea Britanica নামক গ্রন্থে সুবিখ্যাত Huxley হাক্সলি সাহেব (Biology) অর্থাৎ জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার একস্থানে বলিয়াছেন;—

"The condition of the globe was at one time such, that living matter could not have existed in it, life being entirely incompatible with the gaseous state."

অর্থ।—"পৃথিবীর অবস্থা এককালে এরূপ ছিল, তখন কোন জীবিত প্রাণীর ইহাতে বাস করা অসম্ভব ছিল; কারণ বাষ্পাবস্থায় ইহা কোন প্রকার জীবের স্থিতির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল।

তবেই দেখা হইতেছে, এই ধরণী এক কালে তরল উষ্ণ বাষ্পময় ও জীবন ধারণের অনুপযোগী ছিল, তখন ইহাতে বিচিত্র শক্তিময় মানবাত্মা দূরে থাকুক, জীবের জীবনও ছিল না। যেখানে জীবন ছিল না, জীবন আসিয়াছে; কোথা হইতে আসিয়াছে? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উত্তর—জীবন জড়েরই পরিণতি মাত্র; দ্বিতীয় উত্তর—ইহা কোন চেতনময় পুরুষ হইতে সংক্রান্ত। দেখা যাউক, প্রথম উত্তরটী কতদূর যুক্তিযুক্ত, ইহা গ্রহণযোগ্য হয় কি না? যদি বলা হয়, জড় হইতে জীবনের উৎপত্তি, তাহা হইলে এই কথা হইবে [illegible]

চেতনকে প্রসব করিয়াছে; ইহা কিরূপে হইল? পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে হাক্সলি (Huxley) বলিয়াছেন;—

"The properties of living matter distinguish it absolutely from all other kinds of things; and the present state of knowledge furnishes us with no link between the living and the not-living."

অর্থ।—"সজীব পদার্থের গুণাবলী তাহাকে অপর সমুদায় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার করিয়াছে; আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থাতে, কিরূপে যে জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইল, তাহা আমরা জানি না।"

উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন;—

"Of the causes which have led to the origination of living matter, it may be said, that we know absolutely nothing."

অর্থ।—"কি প্রণালীতে এ জগতে সজীব প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে এ মাত্র বলা যায় যে, আমরা কিছুই জানি না।"

উপনিষদ কহিয়াছেন, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"। ইহার শক্তি মহৎ ও বিচিত্র এবং জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া ইহার স্বাভাবিক।

শিশুর স্তন-পানরূপ ক্রিয়াটির বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখা যাউক। এ ক্রিয়াটি কেমন আশ্চর্য্য!!! এতদ্বারা একটা সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে অথচ সে বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান নাই, আবার কিরূপে সে ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহার উপদেশ নাই; অথচ সুচারুরূপে সেই ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হইতেছে। এই ক্রিয়াটী অন্যান্য ক্রিয়া হইতে কিরূপ বিভিন্ন! শিশুর জ্ঞান নাই, অভ্যাস নাই, শিক্ষা নাই, উপদেশ নাই, অথচ এমন একটী ক্রিয়া করিতেছে, যদ্দ্বারা একটি সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, সেই উদ্দেশ্য জ্ঞান ও সেই মঙ্গল অভিসন্ধি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই মহাশক্তিতেই আছে? মানব শিশুতে যেমন জ্ঞান নাই, অথচ আশ্চর্য্য জ্ঞান ক্রিয়া দৃষ্ট হইতেছে, পশু পক্ষীর ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করিলেও এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এমন সকল কার্য্য করে, যাহার তাৎপর্য্য তাহারা জানে না, এবং কোন বুদ্ধিমান জীব করিলে তাহার আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, অথচ জন্ম হইতে তাহাদের বিনা [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষিদিগের কুলায় নির্ম্মাণ, মধুমক্ষিকার মধু সঞ্চয় বোল্‌তা প্রভৃতির খাদ্যাহরণ কার্য্য এই শ্রেণীগণ্য। ভেকদিগের দেহ বিখণ্ডিত করিয়া এই সকল স্বাভাবিক ক্রিয়ার অনেক আশ্চর্য্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভেককে বিখণ্ডিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেই বিখণ্ডিত অবস্থায় মস্তক বিহীন শরীরার্দ্ধ যখন পড়িয়া আছে, তখন তাহার এক খানি পায়ে যদি এক বিন্দু এসিড্ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তখন আর এক খানি পা দিয়া সেই এসিড্ বিন্দু মুছিবার জন্য বার বার প্রয়াস পাইতে থাকে। এই ক্রিয়ার প্রকৃতি কি আশ্চর্য্য!! এ কার্য্যে যে তাহার কর্তৃত্ব নাই, তাহার প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখানেও দেখিতেছি, অজ্ঞতা সহকারে এমন একটা কার্য্য হইতেছে, যাহার মধ্যে একটী মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ কি বলিবেন? যে জ্ঞান ভেকে নাই অথচ কার্য্যে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান কোথায়? শুনুন এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ মিভার্ট এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? বিগত এপ্রিল মাসের Fortnightly Review পত্রিকাতে তিনি লিখিয়াছেন:—"for myself I am bound humbly to confess that the more I study nature, the more I am convinced that in the action of this all-pervading but inscrutable and unimaginable intelligence, of which self conscious human rationality is the utterly inadequate image attainable by us, is to be sought the possible explanation of the mysterious but undeniable presence in Nature of a rationality in that which is in itself irrational."

অর্থ।—"আমার কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার নিকট আমি বিনয় সহকারে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমি যতই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেছি, ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, সেই সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় পরম জ্ঞানকে—আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন মানবীয় জ্ঞান যাহার ছায়ামাত্র—অথচ (এই মানব জ্ঞান ভিন্ন সে জ্ঞানের অন্য প্রতিকৃতি আমাদের পাইবার উপায় নাই) স্বীকার না করিলে জড় প্রকৃতির মধ্যে বিচার বিহীন ও জ্ঞান বিবর্জ্জিত প্রাণীতে জ্ঞান ক্রিয়া দর্শন রূপ অত্যাশ্চর্য্য সমস্যার সদুত্তর হইবার উপায়ান্তর নাই।"

সেই আদ্যা শক্তি যে জ্ঞানশালিনী, আর একটী যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়—অঙ্গ সূক্ষ্মকৌশল

দর্শনে মনুষ্যের জ্ঞানের পরিচয়। এ বিষয়ে আমাদিগের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ও এই পত্রিকারই প্রবন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি যে সকল দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করিয়া পাঠকগণের সময় নষ্ট করিব না। তবে এ বিষয়ে দুই একটী বড় লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া নিবৃত্ত হইব। সুবিখ্যাত ডারুইন সাহেবের Fertilisation of Orchids নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন। সে ঘটনাটী এই ;—পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্য পুষ্পে আসে, তখন দেখা যায় যে পুষ্পের গঠনের মধ্যে এমন চাতুরী আছে যে, তাহারা সহসা মধুপান করিতে পারে না, মধু নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। ইত্যবসরে তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু গর্ভকেশরের সহিত মিলিয়া যায়। মধুপানে যে বিলম্ব হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া ডারুইন বলিয়াছেন ;—"If this is accidental, it is a fortunate accident for the plant. If this be not accidental, and I cannot believe it to be accidental, what a Singular case of adaptation !"

অর্থ।—"এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল তবে ইহা এমন আকস্মিক যাহা উক্ত পুষ্পের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি আকস্মিক না হয়—আমি ইহাকে আকস্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না—তাহা হইলে ইহাতে কি আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে !"

জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের এক স্থলে বলিয়াছেন ;—

"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge the adaptations in Nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence."

অর্থ।—"আমার বোধ হয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া, ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, জ্ঞানদ্বারাই এই সৃষ্টি হইয়াছে।"

একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই মানবদেহে চতুর্বিধ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। (১ম) ইচ্ছা প্রসূত ক্রিয়া, (২য়) স্বভাবজাত ক্রিয়া, (৩য়) অভ্যাসজাতক্রিয়া (৪র্থ) ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া।

(১ম) বিশেষ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান সহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা ইচ্ছাপ্রসূত ক্রিয়া—যেমন একটী প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ তুলিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করি। ইহাতে আমাদের সুখস্পৃহা উত্তেজক, জ্ঞান পথপ্রদর্শক, ও প্রবৃত্তি কার্য্যের পরিচালক।

(২য়) এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা মানব কখনও শিক্ষা করে নাই, কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ পায় নাই, অথচ বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য স্বভাবতই তাহা করে—তাহা স্বভাবজাত ক্রিয়া ; যথা, শিশুর স্তন পান। স্তন পানরূপ ক্রিয়াটীতে বিশেষ কৌশল আছে। যেরূপে টানিলে দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ করিয়া টানা এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর, অথচ শিশু জননীর গর্ভ হইতে পড়িয়া, বিনা শিক্ষায় ও বিনা উপদেশে সুন্দররূপে জননীর চুচুক মুখে লইয়া টানিয়া থাকে। ইহা পুষ্প চয়নার্থ হস্ত প্রসারণের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি বিচার পূর্ব্বক ক্রিয়া নয়, অথচ অন্যপ্রকার ক্রিয়ার ন্যায় ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়াও নয় ইহাতে ইচ্ছার যোগ আছে অথচ জ্ঞানের যোগ নাই।

(৩য়) আর এক প্রকার ক্রিয়া, যাহার মূলে এক সময়ে ইচ্ছা ও জ্ঞানের যোগ ছিল, কিন্তু অভ্যাস বশতঃ সে যোগ আর এখন লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। তাহা অভ্যাসজাত ক্রিয়া। যথা গমনার্থ পদবিক্ষেপ। আমরা গমনার্থ পদবিক্ষেপ করি, কিন্তু প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি আমাদের জ্ঞান থাকে যে, পদবিক্ষেপ করিতেছি, এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি ইচ্ছাকে বিদ্যমান দেখা যায় ? তাহা যায় না। আমাদের দৃষ্টি আকাশের নক্ষত্রে রহিয়াছে, আমাদের মন কোন নিগূঢ় প্রশ্নের সমস্যাতে বিরত রহিয়াছে, অথচ আমরা যাইতেছি, পদদ্বয় উঠিতেছে ও পড়িতেছে, গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। যেন কলে কার্য্য চলিতেছে। এক সময়ে মনের কর্ত্তৃত্ব ছিল, এক সময়ে মনকে ভাবিতে হইয়াছিল, কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কত ফিকির ফন্দী করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেই ক্রিয়া, কলের ক্রিয়ার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। একটী শিশু যখন প্রথম দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে চেষ্টা করে, সেই সময়ের বিষয় একবার চিন্তা কর ; তাহাকে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিয়া হাঁটিতে হয়, কিন্তু অভ্যাস বশত সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। এরূপ শুনাও গিয়াছে যে, কোন কোন লোক হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুমাইয়া থাকে।

(৪র্থ) যে শারীরিক ক্রিয়া আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, আমাদের যোগ অন্তু-

স্থির অবস্থাতেও চলিয়া থাকে, তাহা চতুর্থ শ্রেণী গণ্য। যথা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া, রক্তস্রোতের গতিবিধি ইত্যাদি। এ সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ ক্রিয়াতেই আমরা কর্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছার বিদ্যমানতা দেখিতেছি। শিশু সন্তানের স্তনপান স্থলে, যদিও সে ক্রিয়া অজ্ঞানকৃত ও স্বভাবপ্রণোদিত ক্রিয়া, তথাপি তন্মধ্যে শিশুর চেষ্টা সুতরাং তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তি আংশিকরূপে বিদ্যমান। সে মুখবিকাশ করিতেছে, হস্তদ্বয় প্রসারণ করিতেছে, স্তনদ্বয় ধরিতেছে, দুগ্ধ আকর্ষণ করিতেছে এ সকল তাহার কার্য্য, [illegible] এ সকলের অন্তরে তাহার ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য-[illegible] বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই রূপ অভ্যাসজনিত [illegible] হইতেছে, সেখানেও অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য-[illegible] বিদ্যমান। [illegible] কেমন করিয়া সেই [illegible] নিমগ্ন থাকিয়াও ঠিক পথ যাই-[illegible] আক্রম [illegible], [illegible] দেখিতেছে, যেখানে [illegible] এত-[illegible] নিমগ্ন [illegible] দর্শন, [illegible], বিচার [illegible] তাহার [illegible] কার্য্য করিতেছে। এমন কি, নিদ্রাবস্থাতেও [illegible] উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিদ্রাবস্থাতেও [illegible] ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যেও অতি প্রচ্ছন্নভাবে পথের জ্ঞান রহিয়াছে, [illegible] বিপদে পতিত হন না কেন? নিদ্রাবস্থাতে [illegible] দের এক প্রকার অস্ফুট জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহার [illegible] অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় যে, পরদিবসে উঠিয়া যদি কোন স্থানে গমন করিবার কথা থাকে এবং এক ব্যক্তি সেই [illegible] ও উৎকণ্ঠা লইয়া শয়ন করে, দেখিতে পাই, এক ঘুমের পর আপনা আপনি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হই-য়াছে। ইহা কিরূপে হইল? নিদ্রার মধ্যেও তাহার মনে যদি বিচার ও বোধ শক্তি না থাকিবে, তবে সে কিরূপে ঠিক সময়ে জাগিল? এক বার এক খানি জাহাজ সমুদ্রে যাইতেছিল। যখন রাত্রি ১১ টা তখন জাহাজ কাপ্তেন নিদ্রা গেলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার সময় [illegible] দ্বারা বুঝিলেন যে রাত্রি দুইটার পর জাহাজ খানি সমুদ্রের এক বিশেষ স্থানে উপস্থিত হইবে, সে সময়ে জাহাজের [illegible] ফিরাইয়া না দিলে একটা বিপদে [illegible]। ইহা দেখিয়া তিনি প্রহরী-দিগকে দুইটার সময় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া নিদ্রা গেলেন। ঘড়িতে ঠিক যখন দুইটা, প্রহরীগণ ডাকিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন শয্যাত্যাগ করিয়া [illegible] সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং দেখেন যে ঠিক দুইটা বাজিয়াছে কিন্তু জাহাজ আশাতীত বেগের সহিত আসিয়াছে, এবং আর দশ মিনিট কাল তিনি নিদ্রিত থাকিলে সেই বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই বিপদ হইতে জাহাজ খানি বাঁচিয়া গেল। এখানেও দেখা গেল যে, গভীর নিদ্রার মধ্যেও বিচার ও বোধ শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেছিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে ত্রিবিধ ক্রিয়াস্থলে আমরা ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্যপ্রবৃত্তির বিদ্যমানতা দেখিতেছি, কেবল যে সকল ক্রিয়াকে ইচ্ছার বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি, তন্মধ্যেই মানবের ক্রিয়েচ্ছা দেখা যাইতেছে না। অথচ তদুপরি মানবের কর্তৃত্ব শক্তি না থাকায় অতি গূঢ় শুভ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। [illegible] সকল ক্রিয়া [illegible] নিদ্রিত অবস্থাতেও [illegible] তাহার [illegible] হঠাৎ জীবননাশের সম্ভাবনা নাই। [illegible] কার্য্য মানবের ক্রিয়েচ্ছার অধীন রহিয়াছে, [illegible] এই [illegible] মানবদেহেই হইতেছে, এবং যাহা মানবের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ও যাহার [illegible] নিমেষ মধ্যে মানবের জীবননাশের সম্ভাবনা, সে সকলের উপরে মানবের কর্তৃত্ব নাই। তবে তদুপরি কাহার কর্তৃত্ব? ইহা কি মানবদেহের একটী আশ্চর্য্য [illegible] নহে। এই বন্দোবস্তের প্রতি [illegible] পূর্ণ নয়নে তাকাইয়া দেখিলে বিশ্বকারণে জ্ঞান, মঙ্গলভাব [illegible] ক্রিয়েচ্ছা তিনেরই কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না?

তৃতীয় দৃষ্টান্ত প্রসূতির প্রসব বেদনা। একজন দেহবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই পাঠক মহাশয় জানিতে পারিবেন যে, গর্ভিণীর যখন প্রসব কাল উপস্থিত হয়, তখন কিয়ৎ কাল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার বেদনা বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্রসব সময়ে গর্ভিণী গর্ভস্থ ভ্রূণদেহের নিষ্ক্রামণোপযোগী এক প্রকার বেগ দিতে থাকেন। তাহাকে কোঁতপাড়া বলে। সহজ শরীরে মলত্যাগাদির সময়ে কাহাকেও যদি সেইরূপ কোঁত পাড়িতে হয়, তাহাতে কত পরিশ্রম ও কত বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্যপ্রবৃত্তি যদি কোথাও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তবে উক্ত শ্রমজনক ক্রিয়ার মধ্যে। অথচ প্রসূতি যখন ঐরূপ কোঁত পাড়েন, তখন তদুপরি তাঁহার কর্তৃত্ব থাকে না। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কর্তৃত্ব শক্তি ও ক্রিয়েচ্ছার

বহির্গত। যদি তৎপূর্ব্বে তাহাকে ক্লোরোফারম করিয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে অচেতন করিয়া ফেলা যায়, তথাপি যথাকালে ঐ বেগ আপনি প্রকাশ পাইবে। এত বড় একটা বেগ ও বল প্রয়োগের কার্য্য হইতেছে, অথচ যে ব্যক্তি দ্বারা তাহা হইতেছে তাহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই, ইহাতে পাঠক মহাশয় কি বিবেচনা করেন? সে কার্য্য কাহার ইচ্ছামত হইতেছে? সেই বেদনায় সময় প্রসূতির উপরে উক্ত সন্তানোৎপাদন কার্য্য করিবার ভার রাখিলে বিঘ্ন ঘটিতে পারিত, এই জন্য বিশ্বকারণ আপনার হাতে যেন ভার রাখিয়াছেন, ইহা কি পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় না। ইহাও বিশ্বকারণের [illegible] ও মঙ্গল ভাব বিদ্যমান থাকার আর একটি প্রমাণ।

অতএব বিশ্বকারণের জ্ঞান আছে এবং ইচ্ছা (will) আছে। কেবল তাহা নহে, প্রীতিও আছে। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আইস একবার চিন্তা করিয়া দেখি, প্রীতির লক্ষণ প্রধান কি কি? আমি সুখী হইলে যে সুখী হয় এবং আমাকে সুখী করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই আমাকে প্রীতি করে। ইহা সত্য কি না? যদি দেখি আমার কিছু লাভ হইয়াছে বলিয়া জগতের অসংখ্য মানবের মধ্যে দশটী লোক আনন্দ করিতেছে, এবং সেই দশজন যাহাতে আমার আরও লাভ হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেছে তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই দশজন আমার মিত্র অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন। ইহা অতি সহজ কথা, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন পাঠক মহাশয় একটি [illegible] গোলাপ ফুল হস্তে লইয়া বিচার আরম্ভ করুন। যদি নিকটে গোলাপের বাগান থাকে, তবে বিশেষ অনুরোধ করি যে, ত্বরায় একটী গোলাপ তুলিয়া আনার পর প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আচ্ছা মনে করিলাম যেন, আপনার হস্তে একটী গোলাপ রহিয়াছে। ঐ গোলাপটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। উহার পাপড়াগুলি কেমন কোমল? উহার গন্ধ কেমন চিত্তের আনন্দদায়ক? উহার বর্ণ কেমন মনোমোহনকারী। এখন চিন্তা করুন, ঐ সুন্দর বর্ণ কেন ঐ পুষ্পে দেওয়া হইয়াছে? উহার সুগন্ধ সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় যে, তাহা না থাকিলে ভ্রমর উহার দিকে আকৃষ্ট হইত না * এবং ভৃঙ্গ না আসিলে পরাগ রেণু পড়িত না, কাজেই জন্মিত না। সুতরাং গন্ধের উদ্দেশ [illegible]। উহার বিচিত্র বর্ণ কেন দেওয়া হইল? সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবের নাম কি পাঠক মহাশয় করিতে পারেন, গোলাপের ঐ সুন্দর বর্ণ না থাকিলে, যাহার জীবন ধারণের ব্যাঘাত হইত? আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, পশু পক্ষীদিগের কাহারও প্রাণধারণ ঐ সুন্দর বর্ণের উপর নির্ভর করিতেছে না। উহার বর্ণ ওরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও সুন্দর না হইলে মধুলোভী ভৃঙ্গের আসিবার কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে উহাতে ওরূপ বিচিত্র বর্ণ দেওয়া হইল কেন? উহার ও বিচিত্র বর্ণ না থাকিলে আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত কি না? কে বলিবেন যে, আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত? উহার অভাবেও আমরা বাঁচিতাম, কিন্তু ইহা থাকাতে একটু সুখে বাঁচিতেছি; ইহা না থাকিলে একটু সুখের ব্যাঘাত হইত। তবে এ সৃষ্টির মূলে এরূপ দেখিতেছি যে, বিশ্বকারণ এরূপ চাহিয়াছেন যে, আমরা যে কেবল কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকি তাহা নহে, কিন্তু বাঁচিয়া সুখে থাকি। এবং সেই জন্য আয়োজনও করিয়াছেন। প্রীতির পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অনুসারে উহা কি প্রীতি নহে? কেননা তুমি বিশ্বের অন্তরালবাসী শক্তি! "তুমি কেবল চাও যে আমরা সুখে থাকি," ঐ গোলাপটী দেখিয়া পাঠক মহাশয়ের প্রাণ কি এরূপ ধ্বনি উঠিতেছে না?

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধিক বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই, যে প্রীতি দেখিয়া বিশ্বকারণে প্রীতির অনুমান করিতেছি, সেই মানবপ্রীতির বিষয় একটু চিন্তা করা যাউক। মনে করুন, আমাদের প্রীতি যদি না থাকিত, কেবল স্বার্থ ও সুখাসক্তিই যদি আমাদের পরিচালক হইত, সংসারের অধিকাংশ কাজ অব্যাহতে চলিত কি না? বণিক স্বার্থের জন্য পণ্যদ্রব্য আনিত, আমি পেটের দায়ে কিনিতাম, পাচক বা [illegible] স্বার্থের জন্য রন্ধন করিত, আমার অন্ন পান জুটিয়া যাইত, এইরূপ চলিয়া যাইতেছে। পুরুষ সুখাসক্তির [illegible]; স্ত্রীলোক সেই কারণে [illegible] সঙ্গিনী হইত। ইহাতে কি প্রাণ রক্ষা ও সৃষ্টি রক্ষা হইত না? কিন্তু এই স্বার্থ ও সুখাসক্তির মধ্যে প্রেম নামে একটা পদার্থকে ঢালিয়া দিল, দিয়া সংসারকে মধুময় করিল। আহা! প্রেম কি পদার্থ! কোন কবি কোথায় আছেন, যিনি এই স্বর্গীয় পদার্থের মহিমা অদ্যাপি বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? [illegible] রাক্ষসী [illegible] কোলে খাটিয়ে আসিয়াছে, [illegible]

* আমরা যেন কোথায় পড়িয়াছি মনে হয় যে, গন্ধহীন পুষ্প হইতেই মধুমক্ষিকা মধু আহরণ করে—যাহাই হউক ইহাতে মূলবিষয় লেখকের তাৎপর্য্যে কোন ব্যাঘাত আসিতে পারে না। সং

প্রতি উহার স্নেহ ও ভালবাসা পড়ুক, অমনি উহার [illegible] জয় [illegible] হইয়া যাইবে, [illegible] করিয়া আর লজ্জাপ্যায়িত হইবে আমি সুখে আহার করিলে ও ব্যক্তি স্বর্গ হাতে পাইবে, আমি সেই অন্নের সঙ্গে অমৃত আস্বাদন করিব। ধন্য প্রেম, তোমাকে ছোঁয়াইলে লোহ স্বর্ণ হইয়া যায়। অনেক স্থলেই আমরা প্রেমের অভাবে বাঁচিতে পারিতাম বটে, কিন্তু এমন সুখে বাঁচিতে পারিতাম না। কে গো বিশ্বের অন্তরালবাসিনী শক্তি, তুমি কেন চাও যে আমরা সুখে থাকি? এই প্রশ্ন আবার মনে উদয় হইতেছে। আর ইহাও কি সম্ভব যে, মানব হৃদয়ে এই প্রেমাগ্নি দেখিতেছি অথচ যে বিশ্বকারণ হইতে মানব হৃদয় সমুৎপন্ন, তাহাতে সেই প্রেমাগ্নি নাই? অতএব বলি বিশ্বকারণে যে কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা আছে, তাহা নহে, প্রেমও আছে।

কেবল তাহা নহে, তাঁহাতে আরও কিছু আছে। মানব প্রকৃতির আর একটা গূঢ় তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। মনে করুন, একজন লোকের সিন্দুকের চাবিটা হারাইয়া গিয়াছে। তিনি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে অনেক গুলি চাবি আনাইয়াছেন; এক একটী করিয়া চাবী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। যে চাবিগুলি গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে কিন্তু লাগিতেছে না, তিনি এদিক ওদিক সেদিক করিয়া বার বার দেখিয়া শেষে বলিতেছেন, না এটা লাগিল না, এই বলিয়া সেটীকে পরিত্যাগ করিতেছেন। কিম্বা মনে করুন, এক ব্যক্তি শুনিয়াছিলেন যে, কোন একটী বিশেষ দ্রব্যে বমন নিবারণ করে। তিনি এক শত স্থলে সেইটী প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, বমন নিবারণ করে না। তৎপরে তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার শুনা কথা মিথ্যা। তিনি উক্ত দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। আর পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিল না। মানবের সকল কার্য্যেই এরূপ দেখা যায়; দশবার দেখিয়া বারম্বার বিফল হওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস থাকে না। সকলেই বলিবেন, ইহাই মানব-মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একটী স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি আপনার চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা লাভের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। এই সংগ্রামের প্রকৃতি আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা ইহার মধ্যে তিনটী ভাব লক্ষ্য করি। (১ম) এই সংগ্রামে দুর্ব্বলতা বশতঃ বার বার অকৃতকার্য্য হইয়াও [illegible] নয় যে [illegible] হইবে [illegible] না—সে শতবার পড়িয়াও আশা করে। অন্যান্য স্থলে দশবার হারিলে নিরাশ হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের স্থলে শতবার হারিয়াও নিরাশ হইতেছে না। (২য়) সে যখন দুষ্প্রবৃত্তিদিগের বশবর্ত্তী হইয়া পতিত হইতেছে, তখনও পতিত হইতে হইতে ইহা অনুভব করে যে, ধর্ম্মেরই জয়যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ সে পাপের দাসত্ব করিতে করিতেও পুণ্যের মহত্ত্ব অনুভব করে। এই ধর্ম্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সে যত জয়লাভ করে, তাহা হইলে, কখনও এরূপ অবস্থা অনুভব করে না যে, ধর্ম্মের উপরে উঠিয়াছে, তাহার লাভ করিবার আর কিছু নাই, বরং সে যত ঊর্দ্ধে উত্থান করে, সে তত মস্তকের উপরে ধর্ম্মকে উন্নত দেখিতে পায়। প্রথম দুইটী হইতে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, ধর্ম্মের মহত্ত্বে বিশ্বাস মানবের স্বভাব-সিদ্ধ। ইহা অপরাপর বিশ্বাসের ন্যায় নয় যে, অকৃতকার্য্য হইলে উঠিয়া যায়। তৃতীয়টী দ্বারা এই সত্য অনুভব করিতেছি যে, আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের যে ভাব আছে, তাহার কোন একটী সীমা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের মহত্ত্বজ্ঞান স্বাভাবিক এবং ধর্ম্ম-ভাবের মধ্যে অনন্তের ভাব মিশ্রিত; এই উভয় সত্য এক সঙ্গে আলোচনা করিলে কিরূপ ভাব মনে উদয় হয়, উহাতে কি এই বিশ্বাস অন্তরে প্রবল হয় না যে, আমাদের প্রকৃতিতে যে ধর্ম্ম নিয়ম, সেই ধর্ম্ম নিয়ম সেই বিশ্বের আদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন।

মানব হৃদয়ের এই ধর্ম্মভাবের গভীরতা যে কত, তাহা মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়। একি এক আশ্চর্য্য ভাব মানবকে শাসন করিতেছে!! রোমদেশ হইতে রাজাগণ যখন তাড়িত হইলেন, তখন দুইজন কনসলের উপর নগর রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তখন রাজবংশের প্রতি রোমবাসীদিগের এত বিদ্বেষ যে তাঁহারা এই আইন করিয়াছিলেন যে, রোমনগরবাসী যে কোন ব্যক্তি পুনরায় রাজাদিগকে আনিবার ষড়যন্ত্র মধ্যে থাকিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। এইরূপ বিধি প্রচার হওয়ার পর কতকগুলি রোমীয় যুবক উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়া বিচারার্থ উক্ত কনসলদ্বয়ের নিকটে নীত হইল। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই যুবকদলের মধ্যে একজন কনসলের দুইটী পুত্র ছিল। তিনি যখন বিচারাসনে, তখন সমুচিত বিচার করিয়া আইনসঙ্গত দণ্ড দেওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই জ্ঞানে, তিনি যথারীতি সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যখন স্বীয় পুত্রদিগের দোষ সপ্রমাণ দেখিলেন, তখন তাহাদিগকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যখন ঘাতকগণ তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া

চলিল, তখন তিনি বস্ত্রে মুখ আবরণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। এক দিকে অপত্য স্নেহ অপর দিকে কর্ত্তব্য জ্ঞান, সংগ্রামে কর্ত্তব্য জ্ঞানই জয়যুক্ত হইল; এরূপ ব্যাপারটী মানব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীতে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? বিগত মিউটিনীর সময় সার হেনরি লরেন্স অযোধ্যায় কমিশনর ছিলেন। তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও ভগ্নশরীর হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্ণৌ নগরে সংবাদ আসিল যে, সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌএর দিকে আসিতেছে। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, সেই বিপদের সময় তাঁহার নিজের শরীরের প্রতি উপেক্ষা করিয়া দেশের প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া সেই রুগ্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক দল সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং ২৪ ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া অনবরত যুদ্ধ করিলেন। তৎপরে পরাস্ত হইলে, লক্ষ্ণৌ নগরের প্রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসিয়া, সহরের ও চতুঃপার্শ্বের সমুদায় ইংরাজকে সেই বাড়ীতে পুরিয়া বাড়ীটাকে দুর্গপ্রায় করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক দিন এক কামানের গোলা তাঁহার গৃহ মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিল। সেই প্রহার বেদনায় তিনি মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, ইহার পর কয়েক দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই অসহ্য যাতনার মধ্যে তিনি সতত সেই বাড়ীতে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন, আহতদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্তের উপদেশ দিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার পরামর্শ দিতেছেন, শিশুদিগের তত্ত্ব লইতেছেন। পাঠক মহাশয় কোন পশুতে এপ্রকার কর্ত্তব্য জ্ঞানের কল্পনা করিতে পারেন কি না? শরীর মন সমুদায় অবসন্ন, সমুদায় বিশ্রাম চাহিতেছে, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান চুলে ধরিয়া পরিশ্রম করাইতেছে—এই স্বর্গীয় দৃশ্য কেবল মানবে সম্ভব। একদিকে যেমন কর্ত্তব্য জ্ঞান অপর দিকে অনুতাপ। অনুতাপের অশ্রু মুক্তাদল হইতেও সুন্দর। এ অশ্রু ফেলিবার অধিকার কেবল মানবেরই আছে। আমার যাহা করা উচিত ছিল তাহা করিতে পারি নাই, ইহা বলিয়া কোন নিকৃষ্ট প্রাণীকে কবে ম্লান হইতে দেখিয়াছেন? এই আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা ও লজ্জার গভীরতা কেবল মানবেই সম্ভব। যিনি এই উচ্চতা ও গভীরতাকে মানব প্রকৃতিতে নিহিত করিয়াছেন তিনি যে "ধর্ম্মাবহ পাপনুদ" "ধর্ম্মের আবহ ও পাপের শান্তিদাতা," তাহা কি সহজ বুদ্ধিতেই অনুভব করা যায় না?

আবার দেখুন যেই আদ্যাশক্তিতে যদি জ্ঞান থাকিল, ক্রিয়েচ্ছা থাকিল, প্রেম থাকিল, স্বাধীন নিয়ম থাকিল, তাহা হইলে তিনি তাড়িত বা অন্য কোন ভৌতিক শক্তির ন্যায় জড় শক্তি হইলেন না, কিন্তু সচেতন পুরুষ হইলেন। যে অর্থে স্ত্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহার হয়, সে অর্থে এই পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। জ্ঞান প্রীতি ও ক্রিয়েচ্ছাসম্পন্ন যিনি, তিনি পুরুষ। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত যোগ দিয়া বলিতে ইচ্ছা করে;—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অর্থ—"অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী—এই মহৎ পুরুষকে আমি জানিয়াছি—ইহাঁকে লাভ করিয়া মানুষ মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে, যাইবার অন্য পথ নাই।"

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

সম্প্রতি কিছুকাল হইতে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। এই জন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্ম্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ দল খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।

বলবুলের লড়াইয়ের যেমন পাখীতে পাখীতেই খোঁচাখুঁচি চলে অথচ উভয় পক্ষীয় লোকের গায়ে একটিও আঁচড় পড়ে না, আমি বোধ করি অনেক সময়ে সেইরূপ কথাতে কথাতে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় অথচ উভয় পক্ষীয় মত অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে থাকে। সাকার ও নিরাকার উপাসনার অর্থই বোধ করি এখনও স্থির হয় নাই। কেবল দুটো কথায় মিলিয়া বাঁওকষাকষি করিতেছে।

একটি মানুষকে যখন মুক্ত স্থানে অন্তরিত ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে যখন স্বেচ্ছামতে চলিয়া বেড়ায়, তখন সে প্রতি-পদক্ষেপে কিয়ৎ পরিমাণ মাত্র স্থানের বেশী অধিকার করিতে পারে না। হাজার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠুন বা আড়ম্বর করিয়া পা ফেলুন, তিন চারি হাত জমির বেশী তিনি শরীরের দ্বারায় আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সে বেচারাকে সেই তিন চারি হাত জমির মধ্যেই বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সে কি একই কথা হইল? আমি বলি ঈশ্বর-উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ হৃদয়ের বিস্তারজনক ও স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতাই অপৌত্তলিকতা এবং তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাজনক ও অস্বাস্থ্যজনক রুদ্ধভাবই পৌত্তলিকতা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টির দোষে আমরা সমুদ্রের সবটা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি বলেন—এত খরচপত্র ও পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র দেখিতে যাইবার আবশ্যক কি। কারণ, হাজার চেষ্টা করিলেও তুমি সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখিতে পাইবে মাত্র, সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে না। তাই যদি হইল তবে একটা ডোবা কাটিয়া তাহাকে সমুদ্র মনে করিয়া লওনা কেন?—তবে তাঁহার সে কথাটা পৌত্তলিকের মত কথা হয়। আমরা মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই যদি সব হইত তাহা হইলে যে ব্যক্তি আধগ্লাস জল খায় তাহার সহিত সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের তফাৎ কি? আমি যেন বলপূর্ব্বক ডোবাকেই সমুদ্র মনে করিয়া লইলাম—কিন্তু সমুদ্রের সে বায়ু কোথায় পাইব, সে স্বাস্থ্য কোথায় পাইব, সেই হৃদয়ের উদারতাজনক বিশালতা কোথায় পাইব, সেটাত আর মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই হয় না!

আমরা অধীন এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু অধীন বলিয়াই স্বাধীনতার চর্চ্চা করিয়া আমরা এত সুখ পাই—আমরা সসীম সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সসীম বলিয়াই আমরা ক্রমাগত অসীমের দিকে ধাবমান হইতে চাই, সীমার মধ্যে আমাদের সুখ নাই। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা দুর্ব্বল বলিয়া আমাদের যতটুকু বল আছে তাহাও কে বিনাশ করিতে চায়, আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহাও কে অপহরণ করিতে চায়, আমরা বর্ত্তমানে দরিদ্র বলিয়া আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের আশাও কে উন্মূলিত করিতে চায়। আমাদের পথ রুদ্ধ করিও না, আমাদের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে আর সমস্তই পথ—অতএব আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে, অগ্রসর হইতে হইবে; কক্কির বেড়ি বাঁধিয়া আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করিও না।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে কবিতার হিসাবে দেখেন। তাঁহারা বলেন কবিতাই পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতাই কবিতা। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা ভাবমাত্রকে আকার দিতে চাই, ভাবের সেই সাকার বাহ্য স্ফূর্ত্তিকে কবিতা বলিতে পার বা পৌত্তলিকতা বলিতে পার। এইরূপ

ভাবের বাহ্য প্রকাশ চেষ্টাকেই ভাবাভিনয়ন বলে।

কিন্তু কবিতা পৌত্তলিকতা নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের আইনই পৌত্তলিকতা। ভাবাভিনয়নের স্বাধীনতাই কবিতা ও ভাবাভিনয়নের অধীনতাই অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত পদ্যরচনা। কবিতায় হাসিকে কুন্দকুসুম বলে কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে হাসিকে কুন্দকুসুম বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু কবরের মধ্যে জীবন বাস করিতে পারে না। কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশে যদি মূর্ত্তি গড়া যায় ও সেই মূর্ত্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে মূর্ত্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্ত্তিটাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পলাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমে উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না—মনুষ্য প্রকৃতিরই এই ধর্ম্ম।

যেখানে চক্ষুর কোন বাধা নাই এমন এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়াইয়া চারিদিকে যখন চাহিয়া দেখি, তখন পৃথিবীর বিশালতা কল্পনায় অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু কি করিয়া জানিলাম পৃথিবী বিশাল? প্রান্তরের যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততখানি যে অত্যন্ত বিশাল তাহা নহে। আজন্ম আমরণ কাল যদি এই প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম আর কিছুই না দেখিতে পাইতাম তবে এইটুকুকেই সমস্ত পৃথিবী মনে করিতাম—তবে প্রান্তর দেখিয়া হৃদয়ের এরূপ প্রসারতা অনুভব করিতাম না। কিন্তু আমি না কি স্বাধীন ভাবে চলিয়া বেড়াইয়াছি সেই জন্যই আমি জানিয়াছি যে, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াও পৃথিবী বর্ত্তমান। সেইরূপ যাঁহারা সাধনা দ্বারা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা যদিও একেবারে অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তথাপি তাঁহারা ক্রমশই হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিতে থাকেন। স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহারা জানেন যে যতটা তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে পাইয়াছেন তাহা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বর বিরাজমান। হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়। পৌত্তলিকতায় তাহার বাধা দেয়। অতএব, নিরাকার উপাসনাবাদীরা আমাদিগকে কারাগার হইতে বাহির হইতে বলিতেছেন, অসীমের মুক্ত আকাশ ও মুক্ত সমীরণে আসিয়া, বল ও আনন্দ লাভ করিতে বলিতেছেন, কারাগারের অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া অসীমের বিশুদ্ধ জ্যোতি ও পূর্ণ উদারতায় হৃদয়ের বিস্তার লাভ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের বন্ধন মোচন করিতে আত্মার সৌন্দর্য্য সাধন করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কারার মধ্যে অন্ধকার অসুখ অস্বাস্থ্য; অনন্তরূপের আনন্দ-আহ্বানধ্বনি শুনিয়া দুঃখ শোক ভুলিয়া বাহির হইয়া আইস—ব্যবধান দূর করিয়া অনন্তসৌন্দর্য্যস্বরূপ পরমাত্মার সম্মুখে জীবাত্মা প্রেমে অভিভূত হইয়া একবার দণ্ডায়মান হউক, সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের মিলন হইয়া সমস্ত জগৎ আসিয়া [illegible]

পরিণত হউক্‌। তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে এক লম্ফে অসীমকে অতিক্রম করিতে হইবে, দূরবীক্ষণ কষিয়া অসীমের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, অসীমের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া অসীমকে আমাদের বাগানবাটির সামিল করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল বলেন সুখ শান্তি স্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য অসীমে বাস কর, অসীমে বিচরণ কর, পরিবর্ত্তনশীল, বিকারশীল, আচ্ছন্নকারী বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আত্মাকে অবিরত বেষ্টিত করিয়া রাখিও না। সূর্য্যকিরণের অধিকাংশই সৌর জগতে নিযুক্ত আছে, অধিকাংশ অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সামান্য পরিমাণ পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণের কণামাত্র পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এমন পৌত্তলিক কি কেহ আছেন যিনি বলিতে চাহেন এই আংশিক সূর্য্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভাল। এই সূর্য্যকিরণসমুদ্রে পৃথিবী ভাসিতেছে বলিয়াই পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য ও জীবন। পরমাত্মার জ্যোতিতেই আত্মার শ্রী সৌন্দর্য্য জীবন। আত্মা ক্ষুদ্র বলিয়া পরমাত্মার সমগ্র জ্যোতি ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি দীপশিখাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে?

অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করিয়া থাকি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেখানে আকাশের সীমা দেখি সেখানেই যে তাহার বাস্তবিক সীমা তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চিত্র-বিদ্যা অথবা দৃষ্টিবিজ্ঞানে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা জানেন আমরা চোখে যাহা দেখি মনে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লই—দূরত্ব অনুসারে দ্রব্যের প্রতিবিম্বে যে সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহার অনেকটা আমরা সংশোধন করিয়া লই। অধিকাংশ সময়েই চোখে যাহাকে ছোট দেখি মনে তাহাকে বড় করিয়া লই—চোখে যেখানে সীমা দেখি মনে সেখান হইতে সীমাকে দূরে লইয়া যাই। অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের মধ্যে যদি বা সীমা দেখিতে পাই তথাপি আমরা সেই সীমাকে বিশ্বাস করি না। অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সর্ব্বতোভাবে তাহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা নহে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদকে যত বড় দেখায় চাঁদ তাহার চেয়ে অনেক বড় আমরা জানি তথাপি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না—তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে গেলে ঈশ্বরকে যদি বা সীমাবদ্ধ দেখায় তথাপি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়কে অবহেলা করিতে পারি না—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহাকে চূড়ান্ত মীমাংসক বলিয়া গণ্য করি না।

অসীমতা কল্পনার বিষয় নহে, সীমাই কল্পনার বিষয়। অসীমতা আমাদের সহজ জ্ঞান, সহজ সত্য। সীমাকেই কষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সীমা সম্বন্ধেই আমাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হয়, অনুমান ও তর্ক করিতে হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। যেমন সকল ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই স্বরবর্ণ পূর্ব্বে কিম্বা পরে বিরাজ করেই তেমনি অনন্তের ভাব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সহিত সহজে লিপ্ত রহিয়াছে। এই জন্য অসীমের ভাব আমাদের কল্পনার বিষয় নহে তাহা লক্ষ্য বা অলক্ষ্য ভাবে সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মনে

করুন, আমরা ষাটি ক্রোশ একটা মাঠের মধ্যে বসিয়া আছি। আমরা বিলক্ষণ জানি এ মাঠ আমাদের দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তার করিতেছে, এবং আমরা ইহাও নিশ্চয় জানি এ মাঠ অসীম নহে—কিন্তু তাই বলিয়া যদি মাঠের ঠিক ষাটক্রোশব্যাপী আয়তন ই কল্পনা করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। আমরা তখন বলিয়া বসি এ মাঠ অসীম, অসীম বলিলেই আমরা আরাম পাই, সীমা নির্দ্ধারণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই।—সমুদ্রের মাঝখানে গেলে আমরা বলি সমুদ্রের কূল-কিনারা নাই। আকাশের কোথাও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, এই জন্য সহজেই আমরা আকাশকে বলি অসীম, আকাশকে সসীম কল্পনা করিতে গেলেই আমাদের মন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অক্ষম হইয়া পড়ে। কালকে আমরা সহজেই বলি অনন্ত, নক্ষত্র মণ্ডলীকে আমরা সহজেই বলি অগণ্য—এইরূপে সীমার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অসীমের মধ্যেই শান্তি লাভ করি। অসীম আমাদের মাতৃক্রোড়ের মত বিশ্রাম-স্থল; শিশুর মত আমরা সীমার সহিত খেলা করি এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই অসীমের কোলে বিরাম লাভ করি;—সেখানে সকল চেষ্টার অবসান, সেখানে কেবল সহজ সুখ, সহজ শান্তি, সেখানে কেবল মাত্র পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন। এই চিরপুরাতন চিরসঙ্গী অসীমকে বলপূর্ব্বক বিভীষিকারূপে খাড়া করিয়া তুলা অতি পণ্ডিতের কাজ। তর্ক করিয়া যাঁহাদিগকে না চিনিতে হয় যাকে দেখিলে তাঁহাদের সংশয় আর কিছুতেই ঘুচে না, কিন্তু স্বভাব-শিশু যাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া ছুটিয়া যায়। সীমাতেই আমাদের শান্তি, অসীমেই আমাদের শান্তি, ভুমৈব সুখং, ইহা লইয়াই আবার তর্ক করিব কি! সীমা অসংখ্য, অসীম এক। সীমার মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত অসীমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত, সীমার মধ্যে আমাদের বাসনা অসীমের মধ্যে আমাদের তৃপ্তি, ইহা লইয়া বিতর্ক করিতে বসাই বাহুল্য। বুদ্ধি যখন দীপের আকার ধারণ করে তখন তাহা কাজে লাগে, যখন আলেয়ার আকার ধারণ করে তখন তাহা অনর্থের মূল হয়। অতএব পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা কেবল সীমায় সাঁতার দিয়া মরি কিন্তু অসীমে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যাই।

পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর বঞ্চাট বাঁচিয়া যায় এই জন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেই দিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। আমাদের কি এ আশঙ্কা নাই? কেবল মূর্ত্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়? আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্য-মাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে। এবং সেই জন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। অন্য চিহ্ন অপেক্ষা ভাষা চিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে [illegible] আমার অন্তরের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।

আসল কথা, আমাদের সীমাও অসীমও দুইই চাই। আমরা যা বলিয়াছি সীমার

উপরে মাথা তুলিয়াছি অসীমে। আমাদের একদিকে সীমা ও একদিকে অসীম। বস্তুগত (Realistic) কবিতার দোষ এই, যে আমাদের কল্পনার চোখে ধুলা দিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অসীমের পথ লুপ্ত করিয়া দেয়। বস্তুগত কবিতায় বস্তু নিজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলে,—আমাতেই সমস্ত শেষ, আমাকে ঘ্রাণ কর, আমাকে স্পর্শ কর, আমাকে ভক্ষণ কর, আমাকেই কায়মনোবাক্যে ভোগ কর। কিন্তু ভাব-প্রধান (Suggestive) কবিতার গুণ এই, যে আমাদিগকে এমন সীমারেখাটুকুর উপর দাঁড় করাইয়া দেয় যাহার সম্মুখেই অসীমতা। ভাবগত কবিতায় বস্তু কেবলমাত্র অসীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইসারা করিয়া দেখাইয়া দেয়, চোখের অতিশয় কাছে আসিয়া অসীম আকাশকে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। আমরা চিহ্ন না হইলে যদি না ভাবিতেই পারি তবে সে চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা গণ্ডী হইয়া না দাঁড়ায়। যাহাতে সে কেবল ভাবকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, ভাবকে আচ্ছন্ন না করে।

ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিতে গিয়া ভক্তের মন মনুষ্য-স্বভাব বশতঃ সহজেই বলিতে পারে "আমি ঈশ্বরের চরণচ্ছায়ায় আছি" তাহাতে আমার মতে পৌত্তলিকতা হয় না। কিন্তু যদি কেহ সেই চরণের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া দেয়, অঙ্গুলির নখ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তবে তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে হয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র ভাব নির্দ্দেশের পক্ষে এরূপ বর্ণনার কোন আবশ্যক নাই;—কেবল আবশ্যক নাই যে তাহা নয়, ইহাতে করিয়া ভাব হইতে মন প্রতিহত হইয়া বস্তুর মধ্যে রুদ্ধ হয়।

"চরণচ্ছায়ায় আছি" বলিতে গেলেই অমনি যে রক্ত মাংসের একযোড়া চরণ মনে পড়িবে তাহা নহে। চরণের তলে পড়িয়া থাকিবার ভাবটুকু মনে আসে মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি কোন কবি বলেন বসন্তের বাতাস মাতালের মত টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে ঢলিয়া পড়িতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটা মাতালের ছায়াছবি জাগিয়া উঠিবে; তাহার চলার ভাবের সহিত বাতাসের চলার ভাবের তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই কোন মহাপণ্ডিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট, নখবিশিষ্ট, বিশেষ কোন বর্ণবিশিষ্ট, রোমবিশিষ্ট, এক যোড়া টলটলায়মান রক্তমাংসের পা বাতাসের গাত্রে ঝুলিতে দেখেন। কিন্তু কবি যদি কেবল ইসারায় মাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া মাতালের পায়ের উপরেই বেশী ঝোঁক দিতেন; যদি তাহার পায়জামা ও ছেঁড়াবুট, বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন, ডান পায়ের এক হাঁটু কাদার কথার উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভাব ও ভঙ্গীর সাদৃশ্যটুকু মাত্র মনে আসিত না, সশরীরে এক যোড়া পা আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট লইয়া আস্ফালন করিত। কে না জানেন চন্দ্রানন বলিলে থালার মত একটা মুখ মনে পড়ে না, অথবা করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না—কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের মত মুখ ও পদ্মের মত করতল চিত্রপটে যদি আঁকিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই যথার্থ মনে করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন উপায় থাকে না। "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" ভাষাতে এই বর্ণনা শুনিলে কোন তর্কবাগীশ একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মূর্ত্তি কল্পনা করেন না; কিন্তু যদি একটা চিত্রে অথবা মূর্ত্তিতে অবিকল বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও দুইটি শাল বৃক্ষের ন্যায় বাহু রচনা করিয়া দেওয়া যায় তবে দর্শক তাহাকেই প্রকৃত না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

আর একটি কথা। কতগুলি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য, যাহা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ও করাই উচিত। যেমন, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ঈশ্বরের কপালে তিনটে চক্ষু দিলেই যে ইহা আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বুঝিতে পারি তাহা নহে। বরঞ্চ তিনটে চক্ষুকে আবার বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয় ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষা অলঙ্কারশূন্য। অলঙ্কারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া দেয়, মিথ্যা করিয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে

রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে। কবি টেনিসন্ একটি প্রাচীন ইংরাজি কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন,তাহাতে আছে—মহারাজ আর্থরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া নায়ক লান্স্‌লট্ কুমারী গিনেবীর্‌কে মহারাজের সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য কুমারীর পিতৃভবন হইতে আনিতে গিয়াছেন—কিন্তু সেই কুমারী প্রতিনিধিকেই আর্থর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেন; অবশেষে যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না; এইরূপে এক দারুণ অশুভ পরিণামের সৃষ্টি হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই, ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি—অবশেষে ভ্রম ভাঙ্গিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারন, জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এই জন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া কোন মতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য্য হই, সুচতুর ব্যাখ্যার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্ম্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখি এবং তাহার চাকচিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা, কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা ত ধর্ম্মের সহিত চালাকী করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্য্যেরা অভিমানী উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইহাঁরা জানেন ইহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঙ্গিতেছেন গড়িতেছেন, ইহাঁরাই ধর্ম্মের সেতু।

জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক ও হানিজনক বটে কিন্তু আমাদের ভাবগম্য বিষয়কে আমরা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অনেক সময়ে রূপকে ব্যক্ত করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না, ইহাতে একটি ঘটনা ব্যক্ত হয় মাত্র; সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছে আমিও তাঁহার আশ্রয়ে আছি এই কথা বলা হয় মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরের চরণের তলে পড়িয়া আছি বলিলে তবেই আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়—ইহা কেবল আমার সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনসূচক পড়িয়া থাকার ভাব। অতএব ইহাতে কেবল আমারই মনের ভাব প্রকাশ পাইল ঈশ্বরের চরণ প্রকাশ পাইল না। অতএব ভক্ত যেখানে বলেন, হে ঈশ্বর আমাকে চরণে স্থান দাও, সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছাকেই রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন, ঈশ্বরকে রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন না।

যাই হোক্ যদি কোন ব্যক্তি নিতান্তই বলিয়া বসে যে আমি কোন মতেই গৃহকার্য্য করিতে পারি না, আমি খেলা করিতেই পারি তবে আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে চাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অন্য পাঁচ জনকে বলে গৃহকার্য্য করা সম্ভব নহে খেলা করাই সম্ভব তখন তাহাকে বলিতে হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া যে সকলের পক্ষেই অসম্ভব সে কথা ঠিক না হইতে পারে। অথবা যদি বলিয়া বসে যে খেলা করা এবং গৃহকার্য্য করা একই, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতভেদ প্রকাশ করিতে হয়। এক জন বালিকা যখন পুতুলের বিবাহ দিয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, তখন পুতুলকে সে নিতান্তই মৃৎপিণ্ড মনে করে না—তখন কল্পনার মোহে সে উপস্থিতমত পুতুল দুটিকে সত্যকার কর্ত্তা গৃহিণী বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে খেলা বলিব না সত্যকার গৃহকার্য্যই বলিব এমন হইতে পারে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আমাদিগকে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত করায় [illegible] সেই সকল বৃত্তির অস্তিত্ব প্রকাশ [illegible]। ইহাও বলিতে পারি খেলা ছাড়িয়া [illegible] গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, [illegible] এই

সকল বৃত্তি সার্থক হইবে। আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, এবং ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা, এ দুইয়ের মধ্যেও সেই গৃহকার্য্য ও খেলার প্রভেদ। ইহার মধ্যে একটি আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কার্য্য, আত্মার গভীর অভাবের প্রকৃত পরিতৃপ্তি সাধন, আরেকটি তাহার খেলা মাত্র। কিন্তু এই খেলাতেই যদি আমরা জীবন ক্ষেপণ করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সকলেই কিছু গৃহকার্য্য ভালরূপ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে বলিতে পারি না, তবে 'তোমরা পুতুল লইয়া খেলা কর।' তাহাদিগকে বলিতে হয় তোমরা চেষ্টা কর। যতটা পার তাই ভাল, কারণ ইহা জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য। ক্রমেই তোমার অধিকতর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বল লাভ হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা উপাসনা হইলই না, খেলা হইল। ঈশ্বরের ধ্যান করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সমান কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আর রসনাগ্রে সহস্রবার ধ্যানহীন ঈশ্বরের নাম জপ করিলে বিশেষ কোন ফলই হয় না, অথচ তাহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কিন্তু আয়ত্তাধীন বলিয়াই যে শাস্ত্রের অনুশাসনে, নরকের বিভীষিকায় সেই নিস্ফল নাম জপ অবলম্বনীয় তাহা নহে।

সীমাবদ্ধ যে-কোন পদার্থকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিলাপ থাকিয়া যায় যে তাহাদিগকে আমরা আত্মার মধ্যে পাই না। তাহারা আত্মময় নহে। জড় ব্যবধান মাঝে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। জননী যখন সবলে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরেন তখন তিনি যতটা পারেন ব্যবধান লোপ করিতে চান, কিন্তু সম্পূর্ণ পারেন না এই জন্য সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দূরে রাখি কেন? আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বহস্তে ব্যবধান রচনা করিয়া দিই কেন? তিনি আত্মার মধ্যেই আছেন আত্মাতেই তাঁহার সহিত মিলন হইতে পারে, তবে কেন আত্মার বাহিরে গিয়া তাঁহাকে শত সহস্র জড়ত্বের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই? আত্মার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আত্মার ভিতরে পাইতে চাই, আর যিনি আত্মার মধ্যেই আছেন তাঁহাকে কেন আত্মার বাহিরে রাখিতে চাই!

নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের একটা কথা আছে যে, নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না, সহজ-বুদ্ধিতে যাহা মনে হইল তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ কি করিয়া জানিব! তাঁহার অনন্ত স্বরূপ তিনিই জানেন। কিন্তু আমি যখন সগুণ তখন আমার ঈশ্বর সগুণ।* আমার সম্বন্ধে তিনি সগুণ ভাবে বিরাজিত। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা যে তাহাই, তাহা কি করিয়া জানিব! তাহার নিরপেক্ষ স্বরূপ জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর কোন সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিলে আমি মারা পড়িব। হল্যাণ্ডে সমুদ্রে বন্যা আসিত। তাই বলিয়া কি হল্যাণ্ড সমুদয় সমুদ্র বাঁধিয়া ফেলিবে! সমুদ্রের যে অংশের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ সেই টুকুর সঙ্গেই তাহার বোঝাপড়া। মনে করুন একটি শিশুর পিতা জমিদার, দোকানদার, মিউনিসিপালিটি সভার অধ্যক্ষ, ম্যাজিষ্ট্রেট, লেখক, খবরের কাগজের সম্পাদক—তিনি কলিকাতাবাসী, বাঙ্গালী, হিন্দু, কক্ষেশীয় শাখাভুক্ত, আর্য্যবংশীয়, তিনি মনুষ্য—তিনি অমুকের পিসে, অমুকের মেসো, অমুকের ভাই, অমুকের শ্বশুর, অমুকের প্রভু, অমুকের ভৃত্য, অমুকের শত্রু, অমুকের মিত্র, ইত্যাদি—এক কথায়, তিনি যে কত কি তাহার ঠিকানা নাই—কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে কেবল তাহার বাবা বলিয়াই জানে (বাবা

* কাগজের যেমন ও পিঠ বাদে শুদ্ধ কেবল এ-পিঠ-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না—সেইরূপ কোন সত্তারই গুণ-বাদে শুদ্ধ কেবল বস্তু-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না; সৎ এবং আশ্রয় [illegible] দুইই এক সত্তাটি প্রতিপাদন করিতেছে যে, চিৎ এবং আনন্দ এই দুই আধ্যাত্মিক গুণ এবং তাহার আধার-ভূত বস্তু সৎ ভিন্ন ধরিয়া "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই এক সত্তা আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। সং

কাহাকে বলে, তাহাও সে ভাল করিয়া জানে না)—শিশুটি কেবল তাঁহাকে তাহার আপনার বলিয়া জানে; ইহাতে ক্ষতি কি। এই শিশু যেমন তাহার পিতাকে জানেও বটে, না জানেও বটে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরকে জানিও বটে না [illegible]। আমরা কেবল এই জানি তিনি আমাদের আপনার। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের [illegible] যাহা কিছু জ্ঞান আছে, তাহাই আমাদের অন্তরের ঈশ্বর, তাহাই আমাদের [illegible], তাহাই আমাদের [illegible] ধ্রুবতারা। তাঁহার যাহা নিগূঢ় স্বরূপ তাহার তত্ত্ব কে পাইবে। কিন্তু [illegible] যে আমাদের দেবতা আমাদের নিজ কল্পনা, আমাদের মনগড়া [illegible] নহে। আত্মিক পৌত্তলিকতা যেরূপ [illegible] সেইরূপ মত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দৃষ্টিযোগের সমুদ্রকে সমুদ্র বলা [illegible] সমুদ্র বলা [illegible]। ইহাকে আমি আংশিক বলি না—আমি—এই জন্য হৃদয় যতই প্রসারিত করিতেছি, আমার ঈশ্বরকে ততই অধিক করিয়া পাইতেছি—আমার [illegible] প্রেমের আদর্শ আমার যতই বাড়িতেছে ততই ঈশ্বরে আমি অধিকতর ব্যাপ্ত হইতেছি। প্রতি পদক্ষেপে, উন্নতির প্রত্যেক নূতন সোপানে পুরাতন দেবতাকে ভাঙ্গিয়া নূতন দেবতা গড়িতে হইতেছে না। [illegible] আইস অসীমকে পাইবার জন্য আমরা আত্মার সীমা ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া দিই, অসীমকে সীমাবদ্ধ না করি। যদি অসীমকেই সীমাবদ্ধ করি তবে আত্মাকে সীমামুক্ত করিব কি করিয়া। ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম জানিয়া আইস আমরা আমাদের [illegible] প্রেম দয়াকে বিস্তার করি, তবেই উত্তরোত্তর [illegible] কাছে যাইতে পারিব। তাঁহাকে [illegible] করিয়া দেখি, তবে আমরাও ক্ষুদ্র থাকিব, তাঁহাকে যদি মহৎ হইতে মহান্ বলিয়া জানি তবে আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে ধাবমান হইব। নতুবা পৃথিবীর অসুখ অশান্তি চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বাড়িবে বই কমিবে না। সুখ সুখ করিয়া আমরা আকাশ পাতাল আলোড়ন করিয়া বেড়াই, আইস আমরা মনের মধ্যে পুরাতন ঋষিদের এই কথা গাঁথিয়া রাখি "ভূমৈব সুখং" ভূমাই সুখ স্বরূপ, কোন সীমা কোন ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই—তা হইলে অনর্থক পর্য্যটনের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

GLEANING.

It is a blessed thought that there is a Sun for our souls, as well as for our bodies. That as that glorious globe of light and heat gave birth to all that is fair and beautiful and living on this earth of ours, and still sustains all the life, and is an unfailing spring of health, and comfort, and every form of loveliness, so God in Heaven beams upon the inner life of man, giving birth to all souls, and adorning them with every grace of virtue, with all the the beauty of holiness. Nor is it mere life and beauty, but active work and heroic deeds. The fruits no less than the flowers are ripened by His beams, and all our labour and success as well as our peace, and rest, and joy have come from Him. Whenever, therefore, our hours of darkness come, let us wait hopefully for His rising: if mists and clouds are round about us let us be sure that His rays will melt them; if wintry cold and gloom in their season be our portion, let us keep on our stedfast round of duty in the orbit which He has fixed for us, and in due time the warmth and longer days of springtime and summer will come again, filling our hearts with joy and gladness. "In thee, O Lord, is the well of life, and in thy light shall we see light." "O send out thy light and thy truth, that they may lead me and bring me to thy Holy Hill."

C. Voysey.

[illegible]
[illegible]

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫০৬ সংখ্যা আশ্বিন ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রসন্নসূর্য্যো যদি ভাতি কল্পনেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং। যাতি মোহান্ধতমঃ প্রশমরবের্ন্নাদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১ ভাদ্র রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা যিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়াছেন, তিনি ধ্যান-যুক্ত হইয়া তখন অখণ্ড পরমাত্মাকে অবলোকন করেন।

জ্ঞানের প্রসন্নতাতেই আমরা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হই, অর্থাৎ তাহাতেই আমাদের অন্তঃকরণ সত্ত্ব গুণের আধার হয়। অন্তঃকরণের চাঞ্চল্যই রজোগুণ, এবং অন্তঃকরণের মলিনতাই তমোগুণ; যখন অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য চলিয়া যায়, ও মলিনতা নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তাহা শারদীয় স্থির হ্রদের ন্যায় প্রশান্ত ও নির্ম্মল হয়, তখন তাহার সেইরূপ ভাবই সত্ত্ব-গুণের ভাব। মনের এইরূপ প্রশান্ত এবং নির্ম্মল অবস্থাতেই পরমাত্মার আবির্ভাব [illegible] আত্মাতে অতীব সুস্পষ্ট আকার [illegible]। এই কথাটিকে অতীব সং-[illegible] এক কথায় [illegible]তে হইলে এইরূপ বলিলেই হইতে পারে যে, জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা মন নিষ্পাপ ও নিরাকুল হইলে পরমাত্মা আত্মাতে আবির্ভূত হ'ন। জ্ঞান-প্রসাদে যেমন আমাদের হৃদয় নিষ্পাপ ও প্রশান্ত হইয়া ধ্রুব-রূপে পরমাত্মাকে আত্মাতে উপলব্ধি করে, অবিদ্যা এবং মোহের প্রাদুর্ভাবে সেইরূপ আমাদের হৃদয় উদ্বেগ অশান্তি এবং মলিনতায় ঢাকা পড়িয়া পরমাত্মাকে আর দেখিতে পায় না—মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িলে চেতনে বিমুখ হইয়া অচেতনেই তুষ্টি অবলম্বন করে,—তিন শ্রেণীর মোহমুগ্ধ ব্যক্তি তিন প্রকার তুষ্টি অবলম্বন করেন; প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিরা অদৃষ্টবাদের তুষ্টি অবলম্বন করেন; তাঁহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সম্পদকালে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির স্রোতে আত্মার সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া দৈন ও বিপদ্‌কালে "হা অদৃষ্ট" বলিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়া থাকেন; অথবা নির্ব্বিচারে পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করেন। দ্বিতীয়তঃ মোহ[illegible] ব্যক্তিরা অন্ধ বিশ্বাসের তুষ্টি অবলম্বন করেন,—সে তুষ্টি এইরূপ যে "দশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাহাকে সত্য [illegible] বিশ্বাস করে তাহাই সত্য,—

[illegible] সত্য।—বুদ্ধিমান লোকের তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।" তৃতীয়তঃ বিদ্যা-[illegible] ব্যক্তি এক প্রকার ছিন্ন-মূল বিজ্ঞানের তুষ্টি অবলম্বন করেন; সে তুষ্টি এইরূপ যে, প্রকৃত ধ্রুব সত্য আমাদের জ্ঞানের অবিষয়, আপেক্ষিক সত্যই আমাদের একমাত্র জ্ঞানের বিষয়; মনুষ্যের প্রযত্নে ঠিক ধ্রুব সত্য না হউক—অপেক্ষাকৃত ধ্রুব সত্য—যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা কেবল বিজ্ঞানেই পাওয়া যায়, অতএব বিজ্ঞানের অনুশীলনেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য—পরমার্থে হস্ত প্রসারণ করা নিতান্ত অবোধের কার্য্য।"

এই তিন প্রকার তুষ্টির কোনটিতেই মনুষ্যের নীরোগ আত্মা তুষ্ট থাকিতে পারে না। তৃষাতুরের পক্ষে জল যেমন আবশ্যক—ক্ষুধাতুরের পক্ষে অন্ন যেমন আবশ্যক—আত্মার পক্ষে ধ্রুব সত্য সেইরূপ আবশ্যক;—অপেক্ষাকৃত ধ্রুব সত্য নহে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ধ্রুব সত্য, যাহা চেতনাচেতন সমস্ত জগতের পত্তন-ভূমি, তাহাই আবশ্যক। সমুদ্রের তিমি মৎস্য যেমন পুষ্করিণীতে বাঁচিতে পারে না—অমৃতের পুত্র আত্মা সেইরূপ অধ্রুব আপেক্ষিক সত্যে বাঁচিতে পারে না;—যে বিজ্ঞান ছিন্ন-মূল ক্ষণ-প্রভার ন্যায় সংশয়ান্ধকারকে দূরীভূত না করিয়া তাহাকে আরো ঘনীভূত করিয়া তোলে, সে বিজ্ঞানে আত্মা কিছুতেই শান্তি আনিতে পারে না। যে সুনির্ম্মল চিরপ্রভা আত্মার অন্তরতম চক্ষু এবং প্রাণকে চিরন্তন ধ্রুব সত্যে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সেই জ্ঞানই আত্মার শান্তি-পীযূষ, তাহাই আত্মার উপজীবিকা। শুষ্ক বিজ্ঞানের মরুভূমি আত্মার পক্ষে এমনি দারুণ কষ্টকর স্থান যে, সেখানে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অধিক কাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না। অন্ধ বিশ্বাসের তুষ্টি হইতে উত্থান করিয়া যাঁহারা ঐরূপ ছিন্নমূল শুষ্ক বিজ্ঞানের তুষ্টিতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ান হইয়াছেন, তাঁহারা আবার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের তুষ্টিতে ফিরিয়া শয়ন করিয়া তবুও যেন কিয়ৎপরিমাণে শান্তি উপভোগ করেন; কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত শান্তি লাভে কৃতকার্য্য হ'ন না। শুষ্ক বিজ্ঞানে তাঁহারা আত্মাতে শান্তি পা'ন নাই বলিয়া তাঁহারা একেবারেই এইরূপ এক তীব্র সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, জ্ঞান কিছুই নহে—অন্ধ ভক্তিই সর্ব্বস্ব। ঈশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়াছেন বলিয়া মনুষ্য ঈশ্বরকে জানিবার অধিকারী—সেই জ্ঞানের অবমাননা করিয়া যিনি লোকের বিশ্বাস অনুসারে আপনার বিশ্বাসকে নিয়মিত করেন, তিনি কেমন করিয়া ঈশ্বরলাভে কৃতকার্য্য হইবেন? যিনি জড়-দেহ-বিশেষকে ঈশ্বরমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি কিরূপে ঈশ্বরের চিন্ময় আনন্দময় আত্মমূর্ত্তি আত্মাতে অবলোকন করিবেন? শ্যাম বা গৌর—বা নীল বা পীত—জড়-রূপের এই সকল বিশেষণ কেমন করিয়া সচ্চিদানন্দ রূপের বিশেষণ হইবে?—কার্য্যের জন্য সত্যই আবশ্যক—মিথ্যা কেবল ভুলাইবার জন্যই আবশ্যক হইতে পারে। সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার উপাসনাই ঈশ্বরোপাসনা। যথার্থ আন্তরিক সত্যের পথই সিদ্ধি-লাভের একমাত্র পথ, বিশ্বাস মৃগতৃষ্ণিকায় আত্মার পিপাসা নিবৃত্তি করিতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা।

ঘোরতর বিষাদের অন্ধকারে [illegible] হইলেও প্রকৃত সাধক ওরূপ কোন অলীক প্রথা অবলম্বন করেন না। তিনি [illegible] বাদের তুষ্টি অবলম্বন [illegible] ঢালিয়া যা'ন না,—[illegible] হস্তে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া ভ্রমাবর্ত্তে [illegible] না,—বিজ্ঞানের খদ্যোত [illegible]

বাড়াইবার জন্য তাহাকে লইয়া জ্ঞান সূর্য্য-হীন সংশয়-গহ্বরে প্রবেশ করেন না,—তিনি ঐ তিন প্রকার তুষ্টির কোনটি-কেই অবলম্বন করেন না—পরমাত্মাকেই অবলম্বন করেন। পূর্ণতার আদর্শ যাহা তাঁহার প্রাণাভ্যন্তরে জাগিতেছে তাহার আলোকে তিনি আপনার ক্ষুদ্রতা যতই কেন হৃদয়ঙ্গম করুন না, ততই আরো তিনি পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মার সাক্ষী ও আশ্রয়দাতা রূপে অবলম্বন করেন ; তখন, আত্মার সমস্ত হৃদ্গত বাসনা ও সমস্ত অভাব যন্ত্রণা এক সেই পরমাত্মা-রই আশ্রয়-প্রার্থনা রূপে পরিণত হয় ; এবং সেই আন্তরিক প্রার্থনার উত্তরে—চাতক পক্ষীর ক্রন্দনে যেমন মেঘ সত্বর আবির্ভূত হয় সেইরূপ—সমস্ত জগতের অবলম্ব এক অদ্বিতীয় ধ্রুব সত্য, সমস্ত অন্ধকারের আলোক চেতনের চেতন, সমস্ত অভাবের পূরণকর্ত্তা প্রাণের প্রাণ, পরমাত্মা আত্মাতে দর্শন দিয়া তাঁহার সমস্ত অজ্ঞান মোচন করেন। সাধকের জ্ঞান নেত্রে তখন সমস্ত প্রহেলিকার ভঞ্জন হইয়া গিয়া সর্ব্বত্রই তিনি সত্য উপলব্ধি করেন—তখন ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ—হৃদয়গ্রন্থি ভগ্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয়-পাশ ছিন্ন হইয়া যায়। সর্ব্ব মূলাধার পরমাত্মাই জ্ঞানের ধ্রুব সত্য—আত্মার ধ্রুব অবলম্বন ;—আত্মা যদি তাঁহার আশ্রয়ে বঞ্চিত হয়, তবে তাহার নিকটে প্রখর বিজ্ঞানও যেমন—মূঢ় বিশ্বাসও তেমনি—উভয়ের কেহই তাহাকে শান্তি দিতে পারে না,—সাধক যখন জ্ঞান-প্রসাদে শুদ্ধসত্ব হইয়া জাগ্রত পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন, তখনই তিনি শান্তিলাভ করেন; শান্তিলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

তমাত্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের জ্ঞানের ধ্রুব সত্য—এখনো তুমি আমাদের জীবনের অবলম্বন এবং যখন আমাদের ইহ-জীবন অবসান হইবে তখনও তুমি আমাদের জীবনের অবলম্বন ; তুমি যেমন অটল ধ্রুব সত্য—সেইরূপ আমাদের আত্মাকে সত্যে অটল কর—ধর্ম্মে অটল কর—প্রেমানন্দে অটল কর। তুমি আমাদের অটল আশ্রয় হইয়া সমস্ত অন্ধকার—সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিয়া দেও যাহাতে আমরা তোমার সহবাসের অমৃত নিকেতনে বাস করিতে পারি, আমাদের আত্মাতে তাহার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেও। শিশু যেমন পিতার সন্নিধানে গমন করিয়া বল পায়—ভরসা পায়,—অভয় পায়, সেইরূপ তোমার সন্নিধানে আমাদের আত্মা সমস্ত পাপ তাপ ও সংসার-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া অমৃত আনন্দ উপভোগ করিবে ইহারই জন্য আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি। তুমি দর্শন দিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভারতের দীক্ষা ও গুরু।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ ও পাপক্ষয় হয় তাহাই দীক্ষা[১]। মনুষ্যের এমন একটী সময় আইসে যখন ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য বাস্তবিকই তাঁহার মন ব্যাকুল হয়। প্রকৃত ধর্ম্ম কি, ঈশ্বরই বা কিরূপে জ্ঞানে প্রত্যক্ষ হইতে পারেন ইহা জানিবার জন্য সে অস্থির হয়। সেই সময় দীক্ষার আবশ্যকতা। ফলত ইহা সাধনের পূর্ব্বকল্প এবং মনের একটী অবস্থা মাত্র। জপই বল, তপই বল, সমস্তই এই দীক্ষামূলক। মনুষ্য যে আশ্রমে থাক্ ইহা তাঁহার পক্ষে অবলম্বনীয়। কিন্তু এই দীক্ষা সংস্কারের মধ্যে গণ্য নয়,

১ দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ।

অথচ যে অর্থে সংস্কার শব্দ ব্যবহৃত হয় দীক্ষাতে তাহার কিছুমাত্র ব্যভিচার নাই। ফলত প্রাচীন গ্রন্থে যে ইহা সংস্কারের মধ্যে পরিগৃহীত হয় নাই তদ্দারা ইহার আধুনিকতাই সপ্রমাণ হয়।

সংস্কার দ্বিবিধ বৈদিক ও স্মার্ত্ত। অতি প্রাচীন কালে ইহার সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ পরে পঁচিশ দাঁড়ায়*। কিন্তু ভবদেব পশুপতি প্রভৃতি দশটী মাত্রে পরিণত করেন। এই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে দীক্ষা নাই। পূর্ব্বকার নিয়ম ছিল শিষ্য গুরুর নিকট যাইত। বিদ্বান গুরু সেই উপাস্য শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেন। ইহা জ্ঞানালোচনা মাত্র। উপনয়নের সময় ইহা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে যে দীক্ষা প্রচলিত তাহা এ প্রণালীর নহে। গুরুপূজা ও গুরুর নিকট একটী দুর্জ্ঞেয় বীজমন্ত্র গ্রহণ ইহাই দীক্ষা। এই দীক্ষা বেদ ও স্মৃতিতে নাই। ইহা আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত। এখনকার দীক্ষা যাই হউক কিন্তু ইহার মূল উদ্দেশ্য অতি মহৎ। একটী শুভদিনে পবিত্র মনে সদ্গুরুর নিকট জীবনের চির সহচরী স্ত্রীর সহিত এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম, বিবাহ-বন্ধন যে একত্র আনিয়া ছিল ইহা তাহা আরও দৃঢ় করিয়া দিল ইহা অতি গুরুতর পবিত্র কার্য্য। এই রূপ বাহ্য অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য যে অনুরাগ সন্ধুক্ষিত হয় তাহা অতি শুভ। কে ইহা অস্বীকার করিবে।

মনুষ্য অপূর্ণ তাহার মেধা ও বুদ্ধি আছে অথচ সে সকল বিষয় ধারণা ও সকল বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আছে কিন্তু তাহার গন্তব্য পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখন তবে কি বুঝিব যে এইরূপ জটিল দশাজালে জড়িত ও মুহ্যমান থাকিবার জন্যই মনুষ্যের সৃষ্টি? না, তাহা নহে। মনুষ্য স্বাভাবিক। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্র তাহার অবশ্যই স্বাধীন কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করা অনেকটা অবস্থা সাপেক্ষ। এই অবস্থাও আবার সমাজের তারতম্যানুসারে গঠিত হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় সত্য যে একজন অসভ্য বর্ব্বরেরও অন্তরে জ্ঞানের বীজ আছে কিন্তু উহা যে প্রায়ই প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পায় না ইহার কারণ তাহার সমাজ ও অবস্থা। সে যেরূপ বিষবায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস লয় তাহাতে ঐ বীজ এককালে নষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। আবার বিপরীত দিকটাও দেখ। সেই জ্ঞানের বীজ অনুকূল অবস্থা ও সমাজের গুণে কেমন সহজে ফলবৎ হইয়া থাকে। উহসিদ্ধি অর্থাৎ উপদেশ ব্যতিরেকেও যে জ্ঞানপ্রাপ্তি তাহা এই অনুকূল অবস্থারই আয়ত্ত। বস্তুত জ্ঞানলাভ যে অবস্থা-সাপেক্ষ কোন কালেই এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। ইহা আজ আছে কাল আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু অনুকূল অবস্থার গুণেই যে জ্ঞানের অপূর্ণতা দূর হয় এরূপও মনে করিও না। যতই যাও সম্মুখের একটা অন্ধকার চির দিনই থাকিয়া যাইবে। তবে তোমার হস্তের আলোক যতটুকু তাহার গাঢ়তা নষ্ট করিয়া ক্ষীণ করিতে পারে এই লাভ।

শাস্ত্রে এই জ্ঞানগত পার্থক্যে অধিকারভেদ প্রতিষ্ঠিত। এবং এই অধিকার-কল্পনায় স্থূল ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঋষিরা স্থূল ধর্ম্মকে মুক্তিপ্রদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ধর্ম্মশূন্য জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতিরূপও বরং ভাল এই উদ্দেশে স্থূল ধর্ম্মের সৃষ্টি। কিন্তু জীবের প্রয়োজন পুরুষার্থ মুক্তি। [illegible] তাহারই জন্য প্রস্তুত হও। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর লাভের মূল অনুরাগ থাকিলে তাহা তোমার দুর্লভ হইবে না। মুক্তিদ্বার সকলেরই জন্য

* স্মৃতি অষ্টম ভাগ সংস্কারতত্ত্ব দেখ।

অপাবৃত। যাঁহার পুরুষকার তাঁহারই তন্মধ্যে প্রবেশে অধিকার আছে। এই পৌরুষের সহায় স্বয়ং ঈশ্বর। পুরুষকারকে সঙ্কুচিত করিবার জনাই অনুরাগ। ঋষিরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এইটা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন স্থূলে মুক্তি নাই, ইহা মনুষ্যের অদ্ভুত খেলা। [illegible] পথে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। [illegible] নির্ভর হইয়া কিন্তু ইহার উপর [illegible]। তুমি চেষ্টা কর, যেমন শক্তি [illegible] প্রকৃত ধর্ম্মের [illegible] হইতে পারিবে [illegible]। [illegible] কার্য্যে [illegible] কোন কথা নাই। [illegible]

[illegible]

[illegible] সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য পুরুষপ্রধান। [illegible] সূক্ষ্ম। যদি সকলে সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ সূক্ষ্ম [illegible] চিন্তা ধারণা করিতে না পারে তাহা হইলে [illegible] ব্যাপক অথচ [illegible] অভ্যস্ত করিয়া ক্রমশঃ [illegible] ব্যাপক [illegible] সূক্ষ্ম পদার্থে সমাধি অভ্যাস করুক। এইরূপ করিতে যাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আর নাই সেই [illegible] ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে। এই জন্য ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু আকাশ প্রভৃতি ভূতে পর পর চিত্তের ধারণা করিবার জন্য স্পষ্ট উপদেশ আছে। যাঁহারা একবারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মে সমাধি করিতে পারেন শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠাধিকারী বলেন। ভূতে চিত্তের ধারণা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের জন্য সৌকর্য্যার্থ জন্য। পরে তাঁহারা আবার ভাবিলেন স্থূল ও স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আকাশ পর্য্যন্ত

উপদেশ দিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয় বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে এরূপ গুরু বিরল। থাকিলে হিন্দুধর্ম্মের আজ এত দুর্দ্দশা হইত না।

[illegible] অভ্যাস হয় [illegible] তাহাদের [illegible] অভ্যস্ত হইবার উপায় কি। তখন [illegible] [illegible]। কহিলেন [illegible] হইতে [illegible] দীপবৎ [illegible] ধ্যান [illegible]। এইটি [illegible] উপদেশ। ইহাতেও যদি অসমর্থ হয় [illegible] অক্ষম হয় তবেই [illegible] [illegible] না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে [illegible] প্রাচীন ঋষিদিগের [illegible] লক্ষ্য [illegible] তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিয়াছেন এতৎ [illegible] আর [illegible] নাই। [illegible] পুরুষধ্যান সুগম হই- [illegible] তান্ত্রিক ও পৌরাণিকেরা [illegible] করিয়া দিলেন। [illegible] এই [illegible] তান্ত্রিক। [illegible] এবং [illegible] ও পদ্মে [illegible] এই [illegible] ধ্যান [illegible] ইত্যাদি ভাব [illegible] আবশ্যক [illegible] পৌছিবে [illegible] লক্ষ্য থাকিল [illegible] অভ্যস্ত হইবার দিকে [illegible] হয় যে মুক্তি [illegible] আর [illegible] তাঁহার [illegible] এবং [illegible] এমন বিড়ম্বনা রাখিল তোমার [illegible] এই [illegible] ব্যবস্থা। সত্য স্থলে মুক্তি নাই। [illegible] স্থূলকার [illegible] যোগ [illegible] শাস্ত্রে অজ্ঞানী বিভাগ [illegible] মূর্ত্তিধ্যানে মুক্তি নাই। [illegible] উত্তম [illegible]। আমরা এই [illegible] প্রমাণ [illegible] দিলাম।

[illegible] বক্ষ্যে [illegible] শ্রী- [illegible] নামশক্তিং [illegible] চতুর্ব্বিংশতি [illegible] চিন্তয়েৎ ॥ নির্গুণং [illegible] সর্ব্বতঃপাণিপাদং সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং সর্ব্ব [illegible] নিরাক্রিয়ম্। এতৎ ধ্যায়েৎ। ধ্যানমিতস্ত চ [illegible] যোগাবিতীতং [illegible]। [illegible] নিরাকারে লক্ষ্য [illegible] শক্তোতি [illegible] বায়ুকাশমনো- [illegible] পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধারণাত্র [illegible]

[illegible] সম্বন্ধে যাহা কহিলাম গুরুর লক্ষণও তাহাই প্রকাশ। লোক সকল অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, অর্থাৎ অনেকে যে লোষ্ট্রে ঈশ্বর জ্ঞান করে যিনি উল্লিখিত রূপ জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ঈশ্বরনিষ্ঠ করিয়া দেন তিনিই গুরু১। ইহাই গুরুর স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্ম অশ্রেষ্ঠ লোকের দ্বারা উক্ত হইলে বহু চিন্তায়ও সুজ্ঞেয় হয় না২ এই জন্য গুরুর সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ, [illegible] শুচি ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক। ইহাঁর কার্য্য শিষ্যকে সম্যক প্রবোধিত করা। যিনি তদ্বিষয়ে অক্ষম [illegible] কৃত পাপ যেমন রাজাকে অমাত্যকৃত পাপ যেমন পতিকে [illegible] শিষ্যকৃত পাপ তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহাঁর দায়িত্ব অনেক। এখনকার ন্যায় তখন যে সে লোক মনে করিলেই গুরু হইতে পারিত না। গুরুর গৃহী হওয়া আবশ্যক। তন্ত্রশাস্ত্রে উদাসীনের শিষ্যস্বীকার [illegible]। উদাসীনের গার্হস্থ্যের উপর [illegible] কিন্তু গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা করা আবশ্যক। [illegible] ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে পারে। পূর্ব্বকালে মধ্যদেশ কুরুক্ষেত্র ও অবন্তী প্রভৃতি দেশে উত্তম গুরু, গৌড় মাগধ ও কেরল প্রভৃতি দেশে মধ্যম গুরু এবং কর্ণাট কলিঙ্গ ও কাম্বোজ প্রভৃতি দেশে অধম গুরু মিলিত৩ ৩ লোকে এই সকল স্থল হইতে গুরু-নির্ব্বাচন করিয়া লইত।

এক্ষণে একটী কথা উঠিতেছে। দীক্ষা ও গুরু ধর্ম্মসাধনের পক্ষে কি নিতান্তই প্রয়োজন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞানের জন্য গুরু চাই কিন্তু আবার এরূপও দেখা যাইতেছে যে গুরু যদি না পাইলে সাধক বটপত্রে কুঙ্কুম-রস দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া স্বয়ংই দীক্ষিত হইতে পারেন৪। এস্থলে তো সাধক আপনিই আপনার গুরু। আর এক স্থানে আছে মনুষ্য কখনই গুরু হইতে পারে না। গুরু কেবল কল্পনা মাত্র। আর দীক্ষাও বৃক্ষাদিতে পূজার ন্যায় নিরর্থক ৫। আর এক স্থানে আছে মনুষ্যকে গুরু ভাবিলে কখনই মুক্তি হয় না৬। এই সমস্ত তো বিরুদ্ধবাদ কিন্তু এই গুলি কি শাস্ত্রের অর্থবাদ? না তাহা নহে। ইহার সিদ্ধান্ত আছে। দীক্ষায় মনের একটা অবস্থান্তর হয়, ইহা ধর্ম্ম সাধ-

---

[illegible] সম্যক্ প্রবোধয়েৎ। এবং গুরুঃ [illegible] ভেত। অন্যথা [illegible] মধ্যে দীপ্যমানম্ [illegible]। তত্ত্বমসি [illegible] ভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং [illegible] শ্রীবৎসাঙ্কং [illegible] চক্রগদাপদ্মধরং চরণ মধ্যগং [illegible] ধ্যানযুক্তম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন [illegible] অবশ্যং ধ্যায়েৎ। ন চ পুরুষং [illegible]। তং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি।

* * * *

ইত্যেবমুক্তা [illegible] শিরসা চ নমস্কারঃ কৃতো বা। ভগবন্তং [illegible] পৃথিবী মহাভূতানি [illegible] আকাশঃ শব্দরূপী বায়ুশ্চ [illegible] তেজশ্চ [illegible] ভগবৎ পাদমধ্যে পরিবর্ত্তিনী [illegible]। [illegible]।

১ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

২ ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
কঠ।

৩ মধ্যদেশ কুরুক্ষেত্র [illegible] জনসম্ভবাঃ
অন্তর্বেদি প্রতিষ্ঠানা আবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ।
[illegible] সৌরা মাগধাঃ কেরলাস্তথা
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ।
কর্ণাট নর্ম্মদারেবা কচ্ছতীরোদ্ভবাস্তথা
কালিঙ্গাশ্চ কলম্বাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ।
জাবাল।

৪ বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভং
[illegible] শুদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা বিফলং ভবেৎ।
ইত্যন্ত সদ্গুরোরভাবে।
যোগিনী তন্ত্র।

৫ [illegible] গুরুর্নৈব মনুজঃ [illegible] কল্পনা
দীক্ষাদৌ সাধকানাঞ্চ [illegible] পূজনং তথা।
কামাখ্যাতন্ত্র।

৬ [illegible] মহেশানি [illegible] গুরু
মানুষে গুরুতা দেবি [illegible]
মোক্ষো ন জায়তে দেবি [illegible]।
[illegible] তৃতীয় পটল।

নের মনেই মধ্যে একটা জ্বলন্ত উৎসাহ আনিয়া দেয় কিন্তু যিনি ধর্ম্ম ও ঈশ্বর ভিন্ন আর গতি নাই এরূপ বুঝিয়াছেন, যাঁহার মনে সাধনের উৎসাহ স্বতই প্রদীপ্ত হইতেছে তাঁহার পক্ষে দীক্ষার আর আবশ্যকতা কি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মানবসমাজে দুই প্রকার লোক আছে। এক জন অবস্থা বৈগুণ্যে এক প্রকার অজ্ঞ আর এক জন অবস্থাগুণে ব্যুৎপন্নচেতা। এই দুই প্রকার লোকের অধিকারভেদ প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে তদ্রোক্ত এই শ্লোকের বাক্যের সিদ্ধান্ত এই যে যাহারা অজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত তাহাদেরই গুরুর প্রয়োজন। আর যাহারা ব্যুৎপন্নচেতা অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ তাহারা আপনারাই জ্ঞানলাভের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ১। এস্থলে গুরু নিষ্প্রয়োজন।

এখন স্থির হইল গুরুকে গুরু করা আর না করা আমাদের আয়ত্ত। আবশ্যক হয় করিলাম না হয় করিলাম না। কিন্তু মনুষ্য অজ্ঞই হউক আর ব্যুৎপন্নচেতা আমিই বল উভয়েই তো ভ্রম প্রমাদের বশীভূত। তবে কি আমরা ধর্ম্মপথে অন্ধের ন্যায় চলিয়াছি এবং অন্ধের ন্যায় নীয়মান হইতেছি। ঈশ্বর আমাকে ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল দিয়াছেন, এবিষয়ে আমার কোন অভাব নাই কিন্তু যাহা আমার জীবনের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন তিনি কি সেই বিষয়েই আমায় অন্ধকারে ফেলিয়াছেন? না, ইহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে ভ্রম প্রমাদের বশীভূত ইহা অবশ্যই সত্য। ঈশ্বর আমাদিগকে যে ধূলিমুষ্টি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা তিনি জানেন। আমাদের সম্মুখের আলোক অস্পষ্ট এবং অন্ধকার প্রগাঢ় ইহাও তিনি জানেন। জানিয়াই তিনি তোমার হৃদয়ে চৈত্ত্য আচার্য্য হইয়া আছেন২। তুমি যেখানে যাবে জ্ঞান চর্চ্চা কর সেখানে অন্ধকার সেই খানেই এই চৈত্ত্য আচার্য্য তোমার সহায়ক। তিনি তোমার চিত্তে শান্তির আলোক প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু চিত্তের সে এই দৈববাণী ইহা কে শুনিতে পায়? তুমি আমি হরিহর রামভদ্র আমরা সকলেই শুনিতে পাই, কেবল অভাব শুশ্রূষার। ফলত মন প্রধান হইয়া শুশ্রূষা থাকিলে সকলেই এই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পায়। তখন ভ্রমবাদ ভেদবাদ আর কিছুই থাকে না। পরতত্ত্ব হৃদয়ে অন্তর্নিহিত অজ্ঞান দূরে পলায়ন করে। ইহাতেই আমাদের শান্তি এবং ইহাতেই মুক্তি।

বস্তু-গুণ-তত্ত্ব।

বস্তু-গুণ-তত্ত্ব সমুদ্রবিশেষ। সেখানে অনেক বড় বড় জাহাজ অনেকবার জলমগ্ন হইয়াছে। আমরা আমাদের সম্বলীয় অ-বল-সুলভ একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে করিয়া সেই সঙ্কটাপন্ন স্থানে একবার বেড়াইয়া আসিতে ইচ্ছা করি,—ইহাতে বিপদাশঙ্কার কোন কারণ দেখি না; জাহাজ যে, গুপ্ত শৈলে ঠেকিয়া বিপদে পড়িয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই,—একে সে অকূল জল-পথ দিয়া চলে—সে পথ চেনা দুষ্কর, তাহাতে আবার গভীর জল কাটিয়া চলে, বিপদে পড়া তাহার পক্ষে কঠিন নহে;

---

১ অস্মিন সংসারসংরক্তে জাতানাং দেহধারিণাং
অপবর্গকারী রাম ব্যবিমাধুত্তমক্রমৌ।
একস্তাবৎ গুরুঃ শ্রোকালতুল্যানাচ্চৈনঃ শনৈঃ
জন্মনা জন্মভির্বাপি সিদ্ধিদঃ সমুদাহৃতঃ
দ্বিতীয়ঃ স্বাত্মনৈবাশু কিঞ্চিদ্ব্যুৎপন্নচেতসঃ
ভবতি আত্মনা আত্মাকাশ মর্য্যাদাবৎ।

যোগবাশিষ্ঠ।

২ আচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

ভাগবত ১১ স্কন্ধ।

৩ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। শ্রুতি।

আমাদের ডিঙি এক-তো কিনারা কিনারা দিয়া চলিবে—তাহাতে আবার উপর উপর ভাবিয়া চলিবে—আমাদের কিসের ভয়? কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং"

মোহের কুহকে পড়িয়া দুস্তর সাগর ভেলায় পার হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

তিনি এরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা কূলের কাছ দিয়া চলিব—আমাদের মুখে ওরূপ কথা ভাল শুনায় না। আমরা যখন যে-কোন দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিব, তখন তাহার একটি-না-একটি সহজ-বোধ্য স্থূল দৃষ্টান্ত সামনে রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিব—ইহারই নাম কূলের কাছ দিয়া চলা। এরূপ করিলে দিক্-ভ্রম হইতে আর আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।

বস্তুর একটি পুরাতন দার্শনিক দৃষ্টান্ত—ঘট, তাহাই আমরা এখানে শিরোধার্য্য করিলাম। একটি ঘট ভাবো; তাহার পর, মেটে রঙ, সোঁদা গন্ধ, ভঙ্গুরতা, এই গুণগুলি তাহাতে জুড়িয়া দেও; তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, ঐ ঘটটি মৃদ্‌ঘট। দেখ ঐ তিনটি গুণের সংযোগে সাধারণ ঘট একটি বিশেষ প্রকারের ঘট হইয়া দাঁড়াইল। গুণের সংযোগ দ্বারা বস্তুর ঐরূপ বিশেষত্ব সাধিত হয় বলিয়া গুণের আর এক নাম বিশেষণ। গুণ বস্তুকে বিশেষিত করে, যে বস্তুতে যত অধিক গুণের আরোপ করিবে সে বস্তু ততই বিশেষিত হইবে;—ঘটে যদি মৃদ্‌গুণ আরোপ কর, তবে তাহা বিশেষ প্রকারের ঘট হইবে—মৃণ্ময় ঘট হইবে; মৃদ্‌ঘটে যদি চিক্কণতা-গুণ আরোপ কর, তবে ঘট আরো অধিক বিশেষিত হইবে—শুধু কেবল মৃদ্‌ঘট হইয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, কিন্তু বিশেষ এক প্রকারের মৃদ্‌ঘট হইবে—চিক্কণ মৃদ্‌ঘট হইবে। চিক্কণ মৃদ্‌ঘটে যদি শ্যামবর্ণ গুণ আরোপ কর, তবে ঘট আরো অধিক বিশেষিত হইবে—চিক্কণ মৃদ্‌ঘট মাত্রে ক্ষান্ত না থাকিয়া শ্যামবর্ণ চিক্কণ মৃদ্‌ঘট হইবে। এইরূপ করিয়া বস্তুর উপর যতই গুণ চড়াইবে ততই তাহা বিশেষিত হইয়া পড়িবে। এই জন্যই গুণের নাম বিশেষণ। কেহ যদি বলে যে, "মনুষ্য এত নির্ঘৃণ হইতে পারে না যে, সে মনুষ্য ভক্ষণ করিবে" তবে তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, এস্থলে মনুষ্যকে "সভ্য" বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা উচিত,—ইহাই বলা উচিত যে "সভ্য মনুষ্য এত নির্ঘৃণ হইতে পারে না যে, সে মনুষ্য ভক্ষণ করিবে" কেননা অসভ্য-মনুষ্য-কর্ত্তৃক ওরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয় এমন নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপ্তি নির্দ্ধারণের সময়েই গুণকে আমরা বিশেষণ বলি; কিন্তু যখন উপস্থিত কোন একটি বস্তুর কোন-একটি গুণ দেখিয়া তাহার জাতি-নিরূপণ করিতে যাই, তখন গুণকে আমরা বলি—লক্ষণ; যদি বলা যায় যে, "এ সর্পটা গোখুরা নয়, কিন্তু কেউটিয়া, কেননা ইহার গায়ের রঙ কালো দেখিতেছি" তবে এখানকার এই কৃষ্ণবর্ণ-গুণ লক্ষণ শব্দের বাচ্য। অতএব গুণের আর এক নাম লক্ষণ।

মনে কর, তোমার সম্মুখে রৌপ্য ঘট, কাংস্য ঘট, মৃদ্‌ঘট প্রভৃতি নানা প্রকারের ঘট সাজানো রহিয়াছে, তাহার মধ্যস্থিত একটি মৃণ্ময় ঘটে তোমার দৃষ্টি পড়িল,—ঘটের মৃণ্ময়তা-গুণ তোমার লক্ষ্য আকর্ষণ করিল। গুণ ঐরূপ লক্ষ্য আকর্ষণ করে বলিয়া তাহার নাম লক্ষণ। তুমি করিলে কি?—না, মৃণ্ময় ঘটের প্রতি লক্ষ্য... মৃণ্ময় ঘটের প্রতি লক্ষ্য...

পদ্ধতি ইহার নাম—অন্বয়-পদ্ধতি; কিন্তু মৃদ্ঘটের প্রতি লক্ষ্য-সন্ধান করিতে হইলে কাংস্যাদি আর আর ঘট হইতে লক্ষ্য টানিয়া লওয়া আবশ্যক,—লক্ষ্য টানিয়া লইবার এই যে পদ্ধতি ইহার নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি। মনে কর যে, লক্ষিত ঘটটি শুধু-যে-কেবল মৃন্ময় ঘট তাহা নহে, কিন্তু আরো এই যে, তাহা চিক্কণ মৃন্ময় ঘট; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মৃন্ময় ঘট-গুলির মধ্যে যে-গুলি চিক্কণ নহে সে-গুলি ব্যতিরেক-পদ্ধতি অনুসারে তোমার লক্ষ্য হইতে বাহির হইয়াছে, আর, অন্বয়-পদ্ধতি-অনুসারে চিক্কণ ঘটতায় মৃদ্ঘটে তোমার লক্ষ্য সমাহিত হইয়াছে। এইরূপ, অন্বয় ব্যতিরেক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদের লক্ষ্য উত্তরোত্তর-ক্রমে বিশেষ হইতে বিশেষে সমাহিত হয়। গুণ সাধারণ বস্তুকে বিশেষিত করে, এই অর্থে বিশেষণ; ও বিশেষ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য-সন্ধানের সহায়তা করে এই অর্থে লক্ষণ।

আমরা যখন যে-কোন বস্তু ভাবনা করি, তাহাকেই আমরা এক-ব-প্রকার লক্ষণ-বিশিষ্ট বলিয়া ভাবনা করি। ঘটের কোন লক্ষণ উল্লেখ না করিয়া শুধু যদি বলি—“ঘট”, তাহা হইলেই বুঝায় যে, তাহার উদর মণ্ডলাকৃতি ও তাহার গলদেশ চক্রাকৃতি। যে-ঘটের উদর মণ্ডলাকৃতি নহে তাহাকে আমরা ঘটই বলি না। ঘটের যদি উজ্জ্বলতা-লক্ষণ মলিনতায় পর্য্যবসিত হয়, তথাপি উহাকে আমরা ঘট-ভিন্ন আর কিছুই বলিব না, কিন্তু যদি ঘটের উদর মণ্ডলাকৃতি-লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া চোঙার আকার ধারণ করে তবে তখন আর তাহাকে ঘট বলিব না, তাহাকে বলিব—“গ্লাস্”। অগ্নির যতক্ষণ উত্তাপ ও দীপ্তি থাকে ততক্ষণ তাহাকে অগ্নি বলা সাজে,—অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অগ্নি বলা-না-বলা সমান। অগ্নিকে যদি তাহার উষ্ণতা-গুণ কিম্বা দাহিকা-শক্তি হইতে পৃথক করিয়া ফেলা যায়, তবে তাহার অগ্নিত্বই থাকে না। অগ্নি বলিলেই যেমন বুঝায় যে, তাহার আলোক এবং উত্তাপ আছে, আত্মা বলিলেই সেইরূপ বুঝায় যে, তাহার জ্ঞান এবং প্রেম আছে; অথচ কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত ইঙ্গিত-স্থলে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে ছাড়েন না যে, আত্মা নির্গুণ। আত্মার যদি জ্ঞান-প্রেম না থাকে, তবে তাহাকে জড় বলিলেই তো হয়—আত্মা বলিয়া নিরর্থক শব্দ-সংখ্যা বাড়াইবার আবশ্যকতা কি? নির্গুণ বস্তু কে কবে দেখিয়াছে—শুনিয়াছে—বা স্পর্শ করিয়াছে? নির্গুণ বস্তুর উপলব্ধি দেবতারও অসাধ্য! এই কাগজ-খানির এ-পিট্ দেখিয়া তবেই আমরা বলি যে, ইহার ও-পিট্ আছে; সেইরূপ গুণ দেখিলে তবেই আমরা বলি যে, তাহার মূলে বস্তু আছে—নচেৎ আমরা বস্তু-শব্দের উল্লেখই করি না। দেয়ালের কাঠিন্য গুণ ও শ্বেতবর্ণ আকৃতি দেখিয়া তবে আমরা তাহার সত্তা (কিনা বস্তুত্ব) উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমরা যখন যে-কোন বস্তুর নামোল্লেখ করি, তখনই আমরা সেই বস্তুকে এমন একটি (বা এমন কয়েকটি) লক্ষণের সহিত জড়িত বলিয়া ভাবনা করি যে, সেই একটি লক্ষণ (বা সেই কয়টি লক্ষণ) সে বস্তুর পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক (যেমন দীপাগ্নির পক্ষে উত্তাপ এবং আলোক নিতান্তই আবশ্যক); সে বস্তুর আর আর লক্ষণের যত ইচ্ছা তত পরিবর্ত্তন হউক্ না কেন, কিন্তু সে-একটি লক্ষণের (বা সে-কয়টি লক্ষণের) পরিবর্ত্তন হইলে চলিবে না; দীপালোক রক্তবর্ণ-লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া শ্বেত-বর্ণ-লক্ষণ ধারণ করিলেও তাহাকে আমরা দীপালোক বলিব, কিন্তু তাহা দীপ্তি-লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের লক্ষণ ধারণ

করিলে—আর তাহাকে আমরা "দীপালোক" বলিতে পারিব না। যে-একটি (বা যে-কয়টি) লক্ষণকে স্থির রূপে ধরিয়া থাকা যে বস্তুর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—সেই একটি লক্ষণ (বা সেই কয়টি লক্ষণ) সেই বস্তুর ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। পশুর ধর্ম্ম কি? না পশুত্ব; পশুত্ব কি? না চতুষ্পদত্ব জীবত্ব মুচত্ব এইরূপ কতকগুলি লক্ষণের সমষ্টি; পশু হইতে গেলে মুচত্বও চাই, জীবত্বও চাই, চতুষ্পদত্বও চাই; কিন্তু গোত্ব লক্ষণ পশুর ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইতে পারে না; কেননা পশুর গোত্ব না থাকিলেও চলে, এমন অনেক পশু আছে যাহার গোত্ব নাই,—অশ্বের গোত্ব নাই। গোত্ব যদিও পশুর ধর্ম্ম নহে—কিন্তু উহা গরুর ধর্ম্ম তাহাতে আর সংশয় নাই; গোত্ব কি? না দ্বিখণ্ডিত খুর, রোমন্থন-পটুত্ব, গ্রীবা মূলের উচ্চতা, পশুত্ব, ইত্যাদি লক্ষণের সমষ্টি। কিন্তু কপিল-বর্ণত্ব লক্ষণ গরুর ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইতে পারে না—কেননা গরু শ্বেত-বর্ণও হইতে পারে—কৃষ্ণবর্ণও হইতে পারে—নানা বর্ণের নানা গরু বিদ্যমান থাকিতে পারে। তোমাকে যদি বলি—"পশু ভাবো" তবে তুমি হয় তো একটা গরু ভাবিবে, তাহা হইলেই পশুত্ব লক্ষণের সহিত গোত্ব লক্ষণ বাধিয়া যাইবে,—না হয় তো তুমি একটা ঘোড়া ভাবিবে, তাহা-হইলে পশুত্ব লক্ষণের সহিত অশ্বত্ব লক্ষণ বাধিয়া যাইবে,—না হয় তো একটা হাতি ভাবিবে, তাহা হইলে পশুত্ব-লক্ষণের সহিত হস্তিত্ব-লক্ষণ বাধিয়া যাইবে; ইহার মধ্যে পশুত্ব লক্ষণ টিই অপরিবর্ত্তনীয়, গোত্ব-প্রভৃতি লক্ষণ-গুলি পরিবর্ত্তনীয়; কেন না তোমাকে পশু ভাবিতে বলিলে, তুমি গরুর পরিবর্ত্তে ঘোড়া ভাবিতে পার—ঘোড়ার পরিবর্ত্তে হাতি ভাবিতে পার—মনোমধ্যে নানাবিধ পশুর ওলট্‌ পালট্‌ করিতে পার—তাহাতে কিছু মাত্র বাধা নাই; কিন্তু সেরূপ করিয়া তুমি পশুর পরিবর্ত্তে পাখী ভাবিতে পার না,—তুমি যখন কথা দিয়াছ যে, তুমি পশু ভাবিবে, তখন তাহার তুমি অন্যথা করিতে পার না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পশুর পক্ষে পশুত্ব-লক্ষণ (চতুষ্পদত্ব, মুচত্ব ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ) অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু গোত্ব, অশ্বত্ব প্রভৃতি লক্ষণ-গুলি পরিবর্ত্তনীয়। তেমনি আবার, গরুর পক্ষে গোত্ব লক্ষণ অপরিবর্ত্তনীয়; শ্বেতত্ব, কপিলত্ব প্রভৃতি লক্ষণ-গুলি পরিবর্ত্তনীয়। পুনশ্চ, জীবের পক্ষে জীবত্ব-লক্ষণ (অর্থাৎ চেতন-বত্ত, ও দেহবত্তা প্রভৃতি লক্ষণ) অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু পশুত্ব পাখিত্ব প্রভৃতি লক্ষণ-গুলি পরিবর্ত্তনীয়। আমরা যে-কোন বস্তু ভাবি না কেন—একদিকে যেমন আমরা তাহার অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ-গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হই—আর-এক দিকে তেমনি তাহার কোন না-কোন পরিবর্ত্তনীয় লক্ষণের প্রতি মনো-নিবেশ করিতে বাধ্য হই। পশু ভাবিবার সময়—হয় আমরা গরু ভাবি, নয় হস্তী ভাবি, নয় অশ্ব ভাবি অথবা মনোমধ্যে নানা পশুর ওলট্‌ পালট্‌ করি; পশুত্বের সঙ্গে গোত্ব প্রভৃতি পরিবর্ত্তনীয় লক্ষণের একটা না-একটা জুড়িয়া দিই। আমরা যখন যাহা ভাবনা করি, তখন তাহার পরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ গুলির একটিকে ছাড়িয়া আর একটিকে গ্রহণ করিতে পারি; পশু ভাবিবার সময় আমরা গরু না ভাবিয়া হাতি ভাবিতে পারি;—এ জন্য পরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ-মাত্রই পরিহার্য্য,—অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ সেরূপ নহে—তাহা অপরিহার্য্য। পশু ভাবিবার সময় আমরা গরুই ভাবি, ঘোড়াই ভাবি, আর হাতিই ভাবি তাহাতে কোন বারণ নাই; কিন্তু তাহা-যে পশু এ-টি বিস্মৃত হইলে চলিবে না,—পশুর

পশুত্ব লক্ষণটিকে বলপূর্ব্বক আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা চাই। যাহা ধৃত হয় তাহাকেই বলি—ধর্ম্ম; যাহা ধৃত হয় তাহাকেই বলি—ধর্ম্ম; পশু নাঙ্গি, আবর্ত্ত, মূঢ়তা, চতুষ্পদ প্রভৃতি লক্ষণগুলিকে কোন-ক্রমেই ছাড়ে না। ক্রমাগতই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, এই জন্য ঐ লক্ষণ-গুলি পশুর ধর্ম্ম [illegible] উক্ত হয়। ধৃত হয়—এই অর্থে ধর্ম্ম।

কোন বস্তুর কোন একটি গুণ যদি এরূপ হয় যে [illegible] সেই বস্তু বিদ্যমান থাকে ততকাল [illegible] বিদ্যমান থাকে তবে সেই গুণই সেই বস্তুর ধর্ম্ম—সেই গুণই [illegible] বস্তুর প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ। [illegible] প্রকৃতিই এই যে, তাহা উত্তাপ এবং [illegible] বিস্তরণ করে। প্রকৃতি শব্দের [illegible] এবং ক্রিয়া দুয়ের মধ্যে [illegible] কোন অর্থভেদ দেখা যায় না, [illegible] প্রক্রিয়া এ দুই শব্দের একই অর্থ। [illegible] কিন্তু প্রকৃষ্ট রূপ ক্রিয়া;—যে ক্রিয়া দ্বারা যে বস্তুর স্বধর্ম্ম অভিব্যক্ত [illegible] সেই ক্রিয়া সেই বস্তুর প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হয়। [illegible] প্রজ্বলিত হইলেই তাহার অভ্যন্তরে [illegible] এক-প্রকার ক্রিয়া চলিতে থাকে, সেই ক্রিয়া হইতেই উত্তাপ এবং আলোক [illegible] স্ফুট হয়; তাই আমরা বলি যে, [illegible] প্রকৃতিই এই যে, তাহা উত্তাপ এবং আলোক বিকীর্ণ করে। পক্ষান্তরে, অগ্নি শ্বেতবর্ণ হইতেও পারে, না হইতেও পারে, এই জন্য শ্বেতবর্ণ-লক্ষণ অগ্নির প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। বরং পীত-মিশ্রিত-রক্ত বর্ণকে অগ্নির প্রকৃতি-সিদ্ধ-গুণ বলিলে তত দোষের হয় না, কেননা প্রায়শই অগ্নির বর্ণ ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, Habit is second nature সংস্কার দ্বিতীয় প্রকৃতি। [illegible] কোন গুণ আমাদের মনে সংস্কার-বদ্ধ হইয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমাগত [illegible] খাইতে খাইতে জিহ্বার [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতে পারে [illegible] জিহ্বার প্রকৃতির [illegible] মিষ্টরসের [illegible] হইলে [illegible] বর্জ্জন [illegible] সম্ভবে না।—[illegible] বাতাস [illegible] হইলে [illegible] যে দৃশ্য [illegible] শ্বেতবর্ণ [illegible] শ্বেত [illegible] একটি [illegible] ভিন্ন [illegible] গুণ [illegible] আমরা [illegible] দাঁড়ায় [illegible] অপেক্ষাকৃত [illegible] আমাদের [illegible] প্রকৃতির [illegible] অবস্থা, যে [illegible] পাওয়া [illegible] নাই, তাহা আমাদের [illegible] পারে; [illegible] দৃষ্টান্ত [illegible] মধ্যে [illegible] রৌদ্র [illegible] রৌদ্র, [illegible] তাহা অনুভব করে না, কিন্তু বিলাসী ব্যক্তি নিরাতপ [illegible] থাকিয়াও রৌদ্রের উত্তাপ এত অনুভব করে যে, এক মুহূর্ত্ত বায়ু [illegible] হইলে তাহার প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়। [illegible] দৃষ্টান্ত এই যে, আমরা [illegible] কিছু জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহারই সঙ্গে

"আমি উপলব্ধি করিতেছি" এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করি; নির্বিশেষে সকল জ্ঞান-ক্রিয়ার সঙ্গেই আমরা আপনাকে নিরন্তর উপলব্ধি করিয়া থাকি; আত্মজ্ঞান এরূপ আত্মার প্রকৃতি-সিদ্ধ বলিয়া তাহা আমাদের নিকট অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। আমরা মনে করি যে, আমরা কেবল বিষয় সকলকেই জানিতেছি—আত্মাকে জানিতেছি না।

আমাদের দেশের সাংখ্যকারেরা মূলে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলিয়াছেন; নানা প্রকার গুণ আছে সকলের মধ্য হইতে সার সংকলন করিয়া তাঁহারা তিনটি গুণ পাইয়াছেন—(১) প্রকাশ-গুণ—(২) অপ্রকাশ-গুণ ও (৩) দুয়ের সম্মিশ্র গুণ, এবং এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকেই তাঁহারা প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমটির নাম সত্ত্ব-গুণ, দ্বিতীয়টির নাম তমোগুণ, তৃতীয়টির নাম রজোগুণ।

প্রথম, প্রকাশ-গুণ। শব্দ-স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি যেখানে যত গুণ আছে, প্রকাশ-গুণ তাহাদের সকলের মধ্যেই সাধারণ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি প্রকাশ-গুণ সকলেরই গুণের গুণ।

দ্বিতীয়, অপ্রকাশ-গুণ। অপ্রকাশ গুণও সকল গুণের মধ্যেই সুসাধারণ। কোন গুণ পূর্বে অপ্রকাশ ছিল, পরে প্রকাশ পাইল, ইহাতেই প্রকাশের প্রকাশত্ব; অপ্রকাশ্য গুণ মাত্রই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে উপনীত হয়।

তৃতীয়, উভয়ের সম্মিশ্র। ঘন, বিরল প্রভৃতি নানা প্রকার ছায়ার অঙ্কন এবং নীল পীত প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণের রঞ্জন আত্মসাৎ করিয়াই আলোক পরিস্ফুট হয়; রজনী অবসানের মধ্য দিয়া উষা পরিস্ফুট হয়, উষার মধ্য দিয়া প্রাতঃকাল পরিস্ফুট হয়। অন্ধকার হইতে আলোক পর্যন্ত নানা প্রকার অঙ্কনের এবং রঞ্জনের সোপান-পরম্পরা আছে—তাহাই আলোকের অভিব্যক্তির পথ; অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের সংসর্গ একেবারেই রহিত হইয়া গেলে আলোক আর আলোক হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। উপরে যে, অঙ্কন এবং রঞ্জনের কথা বলা হইল তাহা প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দুয়ের সম্মিশ্র। মনে কর নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির চক্ষে সহসা প্রত্যূষের সূর্য্যালোক নিপতিত হইল; অন্ধকার হইতে একেবারেই এই-যে আলোকের অভিব্যক্তি হইল—ভাবিয়া দেখিলে ইহারও মধ্যে প্রকাশের একটি ক্রম-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যাইবে;—আমরা যদি দশ-তা কাগজ উপর্যুপরি রাখিয়া সকল-গুলিকেই এক মুহূর্ত্তে সূচি দ্বারা বিদ্ধ করি, তাহা হইলেও এরূপ বলিতে পারি না যে সকলগুলিকে একই সময়ে সকল দিকে বিদ্ধ করিয়াছি, অর্থাৎ এরূপ বলিতে পারি না যে, উপরের কাগজকে যে সময়ে বিদ্ধ করিয়াছি নিম্নের কাগজকেও ঠিক সেই সময়ে বিদ্ধ করিয়াছি। সেইরূপ, অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ আলোক দেখা দিলে, সেই আলোকের অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ পর্যন্ত প্রকাশের শত-প্রকার নিম্ন-মাত্রা আছে, যাহা উত্তরোত্তর ক্রমে দ্রুত অতিক্রম করিয়াই সেই আলোক নিজ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অপেক্ষাকৃত অস্ফুট প্রকাশের মধ্য দিয়াই সুপরিস্ফুট প্রকাশ সম্ভবে;—এইরূপ অপেক্ষাকৃত অস্ফুট প্রকাশ মাত্রই প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দুয়ের মাঝামাঝি, তাহাই রজোগুণ শব্দের বাচ্য।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্ব তমো এবং রজো এই তিন গুণ সকল গুণের সাধারণ লক্ষণ। এই তিনের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিন গুণই

আপনাদের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিতে একত্র বিলীন রহিয়াছে,—এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পায় না,—প্রকৃতি প্রকাশোন্মুখ অপ্রকাশ, অথবা অপ্রকাশোন্মুখ প্রকাশ। অপ্রকাশোন্মুখ প্রকাশের একটি উদাহরণ দিতেছি,—প্রথম বানান-শিক্ষা-কালে আমরা পুস্তক পাঠের সময় সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতাম যে, আমরা বানান করিয়া পড়িতেছি; কিন্তু তাহার পরে অভ্যাস বশতঃ বানান-কার্য্যটি এরূপ আমাদের অনায়াসসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পুস্তক পড়িবার সময় কখন্ যে আমরা বানান করি তাহা জানিতেও পারি না; অতএব বলা যাইতে পারে যে, প্রথমে বানান-কার্য্যের প্রকাশ ছিল বটে কিন্তু তাহা অপ্রকাশোন্মুখ। পক্ষান্তরে, যখন আমরা ভিন্ন ভাষার কোন একটি শব্দ প্রথমে উচ্চারণ করিতে পরাজিত মানি ও শেষে তাহাকে বানানেতে আয়ত্ত করি, তখন উচ্চারণের প্রথম বানানের অপ্রকাশ অবস্থাকে বলা যাইতে পারে যে, তাহা প্রকাশোন্মুখ।

গুণের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ যে, গুণ প্রকৃতিরই (ক্রিয়ারই) অভিব্যক্তি। দৃশ্য বস্তুর একটি গুণ—রূপ; এক দিকে আমাদের চাক্ষুষ ক্রিয়া রূপা একটি মানসিক ক্রিয়া, আর একদিকে আলোকের স্ফুরণ-রূপী বা প্রতিস্ফুরণ-রূপী ভৌতিক ক্রিয়া, এ দুই ক্রিয়ার সংযোগ ব্যতিরেকে কোন দৃশ্য বস্তুরই রূপ অভিব্যক্ত হইতে পারে না। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বপ্নাবস্থায় শুদ্ধ কেবল মানসিক ক্রিয়ার উত্তেজনা-বশতঃ রূপাদি গুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। শেষোক্ত স্থলে গুণের আধারে কি তাহার ঠিক পাওয়া সুকঠিন। স্বপ্নকালে আমরা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, সমস্তই আমাদের আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা যদি হইল তবে তাহারা ভৌতিক বস্তু কি?—তাহারা তাহাও নহে; তাহারা না আধ্যাত্মিক বস্তু, না ভৌতিক বস্তু, তাহারা মানসিক বস্তু; [illegible]ই তাহাদের উপাদান। এইরূপ মানসিক বস্তুর যখন যে কোন গুণ প্রকাশ পায় তাহা মানসিক ক্রিয়া দ্বারাই প্রকাশ পায়,—মানসিক ক্রিয়া-দ্বারা যেমন প্রকাশ পায়, মানসিক ক্রিয়া-দ্বারাই তেমনি বাঁচিয়া থাকে, মানসিক ক্রিয়া দ্বারাই তেমনি লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্ না কেন, দেখিবে যে, বস্তুর গুণ বস্তুর ক্রিয়া-মূলক, অথবা (যাহা একই কথা) বস্তুর গুণ বস্তুর প্রকৃতি-মূলক।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,

প্রথমতঃ বস্তু-মাত্রেরই সত্তা থাকা চাই। সৎ শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী সত্তা, সত্তা শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী অস্তিত্ব। এক খণ্ড লবণকে যদি পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করা যায় তবে অল্প কালের মধ্যেই তাহার অবয়ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার সত্তা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। বস্তুর যতই কেন অবস্থা পরিবর্তন হউক না—কিছুতেই তাহার সত্তার ইতর-বিশেষ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ বস্তু-মাত্রেরই ক্রিয়া বর্ত্তমান বা পরিবর্ত্ত-মান থাকা চাই। বস্তু আপনার ক্রিয়া দ্বারাই নিত্য-নূতন বর্ত্তমান কাল অধিকার করে। কোন বস্তুর যদি সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় তবে তাহা অতীত কালে প্রবেশ করে, তাহা আর বর্ত্তমান থাকে না। ভৌতিক বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া বিলুপ্ত হইলে—তাহার কিছুই বর্ত্তমান থাকে না; যাহা বর্ত্তমান কাল অধিকার করিয়া অবস্থান করে না, তাহা কিরূপে নিত্য-কাল অধিকার করিবে? নিত্য কাল অ-

ধিকার করিতে গেলেই প্রত্যেক বর্ত্তমান কাল অধিকার করা আবশ্যক—কেননা সকল কালই নিত্য কালের অন্তর্ভূত। ক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন বস্তুই বর্ত্তমান কাল অধিকার করিতে পারে না—বর্ত্তমান কাল অধিকার করিতে না পারিলে নিত্যকাল অধিকার করিতে পারে না, নিত্যকাল অধিকার করিতে না পারিলে তাহার সত্তা থাকিতে পারে না, কেননা সত্তা শব্দের অর্থই চিরস্থায়ী অস্তিত্ব বা নিত্য স্থিতি। এই জন্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিলেই তাহার ক্রিয়া স্বীকার করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ ক্রিয়ার উদ্দেশ্যই গুণের অভিব্যক্তি। যে বস্তুর একটিও গুণ—না তাহার আপনার নিকট—না অন্য কাহারো নিকট—প্রকাশ-ক্ষম, তাহা "আছে" বলিলেও যাহা বুঝায়, তাহা "নাই" বলিলেও অবিকল তাহাই বুঝায়;—সে তাহার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব হইতে কোন অংশেই ভিন্ন নহে।

অতএব "বস্তু" বলিলেই বুঝায় যে তাহার সত্তা চিরস্থায়ী, তাহার ক্রিয়া বর্ত্তমান, ও তাহার গুণ প্রকাশ-ক্ষম। বস্তুর শুধু কেবল সত্তা মাত্র থাকিতে পারে না—তাহার সঙ্গে ক্রিয়ার বর্ত্তমানতা চাই ও গুণের অভিব্যক্তি চাই, তিনের একটি না থাকিলে তিনটিই ব্যর্থ হইয়া যায়।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্মৃতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপু সংযম।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ক্রোধ।

মানুষকে মানুষের অন্যায়াচরণ হইতে, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং পৃথিবীতে অধর্ম্ম, অন্যায় ও অসত্যের বিস্তারের প্রতিরোধ করিবার জন্য ঈশ্বর মনুষ্যকে এই ক্রোধ রিপু দিয়াছেন। কিন্তু অন্যায়, অধর্ম্ম ও অসত্যের দমন ক্রোধের এই যে উদ্দেশ্য মনুষ্য তাহা বিস্মৃত হইয়া আপনার স্বার্থের উপর সামান্য আঘাত পড়িলে, কিম্বা কাহারও কোন কার্য্য ন্যায় কার্য্য হইলেও আপনার কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রীতিকর হইলে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অধর্ম্ম, অন্যায় ও অসত্যের দমনার্থ, প্রতিরোধার্থ ও বিনাশার্থ, আমরা ক্রোধ রিপু পাইয়াছি; অতএব যখন দেখিব কেহ কোন অধর্ম্ম কার্য্য করিতেছে, কিম্বা আমাদিগের প্রতি বা অপরের প্রতি বা সমগ্র সমাজের প্রতি অন্যায় ও মিথ্যাচরণ করিতেছে, তখনই আমরা তাহা দমন ও প্রতিরোধ করিবার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিব। তাহাই ক্রোধের যথার্থ ব্যবহার, তাহাই ক্রোধের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করি, তাহা হইলে তাহা দ্বারা ক্রোধের অপব্যবহার হয়—ক্রোধের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ করা হয়। যেমন অন্যায়, অধর্ম্ম ও অসত্যের দমন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমরা ক্রোধ প্রকাশ করিব না, তেমনই এই উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ হইবার কালে আমরা ক্রোধে কখন অভিভূত হইব না, অন্ধ হইব না—অন্যায় অধর্ম্ম ও অসত্যের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ কালে ক্রোধ আমাদিগের বশে থাকিবে, আমরা ক্রোধের বশীভূত হইব না; ক্রোধকে আমরা নিয়মিত করিব, ক্রোধ আমাদিগকে নিয়মিত করিবে না; ক্রোধকে আমরা পরিচালিত করিব, ক্রোধ আমাদিগকে পরিচালিত করিবে না। অন্যায়, অধর্ম্ম, ও অসত্য দমন করিতে গিয়া আমরা যদি ক্রোধের বশীভূত

হইয়া পড়ি, ক্রোধের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়মিত হই; তাহা হইলে আমরাই সেই অসত্য ও অন্যায় নিবারণ কালে ন্যায়-বিরুদ্ধ ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারি এবং অসত্যের প্রশ্রয় দিতে পারি। যিনি ক্রোধের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালন করেন, তিনি অধর্ম্ম অন্যায় ও অসত্য দমন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশ করেন না, অন্য কোন কারণে অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক হইতে দেন না। আর যখন তিনি ঐ সদুদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তখনও তিনি কদাচ ক্রোধের বশীভূত হয়েন না, ক্রোধের আবেগে বিচলিতমনা হইয়া পড়েন না, ক্রোধাতিশয্যে অন্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েন না। ক্রোধ প্রকাশ কালেও তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত ও অবিচলিত থাকে। [illegible] যথার্থই বলিয়াছেন;—

"সাধোঃ প্রকোপিতস্যাপি মনো নায়াতি বিক্রিয়াং
নহি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া।"

"সাধুকে ক্রোধান্বিত করিলেও তাঁহার মন বিকার প্রাপ্ত হয় না, যেমন তৃণ সমূহের উল্কা সমুদ্রের জল উত্তপ্ত করিতে পারে না।"

অন্যায়, অধর্ম্ম ও অসত্য দমন ব্যতীত অন্য কোন কারণে কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, এবং এই উদ্দেশ্যে যখন ক্রোধ প্রকাশ করিবে, তখন উহা দ্বারা কিছু মাত্র অভিভূত হইবে না—ইহাই ধর্ম্মের নিয়ম, ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা। কেবল যে অপরের কৃত অন্যায় অধর্ম্ম ও মিথ্যাচরণ দমন জন্য আমরা ক্রোধ রিপু পাইয়াছি তাহা নহে, আমাদিগের নিজের অধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং অন্যায় ও মিথ্যাচরণ করিবার প্রলোভন দমন করিবার জন্যও আমরা ঐ রিপু পাইয়াছি। আমাদিগের নিজের অধর্ম্ম প্রবৃত্তি দমনের নিমিত্তে রিপু সকলের প্রতিও আমরা ক্রোধ প্রকাশ করিব—কাম রিপুর প্রতি, লোভের প্রতি, মোহের প্রতি, মদের প্রতি, মাৎসর্য্যের প্রতি, এমন কি ক্রোধের প্রতিও আমরা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহা দমন করিব—ইহাও ধর্ম্মের নিয়ম, ঈশ্বরের আজ্ঞা। এই নিয়ম, এই আজ্ঞা পালন না করিয়া যে ব্যক্তি সামান্য, তুচ্ছ ও নীচ কারণে ক্রোধ প্রকাশ করে, এবং ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া বিচলিতমনা, বিবেচনাবিহীন ও দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হয়, তাহাকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতিগ্রস্ত হইতে হয়। কোপন-স্বভাব হইলে কিম্বা ক্রোধের বশীভূত হইলে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। ক্রোধের আবেগে সমস্ত শরীরে একটী অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে। কোপনস্বভাব ব্যক্তি হৃদ্রোগ, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা, অপস্মার, রক্তস্রাব, অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ক্রোধের প্রবল আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে হঠাৎ মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়া থাকে। ক্রোধের বশীভূত হইলে শরীর অসুস্থ ও পীড়িত হয়, ইহা ইয়োরোপ ও আমেরিকার শারীরতত্ত্ববিদ্গণ মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা এবিষয়ে তাঁহাদিগের কয়েক জনের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম *। ক্রোধের বশীভূততা যেমন

* Dr William Sweetser of America in his "Mental Hygieine" observes ;—"Hemorrhages from various parts as the nose, lungs, stomach, and also inflammations of different organs, as of the brain, lungs, skin &c are occasionally brought on by severe fits of anger. Broussais states that he has seen Haemoptysis or spitting of blood, and violent pneumonia or inflammation of the lungs, proceed solely from this passion." In another place the same authority says ; "I have now and then met with

[illegible]রের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, তেমনই আবার তাহা মনের অবনতিকর। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত [illegible] ধৈর্য্য বা শান্তি থাকে না, [illegible] মানসিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। শান্তিশূন্য ও অস্থিরমনা ব্যক্তি কোন বিষয়েই মন নিবিষ্ট করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষা করা, কোন একটী মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। যে ক্রোধের বশীভূত হয়, সে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মার বিশেষ দুর্গতি সাধন করে। প্রেমই আত্মার ধর্ম্ম, প্রেমই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা, প্রেমই আত্মার উন্নতির অনুকূল। ক্রোধ প্রেমের বিরোধী, অতএব আত্মার উন্নতিরও বিরোধী। তবে ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষার জন্য আমরা শান্ত ভাবে অবিচলিতমনা হইয়া যে ক্রোধ প্রকাশ করি, তাহার উদ্দেশ্য মহান্ বলিয়া তাহা আত্মার কিছুমাত্র অবনতি সাধন করিতে পারে না। কিন্তু নীচ উদ্দেশ্যে এবং তুচ্ছ কারণে ক্রুদ্ধ হইলে আত্মার পবিত্রতা শান্তি ও মাধুর্য্য নষ্ট হয়, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া মনুষ্য যে সকল গর্হিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহাতে আত্মা ঘোর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ উপদেশ এই যে কেবল ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষার জন্য ক্রোধে অভিভূত না হইয়া, অন্ধ না হইয়া ক্রোধ

---

instances of erysipelatous inflammation about the face and neck induced by paroxysms of passion. Other cutaneous affections, as urticaria or nettlerash and herpetic eruptions, will often times—more particularly if there exists a disposition to them—be produced by the same cause." Again;—"Fainting will sometimes take place in violent anger, and, in occasional instances, the system being unable to react under the intensity of the shock, life has yielded almost as to a stroke of lightning." Again, "Anger sometimes proves fatal, the severity of its shock at once suppressing the action of the heart, or, as has occasionally happened, causing an actual rupture of this organ or some of its large blood vessels. Apoplexy, hemorrhages, convulsions or other grave affections may also succeed to it, speedily terminating existence." Again "The fluids of the mouth may, under the influence of anger, acquire poisonous qualities" Dr Broussais, a distinguished physician of France remarks;—"Anger imparts to the saliva poisonous qualities, capable of provoking convulsions, and even madness, in those persons bitten by a man agitated with transports of it." Elsewhere the same authority says; "I have often seen diarrhoea, colic and other disorders of the digestive organs, caused by sudden fits of passion." Dr Y. L. Nichols says;—"Anger is a foe to health. Every exhortation to the exercise of the christian virtue of charity is an exhortation to health." Again; "Every violent emotion proves in certain cases a cause of insanity or death." Dr Amariah Brigham observes; "Who is there that has not felt the influence of mental agitation in destroying the appetite and deranging digestion, and thus producing dyspepsia for a short-time." Dr Beaumont says, "When the mind is agitated by anger, the time of digestion is prolonged." Dr Robert James Maner writes; "Habits of control in matters of emotion and passion is of the highest importance on account of its health preserving power." A distinguished medical authority of Europe has recorded the following opinion on the influence of anger on health; "Anger destroys the appetite and checks or disorders the functions of digestion. Let one receive a provocation in the midst of his dinner, and the food at once loses all its relish for his palate. Various morbid effects of a more or less grave and lasting character, may also succeed to intense anger. Thus palsies, convulsions, epilipsey and mania are among its occasional consequences. Violent anger or ungovernable temper as we sometimes find it expressed, holds according to the reports of different Lunatic Asylums, a prominent place among the causes of insanity. Raving madness is the form of insanity which most frequently results from this cause, though dementia has sometimes at once followed upon its operation.

প্রকাশ করিবেক; কিন্তু ইহার অন্যথা করিয়া যদি তুমি কোপন-স্বভাব ও ক্রোধের বশীভূত হও, তাহা হইলে শরীর মন ও আত্মার দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;—

"ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।"

"ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক।" যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত, ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া যে ব্যক্তি অন্যায় ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহাকে অহরহ অনুশোচনায় পরিতপ্ত হইতে হয়। ক্রোধ-পরায়ণ ব্যক্তি সুখ-শান্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে;

"ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;—

"কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।"

"কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।" ব্রহ্মলাভই ব্রাহ্মের সাধনার সিদ্ধি। ব্রাহ্ম যদি কাম ক্রোধ সংযম করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। কাম ক্রোধের বশীভূত হইলে তিনি পরব্রহ্মের পবিত্র নিয়মের বিপরীতাচরণ করেন, এবং তজ্জন্য ক্রমশঃ তাঁহা হইতে দূর হইতে দূরে গিয়া পড়েন। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে;

"কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;—

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্"

"অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক।" যদি কেহ তোমার অনিষ্ট ও অসুখের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তাহাকে ক্ষমা করাই ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন,

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;—

"কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

"কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।" যিনি কাম ও ক্রোধ রিপুকে বশীভূত করিতে পারেন, যিনি ঐ রিপুদ্বয় দ্বারা কখন অভিভূত, বিচলিতমনা ও বিবেচনাশূন্য হয়েন না, যিনি ঐ দুই রিপুকে স্ববশে রাখিয়া উহাদিগের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট যথার্থ ব্যবহার করেন; তিনি আত্মাতে প্রভূত বললাভ করেন। তিনি ধর্ম্মবলে, পবিত্রতা-বলে, ব্রহ্ম-বলে বলী হইয়া ত্রিলোকজয়ীর ন্যায় অতুল বলশালী হয়েন। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে;—

"কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

ব্রাহ্ম অন্যায়, অধর্ম্ম ও অসত্য দমন এবং ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যের রক্ষা ও উন্নতির জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিবেন, অন্য কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ হইবেন না; তিনি এই সুমহৎ উদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশ করিতে গিয়া কখন ক্রোধে বিচলিত হইবেন না, কখন ক্রোধে অভিভূত হইয়া জ্ঞান হারা ও অবিবেকীর ন্যায় কার্য্য করিবেন না। ব্রাহ্ম ক্রোধের এইরূপ ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ও ধর্ম্মসিদ্ধ ব্যবহার করিয়া ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিবেন, পরব্রহ্মের প্রীতি-ভাজন হইবেন। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া, ক্রোধ রিপুকে এইরূপে জয় করিতে না পারেন; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃতরূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-

…লক পাদা।

…ব্যাখ্যান।

(শ্রাবণ … পর)

সবারে পালেন সেই … দয়াময়।
সবার মঙ্গল দাতা সবার আশ্রয়।
কিন্তু করি প্রীতি দান, … তাই প্রীতি চান,
… বুঝে দেখ তাঁহার আশয়॥

অনেক … নাহি জানিবারে পারে।
কেমনে পূজিবে তাঁরে প্রীতি-উপহারে।
কি সম্বন্ধ তাঁর সনে, ভাবিয়া না পায় মনে,
তাঁহারে ছাড়িয়া তারা থাকে একেবারে॥

হে মানব! তুমি কি তাদের মতন!
ভেবে দেখ … তোমার খুলিল নয়ন।
… তব … তাঁর, … বিভোর,
সে তোমারে উচ্চ পদে করিল আপন॥

… আসি হৃদয়ে তব যাচেন তোমারে।
“দাও … দাও তব হৃদয় আমারে”।
হৃদয়ের … প্রেম … আশা,
নিবেদন … তাঁরে পূর্ণ উপচারে॥

জানিতে … পিতা তার স্নেহের সন্তান।
ডাকিলে তাহার কোলে ছুটে আগুয়ান।
তাই তিনি স্নেহ-… তোমা লইবার তরে,
আপনার ক্রোড়ে প্রীতি করেন আহ্বান॥

বিশ্বপিতা তথা করি ক্রোড় প্রসারণ।
ডাকেন তোমারে বলি অমিয় বচন।
হে আত্মন্ সে আহ্বান, না করিও প্রত্যাখ্যান,
তাঁর ক্রোড়ে যাও, লও তাঁহার শরণ॥

দেখ তাঁর কত দয়া তোমার উপর।
দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে চা’ন অবসর।
কবে তুমি তাঁরে ল’বে, একান্ত তাঁহার হ’বে,
তাঁহারে করিবে তুমি হৃদয়-ঈশ্বর॥

কবে মোরা তেয়াগিয়া বিষয়ের কাম।
চাহিব যাইতে তাঁর অমৃতের ধাম।
কবে তিনি দয়া করি, দিবেন চরণ তরী,
লইয়া আপন কোলে দিবেন বিশ্রাম॥

দুই পথ সম্মুখেতে আছয়ে আত্মার।
মঙ্গল ঈশ্বর পথ, কণ্টক সংসার।
স্বাধীনতা আছে তার, উভ পথে চলিবার,
কিন্তু সেই রক্ষা করে নিজ অধিকার,

বেছে লয়ে শ্রেয়ঃ পথ ইচ্ছায় আপন।
যে তাহে চলিছে প্রেমে হইয়া মগন।
যে আপন দেহ মন, হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন,
তাঁরে দান করি করে সফল জীবন॥

মনুষ্য হইয়া তাঁর পথে না চলিবে।
দিতে পার প্রীতি তাঁরে তবু নাহি দিবে।
সুধাময় প্রেম তাঁর, ভুঞ্জিতেছ অনিবার,
সে প্রেমের প্রতিদান কিছু না করিবে।

যাঁর দান—প্রীতি কত নহে বর্ণিবার।
সে দান—প্রীতির শোধ দিতে সাধ্য কার।
যা আছে তোমার—তাঁর, কিবা তাঁরে দিবে আর,
এক মাত্র আছে প্রেম তাঁহারে দিবার॥

নিরন্তর সেই প্রীতি রক্ষিছে তোমার।
থাকিবে অনন্ত কাল যাহার ছায়ায়।

কিবা পেয়ে তা ভুলিলে, তাহে তুমি না রহিলে,
মৃত্যু মুখে পশ কেন আপন হেলায় ॥

তাঁর প্রেমে মজে সদা সাধুর হৃদয়।
তাঁরে আপনার বলি ভক্ত চিনে লয়।
করে সদা অভিলাষ, তাঁর সহ সহবাস,
একান্ত অধীন হয়ে তাঁর কাছে রয় ॥

কেন আত্মা চায় তাঁরে—দেখহ নিদান।
সুন্দর মঙ্গল নাহি তাঁহার সমান।
তিনি প্রেম সম্পূর্ণ, পবিত্রতা দয়াঘন;
যে দেখে তাঁহারে তার মুগ্ধ মনঃ প্রাণ ॥

কিন্তু দেখিবারে তাঁরে পায় কোন্ জন।
পবিত্র হইতে যার একান্ত যতন।
শুভ ইচ্ছা ধর্ম্ম বলে, দলে প্রলোভন দলে,
আত্মার নিবৃত্তি শান্তি পায় অনুক্ষণ ॥

হোক শুদ্ধ ভাব গতি তোমার কেবল।
আত্মপ্রসাদের জ্যোতি হউক উজ্জ্বল।
তখন তাঁহার প্রীতি, হইবে তোমার মতি,
তাঁহার পথের বিঘ্ন কাটিবে সকল ॥

যবে আত্মা পিতৃ-ভাবে তাঁহারে দেখিয়া,
তাঁর প্রেম লয়ে আসে সংসারে ফিরিয়া
তবে ভ্রাতৃ-প্রেম-ভরে, সবে আলিঙ্গন করে
তাঁর প্রিয় কার্য্য করে তাঁহাতে মজিয়া ॥

তাঁর প্রেম তাঁর ভাব হৃদয়ে পশিলে,
ভাসায় জগৎ কিবা মঙ্গল সলিলে।
তার নাম সুধা পান, হিতকর অনুষ্ঠান,
করেন ভকতগণ প্রেমানন্দে মিলে ॥

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

জীবনের সদ্ব্যবহার। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে এই গ্রন্থ এক জন ব্রহ্মর্ষি দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। পরে চীন দেশীয় বৌদ্ধেরা চীন ভাষায় তৎপরে একজন ইংরাজ পরিব্রাজক চীন ভাষা হইতে ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ করেন। আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যুবকদিগকে গার্হস্থ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কিন্তু সচরাচর যেরূপ নীতিশিক্ষার পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় ইহা তাহার ন্যায় শুষ্ক নহে। ইহার মধ্যে গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা সূক্ষ্মদর্শিতা ও ধর্ম্মবুদ্ধি অতি উজ্জ্বল আকারে আছে। কোন একটী বিষয়ের দোষ বা গুণ এমন তীব্রভাবে দেখান হইয়াছে যে তাহা পাঠমাত্রেই মনের একটী অবস্থান্তর হয়। ইহাতে নীতির নীরসতা বা শুষ্কতা নাই। প্রগাঢ় চিন্তা তলস্পর্শ করিয়া নীতির যে রসটুকু বাহির করিতে পারে ইহাতে তাহারই আস্বাদ পাওয়া যায়। ফলত বঙ্গ ভাষায় যে সমস্ত সারগর্ভ পুস্তক প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যেই ইহার স্থান। ইহা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত। এবং গার্হস্থ্য নীতি শিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থেরই ইহা পাঠ করা আবশ্যক। ইহার অনুবাদ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। আমরা নীলকমল বাবুকে হৃদয়ের সহিত আশীর্বাদ দিয়া কহিতেছি তিনি

এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

আগামী ৮ কার্ত্তিক শুক্রবার "বালী-ধর্ম্ম-সমাজের" তৃতীয় সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে। এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

শ্রী হীরালাল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

---

৯ কার্ত্তিক শনিবারে কালনা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। পূর্ব্বাহ্নে ৭॥ ঘটিকা ও অপরাহ্নে ৭ ঘটিকার পর উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রী বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্নে তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় ও শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৫১০॥ ৯
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮৮৯।৵৬
সমষ্টি	৫৩৯৯৸৶৩
ব্যয়	২৬৩৬॥৵৩
স্থিত	২৭৬৩।৴০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১১২।৶
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৲
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১৲
„ রাজনারায়ণ বসু	॥০
„ শ্রীনাথ মিত্র	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস (উনাও)	২৲
„ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
„ অধরচন্দ্র কর্ম্মকার	২৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার	৫০৲
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৲
„ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
দানাধারে দান প্রাপ্ত।	১/৯
	১১২।৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৮৸০
পুস্তকালয় ...	৪৭৸/০
যন্ত্রালয় ...	১৩০৮॥৶৬
গচ্ছিত	৩৯॥৵৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫০৲
দাতব্য	৮৭৯॥৵৯
সমষ্টি	২৫১০॥ ৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৯৩।/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৩৯।৵৯
পুস্তকালয়	১৯।৶৩
যন্ত্রালয়	১২৮১।/০
গচ্ছিত	৫৪৸৶৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৭॥৵৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫০৲
দাতব্য	৮৭০॥৶৯
সমষ্টি ...	২৬৩৬॥৵৩

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
কার্ত্তিক ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ

২০৮ সংখ্যা 1807 শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ আশ্বিন রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরমাত্মা পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ—তিনি আপনার জন্য কিছুই চাহেন না, তাঁহার আপনার জন্য যাহা চাই সকলই তাঁহার আছে। জীবাত্মা অপূর্ণ;—তাহার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আকাশ ছাড়াইয়া উঠিতেছে কিন্তু তাহার শক্তি শরীর মনের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিতেছে না—ইহাই জীবাত্মার অপূর্ণতা; ইহাই তাহার সকল দুঃখের মূল। জীবাত্মার যদি ঐ উন্নতির আকাঙ্ক্ষাটি না থাকিত তবে সে আপনার অপূর্ণতা অনুভব করিত না—পশু-পক্ষীর ন্যায় মোহবর্ম্মে আবৃত থাকিয়া সুখে জীবন অতিবাহন করিত। পশু-পক্ষীও অপূর্ণ জীব, মনুষ্যও অপূর্ণ জীব; পশু-পক্ষী অপূর্ণ জীব বটে কিন্তু অপূর্ণ আত্মা নহে—এ জন্য তাহারা আপনাদের অপূর্ণতা আপনারা উপলব্ধি করে না,—মনুষ্য অপূর্ণ আত্মা, এই জনাই মনুষ্য আপনার অপূর্ণতা আপনি উপলব্ধি করে। জীবাত্মার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? জীবাত্মা স্বয়ং অন্তরে অন্তরে এমন কিছু উপলব্ধি করিয়াছে, যাহাতে তাহার উন্নতি স্পৃহা উদ্দীপিত হইয়াছে—যাহাতে সে জানিতে পারিয়াছে যে, তাহার উন্নতির অন্ত নাই,—অনন্ত জ্ঞানের দিকে—অনন্ত আনন্দের দিকে—অনন্ত জীবনের দিকে—তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে; পরমাত্মার সন্নিধান উপলব্ধি করাতেই জীবাত্মায় এইরূপ স্পৃহা উদ্দীপিত হইয়াছে,—ইহাতেই জীবাত্মা পশুত্ব অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্ব—আত্মত্ব—লাভ করিয়াছে। পরমাত্মা পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তিনি আপনার জন্য কিছুই চাহেন না—তিনি জীবাত্মার সঙ্গের সঙ্গী ও সুহৃদ, তিনি জীবাত্মার মঙ্গল চাহেন—আপনাকে দিয়া জীবাত্মার অভাব মোচন করিতে চাহেন;—মাতা যেমন ক্রোড় প্রসারণ করিয়া স্তন্য দুগ্ধে শিশুর অভাব মোচন করে, পরমাত্মা সেইরূপ আপনার প্রেম ঢালিয়া দিয়া—অমৃত দিয়া—জীবাত্মার অভাব মোচন করেন।

পরমাত্মার পরিপূর্ণ শক্তিতে সমস্ত জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—তাঁহার শক্তিকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। জীবাত্মা যখন দেখে যে, তাহার শক্তির পরিধি যদিও সং-

কীর্ণ—আমি যদিও আমার অভাব মোচন করিতে অসমর্থ, তথাপি যিনি আমার প্রভু তাঁহার শক্তি মহান ও পরিপূর্ণ, তিনি আমার সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারেন, তিনি আমার আত্মার অন্তরতম আত্মা—আমার প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু—আর আমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব,—এইটি যখন সে দেখে তখন দুঃখ শোক আর তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। আমাদের দুঃখ শোক হইতে অস্পৃষ্ট থাকিতে হইলে তাহার অব্যর্থ উপায় পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সংস্থাপন করা। কেহ বলেন পরমাত্মা অতি দূরে স্বর্গে আছেন—কেহ বলেন যে, তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আছেন—সকল সত্যের মূল সত্য—অথচ আমাদের জ্ঞান প্রেমের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই,—মূল সত্যের সহিত সকল সত্যেরই সম্পর্ক আছে—শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞান প্রেমের সহিত কোন সম্পর্ক নাই! কি আশ্চর্য্য কথা! কেহ বলেন যে, তাঁহার সৃষ্ট জগতের সহিত তিনি সর্ব্বাংশে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন—জগৎই তিনি। আমাদের অপূর্ণ আত্মা যখন শরীরে বদ্ধ থাকিয়াও শরীর হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—তখন পরিপূর্ণ পরমাত্মা যে জগৎ হইতে নির্লিপ্ত না থাকিবেন—জগতের সুখ দুঃখে জড়িত হইয়া পড়িবেন—এ কথা কথাই নহে। উপনিষদে আছে—

> সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।

সর্ব্ব লোকের চক্ষু সূর্য্য যেমন দৃশ্য বস্তুসকলের দোষ দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ বহির্ব্যাপী একমাত্র সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা লোক-দুঃখে লিপ্ত হন না।

পরমাত্মা কোন অনির্দ্দিষ্ট [illegible] বসিয়া আছেন, এ কথা নিতান্ত বালকের কল্পনা; তিনি অনির্দ্দেশ্য জ্ঞানাতীত প্রদেশে আছেন এ কথা আত্ম-জ্ঞান-বিহীন জড়-বিজ্ঞান-প্রিয় বুদ্ধির সিদ্ধান্ত; তিনি জগতে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এ কথা নিতান্তই স্থূলদর্শী জড়-বুদ্ধির কথা। পরমাত্মা সর্ব্বত্র থাকিয়াও সকল হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত;—আমাদের আত্মা যেখানে আছে, পরমাত্মাও সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত,—তিনি যদি আমাদের ন্যায় সংসারে লিপ্ত হইয়া পড়িবেন তবে কে আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবে? অটল অপরিবর্ত্তনীয় নির্লিপ্ত পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা শোকবিহ্বল অপূর্ণ আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থিতি করিতেছেন—এইটি আমরা দেখি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ—যত শোক—যত যন্ত্রণা। অভাব মগ্ন অপূর্ণ আত্মা এবং পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা একত্রে অবস্থিতি করিতেছেন—অথচ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎকার নাই—এ কি দুঃখ। জীবাত্মা তবে কিরূপে সুস্থ থাকিবে—কে তাহার অভাব মোচন করিবে—তাঁহার আনন্দ কোথা হইতে আসিবে! দুই মেঘের একটিতে তাড়িত পদার্থ পূর্ণ মাত্রায় আছে—আর একটিতে তাহার অভাব আছে—উভয়ের মধ্যে যোগ নিবদ্ধ হইলে, তবে তো দ্বিতীয় মেঘের অভাব পূরণ হইয়া তাহার ম্লান মুখ বিদ্যোতিত হইয়া উঠিবে! মেঘে মেঘে স্থূল ভৌতিক যোগ, আত্মাতে পরমাত্মাতে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক যোগ,—সেই যোগে জীবাত্মার [illegible] ইচ্ছাতে পরমাত্মা আপনার [illegible]

এবং শক্তির প্রভাব স্মরণ করিয়া তাহার মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করেন। চিন্ময় আনন্দময় পরমাত্মাকে নিকটে পাইয়া যাঁহারা তাঁহাকে আত্মাতে প্রেম-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা কি অমূল্য স্পর্শ-মণি করতলে প্রাপ্ত হইয়াছেন;—সেই স্পর্শ-মণির সংস্পর্শে তাঁহাদের বিষাদান্ধকার দিব্য আনন্দ-জ্যোতিতে পরিণত হয়, তাঁহাদের জড়তা চেতনে পরিণত হয়, তাঁহাদের অশক্তি শক্তিতে পরিণত হয়;—সেই স্পর্শ-মণির সংস্পর্শে মনুষ্য চিন্ময় আনন্দময় হইয়া—পৃথিবীতে থাকিয়াও ঈশ্বরের অতুল মহিমার অভ্যন্তরে বিচরণ করে, তখনই সে বীত-শোক হয়।

হে পরমাত্মন্! আমাদের তাপিত হৃদয় তোমার দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াছে, তুমি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হও। তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি—তুমি আমাদের আত্মাকে দুঃখ শোক ও মন বিষাদ হইতে মুক্ত কর,—তোমার চরণে স্থান দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উদ্ধৃত।

পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

গত শ্রাবণ মাসের ভারতীতে পজিটিবিজমের পক্ষ সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে গুটিকতক কথা আমি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ইহা বলিতে আমি আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করি যে তিনি আমার একজন পরম সহৃদয় বন্ধু; এবং তাঁহার লেখা পড়ে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি কমে নাই। তাঁহার মত যাহাই হোক না কেন, তিনি বাহিরের লোকের কটাক্ষের প্রতি কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া যেরূপ অকুন্ঠিত সরল ভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যথার্থ পুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এখনকার কালে অনেকে যেরূপ না ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা যে-সে সিদ্ধান্ত জোরের সহিত স্থাপন করিয়া লোকসমাজের বিরুদ্ধে আপনার পুরুষত্বের পরিচয় দেন, এ তাহা নহে। এই প্রবন্ধটিতে তাঁহার বহুদিনের চিন্তা ও প্রাণগত অনুরাগ সুস্পষ্ট মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে ঠিক যেন তাঁহার মন প্রাণ অবিকৃত ভাবে কাগজে উথলিয়া পড়িয়াছে,—ইহাতেই তাঁহার ভাষা আরো সুন্দর হইয়াছে; এমন চমৎকার ঝর্ঝরে বাঙ্গালা অতি অল্পই দেখা যায়।

তিনি যে কি চক্ষে কমট্‌কে দেখিয়াছেন—অন্যেরা পাছে সে চক্ষে না দেখে—এই তাঁহার ভয়, ও সকলেই কমট্‌কে সেই চক্ষে দেখুক এই তাঁহার মনের আগ্রহ, এই-দুইটি ভাব তাঁহার প্রবন্ধটির প্রাণ; আর যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন তাহা তাহারি টানে বলিয়াছেন। কমটের প্রতি তাঁহার এই যে প্রগাঢ় ভক্তি—ইহার প্রতি কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার সেই ভক্তি তাঁহার চক্ষের সমুখে এমনি-এক যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে যে, পর-পক্ষের ধর্ম্মের সার-আদর্শ তাঁহার চক্ষু হইতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য আমরা সে আদর্শটি তাঁহার নিকট যথাসাধ্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি।

তিনি এইটি বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন যে,পরলোকের ক্লেশ-ভয়ে ও সুখ-প্রলোভনে ধর্ম্মকার্য্য করা—পিতামাতাকে ছাড়িয়া বনে যাওয়া—কমটের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—প্রকারান্তরেই

বা কেন—লেখক স্থানে স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আর আর ধর্ম্মের সারমর্ম্ম উহা ছাড়া আর কিছুই নহে। আর আর ধর্ম্মের কথা বলিতে আমি অনধিকারী কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের সারাংশ—ব্রাহ্মধর্ম্ম—আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহার আদর্শ উহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কমটির প্রীতি ভক্তির আতিশয্যে কৃষ্ণকমল বাবু তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই। আমাদিগকে যে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে হইতেছে—ইহাই আক্ষেপের বিষয়। ভগবদ্গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে যে স্বর্গলোভে কিম্বা নরকের ভয়ে কর্ম্ম করা কেবল নাম মাত্রেই ধর্ম্ম;—ঈশ্বরেতে কর্ম্মফলের সন্ন্যাস পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। আমরা শাস্ত্রাদির সার সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের যে আদর্শ পাইয়াছি, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি; কমটের ধর্ম্মের আদর্শ কি, তাহা যদি কৃষ্ণকমল বাবু আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন,—সে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কি—মর্ম্ম কি—তাৎপর্য্য কি—তাহা যদি খুলিয়া বলেন, তবেই আশা করা যাইতে পারে যে, পাঠকগণ নিম্ন-প্রদর্শিত আদর্শের সহিত তাহার তৌল করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

মনুষ্য তিন ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; প্রথম, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া; দ্বিতীয়, স্বার্থের উদ্দেশে; তৃতীয়, পরমার্থের উদ্দেশে।

প্রবৃত্তির অধীনে কার্য্য করা এইরূপ,—যেমন—কোন ব্যক্তি ক্রোধন-স্বভাব, কোন ব্যক্তি লোভী, যাহার যে প্রবৃত্তি বলবান অনেক সময় তাহার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সে নিজের স্বার্থ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। লোভী ব্যক্তির কার্য্য সমূহের কেন্দ্র বা প্রধান-প্রবর্ত্তক লোভ। ক্রোধী ব্যক্তির কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক তাহার ক্রোধ ইত্যাদি।

এই তো গেল প্রবৃত্তি,—এখন স্বার্থ কিরূপ দেখা যাউক। যাহারা স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে তাহারা উপস্থিত প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; যেমন—কোন কার্য্য-নিপুণ ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ হইলেও স্বার্থের খাতিরে অনেক সময় ক্রোধকে দমন করিতে হয়,—অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় ভোগ-লালসাকে দমন করিতে হয় ইত্যাদি। প্রবৃত্তি-মূলক কার্য্যের কেন্দ্র যেমন উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনা, স্বার্থের কেন্দ্র তেমনি সমস্ত প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য-সাধন, এক কথায়—আপনার ভাল। এখন পরমার্থ কি তাহা দেখা যাউক। এটি একটু অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয়,—এটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ব্বের ঐ দুটি কার্য্য-প্রবর্ত্তকের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। স্বার্থের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য, কতক-না-কতক পরিমাণে প্রবৃত্তি-সকলের সামঞ্জস্য সাধন করা তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়ে—সে সামঞ্জস্য সাধক কে? না বিষয়-বুদ্ধি। বিষয়-বুদ্ধি প্রবৃত্তির ন্যায় অন্ধ নহে। অন্ধ ভাবে উপস্থিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা স্বার্থ সাধন নহে, দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দে আপনি সুখ উপভোগ করিব ইহাই প্রকৃত স্বার্থ। এই লক্ষ্য সাধন করিতে গিয়াই স্বার্থ, পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি-সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে;—এখন জিজ্ঞাস্য এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে কে সামঞ্জস্য সাধন করিবে? প্রতিবেশীর ভূমি কাড়িয়া লওয়া আমার স্বার্থ, সেই ভূমি দখলে রাখা তাহার স্বার্থ, এই দুই স্বার্থের সামঞ্জস্য কে করিবে? ধর্ম্মবুদ্ধিই তাহা করিতে পারে। এখন এই একটা কথা উঠিতে

পারে, যে, অন্যের স্বার্থ না মানিয়া চলিলে আপনার স্বার্থ রক্ষা করা যায় না দেখিয়া—আপনার স্বার্থের অনুরোধেই লোকে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয়-বুদ্ধিই আপনার স্বার্থ ও পরের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, তাহার জন্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে ডাকিয়া আনিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে—Honesty is the best policy সদাচারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নয়-কৌশল,—ইহা আমরা অস্বীকার করি না—কিন্তু যাহারা স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে (Policyর খাতিরে) সৎ হয়, তাহাদিগকে আমরা প্রকৃত সজ্জন বলি না। ইহা এত স্পষ্ট সত্য যে, ইহার ব্যাখ্যা-বাহুল্য দ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটিকে ভারাক্রান্ত করিব না।

তাহা হইলেই—কেবল 'আপনার ভাল' এ কথাটি ছাড়িয়া দিয়া আত্মপর নির্ব্বিশেষ মঙ্গলের অভিপ্রায়কে অবতারণা করা আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে,—সেই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই স্বার্থগণের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সমর্থ। ইহাকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যাইতে পারে না—ইহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধি। বিষয়-বুদ্ধির লক্ষ্য শুদ্ধ কেবল আপনার মঙ্গল, এক কথায়—স্বার্থ; ধর্ম্ম-বুদ্ধির লক্ষ্য আত্মপর-নির্ব্বিশেষ অনিরুদ্ধ মঙ্গল, এক কথায়—পরমার্থ।

আপনার প্রবৃত্তিগণের সামঞ্জস্য-কারী কেন্দ্র-স্বরূপে আপনাকে না দেখিলে যেমন স্বার্থসাধনের কোন অর্থ থাকে না, তেমনি সকল স্বার্থের সামঞ্জস্য-কারী কেন্দ্রস্বরূপে পরমাত্মাকে না দেখিলে পরমার্থের বা ধর্ম্মের কোন অর্থ থাকে না। জগতের প্রকৃত মঙ্গল একটী আছে এবং সে মঙ্গল সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তোমার আমার জ্ঞানেতে পাওয়া যায় না—তাহা [illegible] মূলস্থিত জ্ঞানেতেই প্রকাশিত [illegible] সেই [illegible] জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য—প্রবৃত্তি এবং স্বার্থের রাজ্য হইতে অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। একই কার্য্য প্রবৃত্তি অনুসারে, স্বার্থ অনুসারে, পরমার্থ অনুসারে, কৃত হইতে পারে; কিন্তু সেই কার্য্যের মূল্য অবধারণ করিতে হইলে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করা চাই যে, তাহার মূল-প্রবর্ত্তক উহাদের কোন্‌টি? প্রবৃত্তি, স্বার্থ না পরমার্থ? মনে কর কোন ব্যক্তি একজন ইংরাজের দোকানে একটা স্বর্ণ ঘটিকা ক্রয় করিল; ঘড়ির চাকচিক্যে মোহিত হইয়া সে আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও উহা কিনিতে পারে; আর, পরমার্থের বিরোধী স্বার্থসিদ্ধির জন্যও কিনিতে পারে, কাহাকেও উৎকোচ দিয়া ভুলাইবার জন্য কিনিতে পারে; আবার, পরমার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যও কিনিতে পারে। এইরূপ দেখা যাইতেছে অন্ধ উত্তেজনার কার্য্যকেই আমরা বলি প্রবৃত্তির কার্য্য; শুদ্ধ কেবল আপনার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া যে কার্য্য কৃত হয় তাহাকে আমরা বলি স্বার্থ; পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে কোন কার্য্য করা হয় তাহাকেই বলি পরমার্থ। আপনাদের নিজের মঙ্গল-অভিপ্রায়ের সজ্ঞান-মূলাধার যেমন আমরা আপনারা, তেমনি সমস্ত জগতের মঙ্গল অভিপ্রায়ের সজ্ঞান মূলাধার পরমাত্মা। "স্বার্থ" এই একটি কথার মধ্যে কতগুলি কথা আছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; প্রথম, আপনার ভালো'র দিকে লক্ষ্য; দ্বিতীয়, সে লক্ষ্য প্রবৃত্তির ন্যায় অন্ধ লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাহার মূলে জ্ঞান আছে; তৃতীয়, সেই জ্ঞানটিকে ছাড়িয়া দিলে সে লক্ষ্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; চতুর্থ শুধু যে আমার জ্ঞান না থাকিলে আমার লক্ষ্য থাকে না তাহা নহে, কোন স্থলেই জ্ঞান ভিন্ন লক্ষ্য থাকিতে পারে না, ইহা একটি ধ্রুব মূল তত্ত্ব;

তেমনি "পরমার্থ" এই কথাটির মধ্যেও আর কতকগুলি কথা আছে ; প্রথম, আত্মপর-নির্ব্বিশেষ সমস্ত জগতের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য ; দ্বিতীয়, সে লক্ষ্য অন্ধ লক্ষ্য নহে ; তৃতীয়, তাহা স্বার্থের ন্যায় অল্প জ্ঞানের ক্ষুদ্র লক্ষ্য নহে, তাহা পূর্ণ জ্ঞানের মহান্ লক্ষ্য। এই যে পারমার্থিক ধ্রুব মঙ্গল, ইহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাই ধর্ম্মবুদ্ধির প্রাণ, এইরূপ শ্রদ্ধার বলেই আমরা বলি যে কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য করিতেছি। কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য করার অর্থ ইহা নহে, যে তাহার কোন উদ্দেশ্য নাই। সে উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাইয়া আছে, সেই জন্য সে কথাটা মুখে বলা কেবল বাচালতা বলিয়া মনে হয়। যেমন আমরা বায়ুর ভার বহন করা সত্ত্বেও ভার-হীন হালকা শরীরে আছি, তেমনি কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিবার সময় উদ্দেশ্য-সাধনের ভারে আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়ি না। প্রবৃত্তির অতীত নিষ্কাম কার্য্য এবং স্বার্থের অতীত নিঃস্বার্থ কার্য্য করিলে তাহাতেই বুঝাইয়া যায় যে, জগতের মঙ্গলের জন্য, পরমার্থের জন্য, কার্য্য করিতেছি ; এই জন্য সে কার্য্য করিবার সময় আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, তাহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। অনেক সময় অজ্ঞানবশতঃ মনে করি বটে যে তাহা নিষ্ফল হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে, কেন না তাহার মূলে ধ্রুব মঙ্গল রহিয়াছে। কমটের শিষ্যেরা বলিতে পারেন যে, ধ্রুব মঙ্গলের প্রতি ঐ যে তোমার বিশ্বাস উটি অন্ধ বিশ্বাস। তাঁহার জানা উচিত যে আপেক্ষিক সত্য এবং আপেক্ষিক মঙ্গলের মূলে পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ মঙ্গল বর্ত্তমান আছেই আছে—এ বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নহে, ইহা একটি গভীর নিগূঢ়তত্ত্ব; এটি দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান-মূলক পাকা সিদ্ধান্ত, অন্ধ-ভক্তি-মূলক কাঁচা সিদ্ধান্ত নহে। স্পেনসরের ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের ঐকান্তিক পক্ষপাতী ব্যক্তিকেও অগত্যা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে যে, সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলে পরাকাষ্ঠা মূল সত্য বর্ত্তমান। এ তত্ত্বটি, তাঁহার মতে, যৎপরোনাস্তি ধ্রুব, অভ্রান্ত এবং অকাট্য সত্য। আমরা আরো বলি যে, জগতের মূল উদ্দেশ্য জগতের মঙ্গল, এবং সে উদ্দেশ্য মূল সত্যেতেই ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—তিনিই ধর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক।

এইটুকু বলিয়াই আমরা এখানে ক্ষান্ত হইলাম। এ প্রস্তাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের নিজের আদর্শ কি তাহাই বলিলাম ; কমটের কিরূপ আদর্শ তাহার যদি একটি সংক্ষিপ্ত অবয়ব কৃষ্ণকমল বাবু পরে প্রকাশ করেন ত তখন আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ আরো খুলিয়া বলিবার চেষ্টা পাইব ; আর, আমাদের এই আদর্শ সম্বন্ধে যদি তাঁহার কিছু বলিবার থাকে তাহা বলিলে আমরা অতি আহ্লাদের সহিত তাহার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিব। ভারতী।

ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতৃভাব।

এক ঈশ্বর পিতা আর তাঁর সৃষ্ট মনুষ্য পরস্পর ভ্রাতা ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহা মূল ভাব। ইহার অন্যথায় অবশ্যই দোষ। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন জাতি [illegible] না করিলে এই ভ্রাতৃভাব রক্ষা পায় না। ইহা তাঁহারদের নিতান্ত অত্যুক্তি ও অনুদারতা। ভ্রাতৃভাব পদার্থটা কি, কিসে হয় আর কিসে যায়। এই টুকু বিচার করিতে গেলে বোধ হয়, ভ্রাতৃভাব বাহিরের বস্তু নয়, সম্পূর্ণ [illegible]। তুমি আমার [illegible] [illegible] [illegible] অন্যের সহিত মেলোনা, [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] দূর করিয়া ভ্রাতৃভাবে

অন্যকে আলিঙ্গন না করিতেছে, ততক্ষণ সে তোমার ভ্রাতা নয়। আহার কি বিবাহ, কি আর যা কোন উপায়ই বল না, কোনটিই ইহার জনক নয়। একমাত্র হৃদয়ই ইহার জনক।

এখন দেখ হিন্দুশাস্ত্রের স্পষ্ট উপদেশ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও মৈত্রী। নানারূপ বর্ণ-বিভাগ সত্ত্বেও এই সাম্য ও মৈত্রী হিন্দুরা কিরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ইহার আলোচনা আবশ্যক। এখনই বলিলাম, ভ্রাতৃভাব বাহিরের বস্তু নয় ইহা সম্পূর্ণ হৃদয়ের। আহার বিবাহাদি বাহ্য ভাবে ইহার জন্ম নয় হৃদয়ের ঔদার্য্যেই ইহার জন্ম। আবার এই ঔদার্য্যের প্রতি কারণ একমাত্র ধর্ম্মানুরাগ। যদি হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্যকে নিশ্চয় ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে। কোনও বাধা কোনও প্রতিবন্ধক মনুষ্যের এই ভাবকে রোধ করিতে পারে না। হিন্দুজাতি ধর্ম্ম-প্রধান। ইহার আহার বিহারে ধর্ম্ম। এমন ধর্ম্ম-প্রাণ জাতি পৃথিবীতে আজও উদয় হয় নাই। এখন দেখ, যদিও হিন্দুর মধ্যে নানা বর্ণবিভাগ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহারা হৃদয়ের একমাত্র ধর্ম্মোত্থিত ঔদার্য্যে সাম্য ও মৈত্রী রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। অতএব নিজে ধর্ম্ম-প্রাণ হও, হৃদয় ঈশ্বরানুরাগে প্রশস্ত কর, তখন বিনা চেষ্টায় তোমার ভ্রাতৃভাব পৃথিবীময় বিস্তার হইতে থাকিবে। হিন্দুর মধ্যে বর্ণবিভাগ সত্ত্বেও যে কেবল হৃদয়ের ঔদার্য্যে এই সাম্য ও মৈত্রী রক্ষা হয়, ইহার দৃষ্টান্ত অতীত কালের দূরে দেখিতে হইবে না। নিকটেরই একটা দেখ। মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্ম বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুলে। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন গলায় উপবীত। তিনি উপবীত ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যখন তিনি জাপানের রাজনৈতিক কার্য্য সোৎসুক নেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন সেখানকার প্রজাদিগের একটা সুখের কথা শুনিয়া এমন হৃষ্ট হন যে তিনি তদুপলক্ষে একটা ভোজ দেন। কোথায় জাপানের প্রজা আর কোথায় তিনি। তবে তাঁর এত কিসের আনন্দ। ইহাই সেই হিন্দুর সাম্য ও মৈত্রী, যাহা বর্ণের কথা দূরে থাক একটা আকাশ-পাতাল-প্রভেদ জাতির সুখ দেখিয়া তাঁর হৃদয়কে স্ফীত করিয়াছিল। তাই বলি বর্ণ বা জাতি ভ্রাতৃভাবের বিরোধী নয়। যেখানে ধর্ম্ম ও হৃদয়ের ঔদার্য্য, সেই খানেই ইহার প্রতিষ্ঠা। অতএব ব্রাহ্মসমাজ জাতি উচ্ছেদ না করিলেও ভ্রাতৃভাব এই উপায়ে রক্ষা করিতে পারেন।

আচ্ছা, প্রাচীনকালের সাম্য ও মৈত্রীবাদ ছাড়িয়া দেও, দিয়া দেখ এখনই বা হিন্দু-ব্যবহার কিরূপ। তুমি যদি নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াও, তবে তুমি ঠিক্ বুঝিতে পারিবে না। পার আর নাই পার, আমি কিন্তু পল্লীগ্রামের গ্রাম-বৃদ্ধদিগের কথা তোমাকে বলিব। এই সমস্ত ভদ্রবংশীয় বৃদ্ধ কর্ত্তা দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বৈঠক করেন। গ্রামের নীচ বর্ণ কৃষকেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বইসে। এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বৃদ্ধ কর্ত্তা মহাভারতের ধর্ম্ম ও উপাখ্যান বলিতেছেন। ইহাতে কৃষকের যথেষ্ট উপকার। আবার কৃষক কৃষিকার্য্যের উল্লেখ করিতেছে, ইহাতে ঐ বৃদ্ধ কর্ত্তাদিগের কৃষি জ্ঞান-লাভে উপকার। কিন্তু এই সম্মিলনে বড় একটী মধুর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চ বর্ণ নীচ বর্ণের সহিত নানা রূপ গ্রাম-সম্পর্কে আবদ্ধ এবং বর্ণগত ব্যবধান থাকিতেও সম্মান ও স্নেহের পরস্পর আদান প্রদান চলে। সে কি আশ্চর্য্য সমদুঃখসুখতা। কি আশ্চর্য্য ভ্রাতৃভাব। ইহা সেই প্রাচীন ধর্ম্মশিক্ষার

[illegible] সংস্কার, যাহা যুগযুগান্তরের পর [illegible] করিয়া এখনও হিন্দুর মনে সাম্য ও মৈত্রীর বীজ রক্ষা করিতেছে। আবার এই হিন্দুজাতির মধ্যে এই ভ্রাতৃভাবের একটা বিশ্বজনীনতাও দেখ। আজ হিন্দুর দুর্গোৎসব। যে কোন গৃহে যাও দেখিবে মিষ্টবাক্য ও মিষ্টান্ন সকলকেই দেওয়া হইতেছে। হিন্দু উপস্থিত অনাহারে ফিরিবে না। মুসলমান উপস্থিত খাদ্য সামগ্রী তাহাকেও দিতে হইবে। আজ ধর্ম্মোৎসবে হিন্দুর হৃদয় নির্ম্মুক্ত। আজ জাতি নির্বিশেষে হিন্দুর হস্তও নির্ম্মুক্ত। শুধু এই দুর্গোৎসব বলিয়াই বা কেন। প্রতিগৃহে মুষ্টিভিক্ষার সময় কি হয়। তাহাও তো এই জাতি-নির্বিচারে বিতরণ। এখন জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি ইহার ভিতর ভ্রাতৃভাবের কোন লক্ষণ পাও না?

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মোৎসব। এ দেশের আবাল বৃদ্ধের সংস্কার এই যে অযোধ্যাপতি রাম এই দুর্গা দেবীর আরাধনা করিয়া রাবণবধে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। যখন এই গ্রন্থ প্রস্তুত হয় সে সময় এই ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজা ছিল না। তখন বৈদিক ধর্ম্মের কাল। কিন্তু এস্থলে অনেকে বলিবেন রাবণ শিবলিঙ্গ পূজা করিত, উত্তরকাণ্ডে তাহার নিদর্শন আছে। এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু উত্তরকাণ্ড আদৌ বাল্মীকিরচিত রামায়ণের অন্তর্গত নয়। এই রামায়ণ রচনার অনেক পরে কোন কবি ইহা রচনা করেন। রামায়ণের নাম রাবণবধ কাব্য। রাবণবধেই এই কাব্যের পরিসমাপ্তি। উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকীয় রামায়ণের অন্তর্গত নয় ইহার ভূরিই প্রমাণ আছে। প্রস্তুত বিষয়ের সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই এজন্য তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফলত রামায়ণ যখন রচিত হয় তখন এ দেশে মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তনা হয় নাই। তখন বৈদিক ধর্ম্মেরই বহুল প্রচার ছিল। যাঁহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রামায়ণ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা তন্মধ্যে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবেন। এই রামায়ণে দেখা যায় রাম রাবণবধের পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের স্তুতিবাদ এই গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। ইহার নাম আদিত্যহৃদয় স্তোত্র। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রামানুজ প্রভৃতি সকলে এই আদিত্যহৃদয়ের ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা ব্রহ্মপ্রতিপাদক স্তোত্র। আর এইটী যে টীকাকারদিগের কোন মনঃকল্পিত নূতন অর্থ তাহাও নয়। যাঁহারা বেদের গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন ঐ মন্ত্রেরই সূর্য্যপক্ষে আর এক অর্থ আছে। ফলত যাহা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত তাহাকে ব্রহ্মপক্ষে আনা বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত। যাঁহারা আত্মায় ব্রহ্মকে দেখিতে না পান তাঁহারা জগতের মধ্যবিন্দু সূর্য্যে তাহা দেখিবেন এইটী পূর্ব্বকালের বিশ্বাস। ফলত রামায়ণের আদিত্যহৃদয় ব্রহ্মস্তোত্র মাত্র। সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক রাম রাবণবধের পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনাই করিয়াছিলেন। যদি বল সূর্য্য রামের কুলপ্রবর্ত্তক, রাম তাঁহারই উপাসনা করেন। এ কথা স্বীকার করিলেও বলা যায় যে বর্ত্তমান দুর্গোৎসব রামের প্রবর্ত্তিত নয়। কিন্তু বস্তুত আদিত্যহৃদয় ব্রহ্মস্তোত্র। ইহার প্রত্যেক অক্ষর ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিতেছে। তবে যে এ দেশের সাধারণ সংস্কার ভিন্ন রূপ তাহার কারণ পুরাণ। কালিকা পুরাণে

এই রাবণবধের পূর্ব্বে রামের দুর্গামূর্ত্তি পূজার উল্লেখ আছে। কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া রামের চরিত্র নির্ণীত হয় এবং যাহা রামের জীবদ্দশায় রচিত সেই বাল্মীকীয় রামায়ণে এই দুর্গোৎসবের কোনও উল্লেখ নাই। ইহা রামায়ণ রচনার অনেক পশ্চাৎ পৌরাণিক কবিরা কল্পনা করিয়া যান। হিন্দুর মধ্যে তাহাই দুর্গোৎসব।

দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রকাণ্ড হিন্দু সম্প্রদায় আছে তাহাদের মধ্যে এই দুর্গোৎসব এখনও হয় না। তবে নবরাত্রি নামে এই সময় একটা জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে এই মাত্র। এখন দেখা আবশ্যক একই জাতির ভিতর এরূপ পৃথক ফল কেন? কোথাও মূর্ত্তিপূজার বাহুল্য আর কোথাও বা যৎসল্প। কেন এইরূপ? যাহারা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন বৈদান্তিক ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ ঐ দেশের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে (১)। বেদোক্ত যাগযজ্ঞের পর এই সূক্ষ্মধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নানক প্রভৃতির সম্প্রদায়ও যথেষ্ট আছে। ফলত একেশ্বরবাদ যে ঐ প্রদেশের অনেক স্থল অধিকার করিয়া আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে মূর্ত্তিপূজার বাহুল্য কেন। আমাদের বোধ হয় এদেশের জলবায়ুর অবস্থা তাহার কতকটা কারণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু বড় প্রবল। দুরন্ত শীত প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। ইহা দ্বারা স্বভাবতই লোক সকল কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। আর তথায় জীবিকাও তাদৃশ স্বচ্ছল নয়। অনায়াসে পার্ব্বত্য ভূমি হইতে শস্যলাভ হয় না। যাঁহারা ঐ অঞ্চলের শ্রমজীবি সাধারণের অবস্থা জানেন, একথা তাঁহাদের অবশ্যই সপ্রমাণ বোধ হইবে। ফলত লোক সকল কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্ম তথায় স্থান পাইয়াছে। কারণ ইহাতে সাধনের কষ্ট আছে। অনায়াসে এ ধর্ম্মে ফল লাভ হয় না। কিন্তু বঙ্গদেশ ইহার বিপরীত। এখানে শীতবাতাতপ সহনীয়। জীবিকা স্বচ্ছল। এখানে সাধারণত অন্নকষ্ট নাই, এ জন্য লোক সকল সুখপ্রিয় আমোদপ্রিয়। সম্ভবত এই কারণেই মূর্ত্তিপূজা এতদ্দেশে বাহুল্য রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ইহার সহিত আমোদের বিলক্ষণ যোগ। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, হিন্দুজাতির ধর্ম্মের অবস্থা সাধারণত এক হওয়া উচিত। দেশের জলবায়ু যদি সাধনের কষ্ট স্বীকারে বিরতি উৎপাদন করিয়া থাকে তবে তাহা স্বাভাবিক হইলেও দূরপণেয় নয়। ইহা যে একেশ্বরবাদের বাধাজনক হয় ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

(১) রামমোহন রায়ের বেদান্ত দর্শনের ভূমিকা দেখ।

বস্তু-গুণ-তত্ত্ব।

গত সংখ্যক পত্রিকায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের যতখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গুণ—কি অর্থে বিশেষণ—কি অর্থে লক্ষণ—কি অর্থে ধর্ম্ম, ইহা সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু গুণ—কি অর্থে গুণ (অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জু) তাহা এখনো প্রদর্শিত হয় নাই; তাহাই এখন বিবেচ্য।

গুণ জ্ঞানকে বন্ধন করে—এই অর্থেই গুণ। বর্ণ ভাবিবার সময় শব্দাদিতে জ্ঞানের যাইতে বারণ; শ্যাম বর্ণ ভাবিবার সময় সে বারণ তো আছেই—তাহার উপর আবার শ্বেত-নীলাদি বর্ণে জ্ঞানের যাইতে বারণ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ভাবিবার সময় শব্দাদিতেও জ্ঞানের যাইতে বারণ, শ্বেত-নীলাদি বর্ণেতেও যাইতে বারণ, তাহার উপর আবার মলিন শ্যামবর্ণেও যাইতে বারণ; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ভাব্য বস্তুরে যতই অধিক গুণ আরোপ করা যায়—ততই

জ্ঞানকে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে বাঁধিয়া রাখা হয়; এই জন্যই গুণের নাম হইয়াছে গুণ (কি না বন্ধন রজ্জু)।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, জগতে যত প্রকার গুণ আছে সকলের সঙ্গেই সত্ত্ব রজ এবং তমো এই তিনটি গুণ লাগিয়া থাকে;—সত্ত্ব-গুণ কিনা প্রকাশ-গুণ, তমোগুণ কিনা অপ্রকাশ-গুণ, রজোগুণ কিনা প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ এইরূপ চাঞ্চল্য-গুণ। এই তিনটি প্রধান গুণ আমাদের জ্ঞানকে কিরূপে বন্ধন করে—এইস্থলে তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রকাশ্য গুণ প্রকাশিত হউক্—এইরূপ একটি আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানের স্বভাব-সিদ্ধ; এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইলেই জ্ঞান সুখ-বন্ধনে বদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকাশ্য-গুণের নূতন প্রকাশের সময় জ্ঞানেতে যেমন সুখোদয় হয়—সে প্রকাশ পুরাতন হইয়া গেলে তেমন-টি আর হয় না; জ্ঞানের সমক্ষে কোন-একটি গুণ অজস্র প্রকাশ পাইতে থাকিলে তাহা কাল-ক্রমে এমনি এক-ঘেয়ে হইয়া উঠে যে, তখন তাহার প্রকাশত্ব ঘুচিয়া যায় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুখদায়িত্বও চলিয়া যায়—এমন কি অনেক সময়ে তাহা বৈরক্তি-জনক হইয়া উঠে। এক যিনি চিরকালই নূতন তিনি ভূমা (অর্থাৎ অসীম মহান্) পরমেশ্বর—তিনিই কেবল পুরাতন হ'ন না, তিনি সকল কালেই সর্ব্বকের সুখ-দাতা; এই জন্যই উপনিষদে আছে "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"। বিষয়-প্রকাশের প্রকাশত্ব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তাহা সুখদায়ী, অজস্র ব্যবহার দ্বারা তাহার প্রকাশত্ব চলিয়া গেলেই তাহা অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; প্রকাশের প্রকাশত্বই সত্ত্ব-গুণ—তাহাই জ্ঞানকে সুখ-বন্ধনে বদ্ধ করে। প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানের স্বভাব-সিদ্ধ, সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার পক্ষে যদি সহস্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তথাপি সে আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানকে তিল-মাত্র ছাড়ে না; কিন্তু প্রকাশ হইতে যখন প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহা দুঃখের কারণ হয়;—প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাই রজোগুণ—ইহা জ্ঞানকে দুঃখ বন্ধনে বদ্ধ করে। প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যখন চরিতার্থতা-বিহনে নিতান্তই অসাড় হইয়া পড়ে—তখন উপায়াভাবে জ্ঞান একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিয়া—প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়া—অপ্রকাশে নাবিয়া পড়ে; এইরূপে, তমোগুণ জ্ঞানকে বিষাদ-বন্ধনে বদ্ধ করে। নিম্নে ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সর্প আলোকের ভক্ত নহে,—অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরের অভ্যন্তরে সে তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করে; কিন্তু মনুষ্যের চক্ষে আলোক কি স্পৃহণীয় বস্তু! যদি এক সপ্তাহ ধরিয়া আকাশ-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে মনুষ্যের মনোমধ্যে আলোকের ক্ষুধা কেমন প্রবল উদ্দীপিত হইয়া উঠে;—ইহা দুঃখের অবস্থা। পরদিন প্রত্যূষে—সিংহ যেমন জটা ঝাড়া দিয়া গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ যখন, নূতন সূর্য্য, কিরণ-মালা বিক্ষিপ্ত করিয়া মেঘ মুক্ত আকাশে অভ্যুত্থান করে, তখন কেমন আমাদের [illegible] [illegible] আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে,—ইহা সুখের অবস্থা; কিন্তু যদি এক মাস ধরিয়া আকাশ নিরন্তর ঘন-মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, তবে আলোকের বিরহ-জনিত দুঃখ ক্রমে বিষাদের আকার ধারণ করে; তখন আমাদের মনের [illegible] দমিয়া যায়, তখন নিশ্চেষ্টতা, আলস্য, শৈথিল্য, অরুচি-[illegible], এই সকল ভাব [illegible] আমাদের মনকে [illegible] করিয়া [illegible]

বিষাদের অবস্থা যদি কাল-ক্রমে কোন মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, মনুষ্য যদি গহ্বর-শায়ী সর্পের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় তবে মনুষ্যের জ্ঞান মোহে অভিভূত হইয়া জড়বৎ হইয়া যায়,—আত্মা তমোগুণে বদ্ধ হইয়া পড়ে। দুঃখের অবস্থা—অশান্তির অবস্থা—যদি মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, মনুষ্য যদি সুখের কামনায় সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায় অথচ কিছুতেই সুখ লাভ না করে, যদি এরূপ হয় যে, সর্ব্বদাই তাহার মন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছে, সর্ব্বদাই রুষ্ট, সকলের উপরেই চটা, মনুষ্য যদি ব্যাঘ্রের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার জ্ঞান অশান্তির বিভ্রান্তিতে কি পর্য্যন্ত না কলুষিত হইয়া পড়ে,—ইহাকেই বলে রজোগুণে বদ্ধ হওয়া। যদি সুখের অবস্থা মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়—যদি তাহার মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকে, পুণ্যজ্যোতিতে মুখ-চক্ষু সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে, যদি এরূপ হয় যে, তাহার মুখ দেখিলে নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়—ভয়ার্ত্তের হৃদয়ে অভয়ের সঞ্চার হয়—মুমূর্ষু হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার হয়, তবেই তাহার জ্ঞান মুক্ত-ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তখনই জ্ঞানের স্বধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়; ইহাকেই বলে সত্ত্ব-গুণে বদ্ধ হওয়া। সত্ত্বগুণ আত্মাকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়—এই পর্য্যন্ত; এমন নয় যে, একেবারেই আত্মাকে মুক্তি ধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়; সত্ত্বগুণ যদি একেবারেই আত্মাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিতে পারিত তবে সত্ত্ব-গুণকে বন্ধন বলা কোন-মতেই শোভা পাইত না। মনুষ্যের আত্মা যতই কেন জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিত হউক না, সেই অবস্থাতেই যদি মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকে, তাহার উপর আরো উচ্চে উঠিবার প্রয়াস না করে, [illegible] আত্মার বন্ধন; সর্ব্ব-[illegible] আর ভুল নাই।

অনেক সময়ে মনুষ্যকে এমন দেখা যায় যে, তিনি ঐরূপ সত্ত্বগুণের বন্ধনে তুষ্টি অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকাতে—যেটুকু জ্ঞানধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট এইরূপ মনে করাতে, কাল-ক্রমে বিদ্যামদ ও ধর্ম্ম-মদ বলিয়া একটা রাজসিক মত্ততার ভাব তাঁহার মনোমধ্যে অজ্ঞাতসারে আধিপত্য বিস্তার করিতে অবসর পায়; এবং সেই রাজসিক ভাব হইতে—জ্ঞান-ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বিরতি—এইরূপ এক তামসিক নিশ্চেষ্টতার ভাব জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে তাঁহাকে আরো নীচে ফেলিয়া দেয়। মনুষ্যের জ্ঞান-ধর্ম্ম যদি পরিপূর্ণ জ্ঞান ধর্ম্ম হইত, তবে তাহাতে ভর করিয়া থাকিলেই মনুষ্য একেবারেই বন্ধন-মুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন সত্ত্বগুণও আত্মার বন্ধন-স্বরূপ—ইহাতে আর ভুল নাই।

সাধারণতঃ সকল গুণই জ্ঞানকে বন্ধন করে—তাই তাহারা গুণ (অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জু) বলিয়া উক্ত হয়—ইহা আমরা সর্ব্বাগ্রে দেখাইয়াছি; তাহার পর সত্ত্বরজস্তমো এই তিনটি প্রধান গুণ (যাহা জগতের সকল গুণেরই গুণত্ব সাধন করে) তাহা কিরূপে আত্মাকে সুখ-দুঃখ-মোহে বদ্ধ করে—প্রকাশের সঙ্গে সুখের কিরূপ সম্বন্ধ, প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা মাত্রাটির সঙ্গে দুঃখের কিরূপ সম্বন্ধ, এবং অপ্রকাশের সহিত বিষাদের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা দেখাইয়াছি। আমরা সত্ত্ব রজস্তমো গুণকে প্রকৃত প্রস্তাবেই গুণ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছি; কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের দুই একজন টীকাকার সত্ত্ব রজস্তমো গুণকে তিনটি দ্রব্য বলিয়া ধরিয়াছেন,—গুণ যে কি অর্থে গুণ (বন্ধন-রজ্জু) তাহা তাঁহারা প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই;—তাঁহারা বলেন—বন্ধন করিবার শক্তি কেবল বস্তুরই আছে,—দড়ি দিয়া বন্ধন করা যাইতে

পারে, সুতা দিয়া বন্ধন করা যাইতে পারে, ইত্যাদি। ইহাঁদের প্রতি বক্তব্য এই যে, ঘোড়াকে বা গরুকে বন্ধন করা স্বতন্ত্র, আর, আত্মাকে বন্ধন করা স্বতন্ত্র ;—সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য-গুণে মনুষ্যের মন কখন কখন এরূপ কঠিন বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, কোন পশুকে কোন রজ্জু দিয়া সেরূপ দুর্ম্মোচ্য বন্ধনে বদ্ধ করা যায় না। সত্ত্ব রজস্তমোগুণকে আমরা গুণই বলি—বস্তু বলি না ; কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, ঐ তিনটি গুণের মূলে বস্তু নাই—উহারা শূন্যে শূন্যে অবস্থিতি করে ;—গুণমাত্রেরই মূলে আধার-বস্তু থাকিতে চায়—পূর্ব্বে ইহার আমরা যথেষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা বাহুল্য। এখানে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, সত্ত্বরজস্তমোগুণ কোন্ বস্তুর গুণ, তবে তাহার উত্তর আমরা নিম্নে দিতেছি।

তমো-গুণ জড়বস্তুরই মুখ্য ধর্ম্ম—এ জন্য তাহার আর এক নাম জড়তা ; বুদ্ধি যেমন প্রকাশ-ময়—জড়তা সেইরূপ তমোময় ইহা বলা বাহুল্য। রজোগুণ মনের মুখ্য ধর্ম্ম—এজন্য তাহার আর এক নাম প্রবৃত্তি ; প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষাময়—উদ্বেগ-ময়—ইহা বলা বাহুল্য। সত্ত্বগুণ আত্মার মুখ্য ধর্ম্ম—এ জন্য তাহার এক নাম বুদ্ধি ;—বুদ্ধি প্রকাশময় ইহা স্পষ্টই পড়িয়া আছে। এখানে এইটির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা আবশ্যক যে, আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে তিন-গুণই আপেক্ষিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;—দৈর্ঘ্য যেমন প্রস্থ এবং বেধকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না, ত্রিগুণের কোন গুণই সেইরূপ অবশিষ্ট দুই গুণকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না,—তবে কোথাও কোন গুণ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে, কোথাও বা অভিভূত হইয়া রহে অর্থাৎ চাপা পড়িয়া থাকে। জড়তা যদিও জড়বস্তুর মুখ্য ধর্ম্ম কিন্তু জড়বস্তুতেও সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং রাজসিক চাঞ্চল্য কিয়ৎ পরিমাণে সংযুক্ত আছে,—তাহা যদি না হইত তবে, জড়বস্তু জ্ঞানের উপর কার্য্য করিতে পারিত না—জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেও পারিত না ; তেমনি আবার রাজসিক চাঞ্চল্য যদিও মনের মুখ্য ধর্ম্ম, কিন্তু মনেতেও সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং তামসিক জড়তা কতক পরিমাণে আছে ইহা বলা বাহুল্য ; পুনশ্চ, বুদ্ধি যদিও মুখ্যরূপে আত্মার ধর্ম্ম, কিন্তু আমাদের আত্মা অপূর্ণ বলিয়া তাহাতেও কিয়ৎ পরিমাণে রাজসিক চাঞ্চল্য এবং তামসিক জড়তা মিশ্রিত আছে। সত্ত্বগুণের ভাবার্থ কি এখন তাহা বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ; যথা,—সত্ত্ব-গুণ বলিতে এইরূপ এক আপেক্ষিক জ্ঞান এবং আনন্দ বুঝায় যাহার সহিত জড়তা এবং চাঞ্চল্য কতক পরিমাণে মিশ্রিত আছে ;—এক কথায় সত্ত্ব-গুণ বলিতে অপূর্ণ জ্ঞান এবং অপূর্ণ আনন্দ বুঝায় ;—এই জন্য শাস্ত্রকারদিগের মতে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দ সত্ত্বগুণ শব্দের বাচ্য নহে। কোন কোন দর্শনকার ঈশ্বরের ঐশগুণকে শুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; শুদ্ধ সত্ত্ব—কিনা যে সত্ত্বগুণের সহিত রাজসিক চাঞ্চল্য এবং তামসিক জড়তার সংস্পর্শ মাত্র নাই ;—ইহার অর্থ আর কিছুই নহে কেবল এই যে, ঈশ্বর পরিপূর্ণ-চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু ঈশ্বরের এই যে, শুদ্ধ-সত্ত্ব গুণ, ইহা ত্রিগুণের অন্তর্গত সত্ত্ব-গুণ নহে ;—কেন না সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রে ইহা যার পর নাই স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তিন গুণের কোন গুণই অবশিষ্ট গুণদ্বয়কে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না ; সুতরাং শুদ্ধ সত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক জগতের [illegible] সম্ভবে না। জীবাত্মার জ্ঞান-প্রেমাদি [illegible]

গুণ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ হইলেও তাহা চাঞ্চল্য এবং জড়তার সহিত কিছু না কিছু জড়িত থাকিবেই থাকিবে; এক কথায়—জীবাত্মাতে জ্ঞান এবং আনন্দ গুণ পূর্ণ মাত্রায় থাকিতে পারে না। এইরূপ অপূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দকেই শাস্ত্রকারেরা সত্ত্বগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাই তাঁহাদের এ কথা আমাদের শিরোধার্য্য যে, রজস্তমোগুণের ন্যায় সত্ত্বগুণও পরমাত্মাতে অর্শিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা পরমাত্মাকে কি অর্থে নির্গুণ বলিয়াছেন—এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। বেদান্ত-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নির্গুণ; যদি ব্রহ্মকে সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত বলা শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত হইত তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন যে, অচিদানন্দ ব্রহ্ম নির্গুণ, অর্থাৎ যাঁহাতে জ্ঞান এবং আনন্দ এদুই গুণ নাই এমন যে ব্রহ্ম তিনি নির্গুণ; তাহা না বলিয়া শাস্ত্রকার অম্লান বদনে বলিতেছেন যে, যাঁহাতে জ্ঞান এবং আনন্দ এদুই গুণ পূর্ণ মাত্রায় আছে তিনি নির্গুণ; একবার যাঁহাকে চিদানন্দ গুণের আধার স্বরূপ সৎপদার্থ এবং পূর্ণ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তাহার পরক্ষণেই তাঁহাকে সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত বলিতেছি—ইহা নিতান্তই প্রলাপোক্তি; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, শাস্ত্রকার, হয় উন্মাদ, নয় তাঁহার বচনের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। কিন্তু কষ্টকল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারকে উন্মাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিতান্তই প্রয়োজনাভাব, কেন না তাঁহার বচনের ভাবার্থ জলের ন্যায় সুস্পষ্ট; সে অর্থ এই যে, পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দ এ দুই ঐশ্বরিক গুণে—সত্ত্বগুণের অপূর্ণতা নাই, রজোগুণের চাঞ্চল্য নাই, তমোগুণের জড়তা নাই; সুতরাং তাহা ত্রিগুণাতীত কিনা নিগুণাতীত। অতএব "ঈশ্বর নির্গুণ" ইহার অর্থ কেবল এই যে, তিনি ত্রিগুণ-বর্জ্জিত; এ নহে যে, তিনি সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত; কেন না, চিদানন্দ গুণ তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বস্তু-গুণ-তত্ত্বের সাগর হইতে আমরা এই মহামূল্য রত্নটি লাভ করিলাম যে, পরমাত্মা জ্ঞান-প্রেমাদি সমস্ত সদ্গুণের পূর্ণ মূলাধার; ইহাতে আমরা আশাতীত ফল-লাভ করিয়া ধন্য হইলাম—এখন করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দে গৃহাভিমুখে প্রয়ান করি।

> একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
> সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
> কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
> সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
>
> উপনিষৎ।

বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষের প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস কোন কালেই ছিল না একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়াদির সমালোচনা-সূত্রে ভারতের পুরাকালিক সামাজিক বৃত্তান্ত যাহা কিছু জানা যায়; নতুবা পদ্যে লিখিত উপাখ্যান ও পৌরাণিক ইতিহাসাদি এতাদৃশ কল্পনা-কলুষিত এবং কবিভাবাপন্ন যে, সমাজসংক্রান্ত মূল কথার অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইলে, কেবল যেন অন্ধকারময় অরণ্যে পরিভ্রমণ করা হয় মাত্র। মুসলমানদিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বে ভারতের প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণাদি সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই; কেবল ধর্ম্মসংক্রান্ত ও খোদিত তাম্র-প্রস্তর-ফলকের প্রমাণাদি গ্রহণ করিলে সেই অন্ধকারাবৃত পথে একটু বিদ্যুচ্ছটার আলোক মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত রচনার পরে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের চরণপ্রান্তে, নেপালের

নিকটবর্ত্তী কপিলবস্তু নগরে, খৃষ্টজন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-রাজ-কুলে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাত্মাই বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক।

আর্য্যদিগের বেদানুমত যাগযজ্ঞাদি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিলুপ্ত করা এবং মনুষ্যমাত্রকেই জগতের সারবত্তায় বিষয়ে সমানাধিকারী প্রতিপন্ন করাই বৌদ্ধধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্ম ভারতে সমুদিত হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই নেপাল, চীন, তাতার, ব্রহ্ম-দেশ ও সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেব মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য ভিক্ষুকগণ জগতের হিতের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম বহুলরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর তৃতীয়াংশের অধিক লোক সেই ধর্ম্মাবলম্বী। সেই ধর্ম্ম এক সময়ে অতি তীব্র তেজে ভারতের বৈদিক ধর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া সহস্রাধিক বৎসর কাল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রভূত তেজের সহিত প্রজ্বলিত ছিল। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীতে রাজা অশোকবর্দ্ধন এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণার্থে ভারতে ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে অনতিকালের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন, উদয়ন প্রভৃতি রাজগণের দৃঢ় যত্নে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্যগণের যে বৈদিক ধর্ম্ম আদিম কাল হইতে বেদের অটল ভিত্তিতে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত ছিল, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্নিবার প্রবাহে একেবারে ভাষমাণ হইয়া গিয়াছিল।

এই ধর্ম্মবিপ্লবে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে কেবল মাত্র কান্যকুব্জ প্রদেশে বৈদিক ধর্ম্ম স্খলিতপদ হয় নাই। তথাকার ব্রাহ্মণেরা দৃঢ়রূপে স্থির প্রতিজ্ঞার সহিত বৈদিক ধর্ম্মে অটলভাবে অবস্থিত ছিলেন। সদাচারীরা এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি হইতে আদৌ বিরত হন নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম-বৈরি-ভয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে কালহরণ করিয়াছিলেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত থাকা সময়ে, বঙ্গদেশ মগধ রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে একটী স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজাদিগের পর অম্বষ্ঠ জাতির রাজা আদিশূর বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুলজীতে কথিত আছে ইনি অত্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মপরায়ণ ও বৌদ্ধমতোচ্ছেদক সম্প্রদায়ের একজন প্রধান নেতা ছিলেন ১। মহারাজার পুত্রোৎপাদনের সম্ভবপর বয়ঃক্রম অতীত প্রায় হইল। তিনি পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুরস্থ ব্রাহ্মণগণকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "আপনারা বেদবিধি মতে যজ্ঞের দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া আমার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করুন।" বৌদ্ধ বিপ্লবে বঙ্গীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়া লোপ হইয়াছিল, সুতরাং কেহই রাজার ঈপ্সিত কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলেন না। অথবা বঙ্গীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণ যজ্ঞে ব্রতী হইলে পতিত হইবেন এই ভয়ে তাঁহারা বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন না। রাজা অনন্যোপায় হইয়া বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক পাঁচটী ব্রাহ্মণের জন্য কান্যকুব্জেশ্বর রাজা আদিশূরের নিকট পত্রসহ দূত প্রেরণ করিলেন। রাজা পত্র প্রাপ্তি মাত্র পঞ্চগোত্রের পাঁচটী ব্রাহ্মণ পাঁচটী শূদ্র ভৃত্যসহ ৯৯৯ সংবতে আদিশূর সমীপে প্রেরণ করিলেন। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বর্ম্ম, চর্ম্ম, ও ধনুর্ব্বাণ [illegible]

১ [illegible]

পূর্ব্বক যোদ্ধবেশে বলীবর্দ্দ যানারোহণে রাজদ্বারে সমাগত হইলে দৌবারিকগণ আদিশূর সমীপে ঈদৃশ অসামান্য বীরবেশ-ধারী ব্রাহ্মণ-পঞ্চের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিল। রাজা ব্রাহ্মণ-পঞ্চের বীরবেশ এবং পাদুকা-সংশ্লিষ্ট পদে তাম্বুল চর্ব্বণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বিরুদ্ধ আচরণ সম্বাদে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চের অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন না। ব্রাহ্মণগণ রাজার ঈদৃশ অসৌজন্যে বিরক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে কৃত-নিশ্চয় হইলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধি এইরূপ যে ঐ সমস্ত তপোধন আত্মমহিমা প্রকাশার্থ শুষ্ক মল্লকাষ্ঠোপরি আশীর্ব্বাদ স্থাপন মাত্রে বিগত-জীবন সেই শুষ্ক স্কন্ধ হইতে তৎক্ষণাৎ নূতন অঙ্কুর নির্গত হইল। এই অলৌকিক ঘটনা দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক রাজকর্ণগোচর হইলে আদিশূর গলবস্ত্রে তাঁহাদিগের সমীপে আসিয়া স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণকে রাজভবনে স্থান প্রদান করিয়া ঈপ্সিত যজ্ঞ সমাধানান্তে প্রচুর ধন রত্ন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়াছিলেন২। কিন্তু বঙ্গদেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণ যে সামাজিক ভয়ে আদিশূরের যজ্ঞে ব্রতী হন নাই, কান্যকুব্জেও সেই ভয়। ইহাঁরা বঙ্গ দেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে বর্ণসঙ্কর বৈদ্য জাতির যজ্ঞে ব্রতী হইয়া ছিলেন এই অযাজ্যযাজন হেতুবাদে সমাজে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন।৩ জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগকে পুনঃসংস্কারের জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পঞ্চ ব্রাহ্মণ সমাজে অপমানিত হইয়া স্বদেশে বাস করা অপেক্ষা দেশ ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ, এই বিবেচনায় শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় পাঁচটী শূদ্র ভৃত্যসহ কান্যকুব্জ ত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়রাজ্যের আদিশূর সমীপে উপস্থিত হইলেন ৪।

এই প্রকারে পঞ্চ ব্রাহ্মণ পুনরাগত হইলে আদিশূর তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বাসার্থে রাঢ় দেশে এক এক খানি গ্রাম প্রদান করিলেন ৫। ব্রাহ্মণেরা সপ্তশতী সমাজ হইতে দার পরিগ্রহ করিয়া রাজদত্ত ভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই সপ্তশতী কন্যাগণের গর্ভে দ্বিজ পঞ্চের ঔরসে উনসপ্তি পুত্র উৎপন্ন হয় ৬। ইহাঁরাই রাঢ়ী শ্রেণীর বলিয়া পরিচিত। কালক্রমে সেই দ্বিজপঞ্চের কান্যকুব্জস্থিত পূর্ব্বদারোৎপন্ন পুত্রগণ পিতৃউদ্দেশে সস্ত্রীক বঙ্গদেশে আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সপত্নী ভ্রাতাদিগের অসমাবেশ হইবে আশঙ্কায় আদিশূর তাঁহাদিগকে বরেন্দ্র ভূমিতে স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বঙ্গে স্থাপন করিলেন এবং বৈমাত্রভ্রাতাদিগের পরস্পর ঈর্ষা জনিত দ্বেষভাব হেতু দুই

---

২ তে পঞ্চ দ্বিজাঃ সুবিধায় [illegible] যজ্ঞং স্বদেশে, [illegible] গমনোৎ সুকাশ্চ।
ধনেন [illegible] চ [illegible] যথা, দেশং [illegible]-তোহভ্যবাদৈঃ।

৩ [illegible] বাহুল্যাৎ [illegible] [illegible]।

৪ পুনর্গতা গৌড় দেশে আদিশূর নৃপান্তিকে।

৫ ব্রহ্মকোটীঃ কামকোটী হরিকোটী স্তথৈবচ;
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ।

৬ রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।

ছন্দোগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্রস্থ দীক্ষিতাঃ।
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদানাত্তু বিপ্রমুখ্যেভ্য এব তে॥
এতেষাং তেন নিগড়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
রাজাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যা শীলগুণান্বিতাঃ।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ॥
সদৃশান্ জনয়ামাসু স্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ।
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপাদ্যথা যথা॥
[illegible] ষোড়শোত্তমাঃ দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
[illegible] ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ।
[illegible] ছান্দড়েকাদশস্মৃতাঃ

কলশমা।

সম্পূর্ণ পৃথক্ সম্প্রদায়ে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বিভক্ত হইয়া গেলেন ৭। মহারাজ আদিশূর বঙ্গে সাগ্নিক বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যদ্রূপ চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কালক্রমে তদীয় দৌহিত্র বংশীয় রাজা বল্লালও তাদৃশ কোন ও উপায় দ্বারা স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় হইতে পারে, অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে পণ্ডিতবর্গের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক বঙ্গীয় সমাজে কৌলীন্যের অবতারণা করিলেন।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের কোন বিরোধ নাই। আধ্যাত্মিক সত্যের নির্দ্ধারণ ধর্ম্ম-তত্ত্বের বিষয়ীভূত, আর ভৌতিক সত্যের নির্দ্ধারণ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। আধ্যাত্মিক সত্য যেমন ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত, ভৌতিক সত্য তেমনই তাঁহা হইতেই নিঃসৃত। ঈশ্বর যেমন আধ্যাত্মিক জগতের রাজা তেমনই তিনি ভৌতিক জগতের রাজা। অতএব এই দুই শ্রেণীর সত্য যখন সেই সকল সত্যের আশ্রয়ভূমি ঈশ্বর হইতেং নিঃসৃত, তখন ইহারা পরস্পর কখন বিরোধী হইতে পারে না। বিজ্ঞান এখনও সমুদায় ভৌতিক সত্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হয় নাই, এবং যেগুলি নির্দ্ধারণ করিয়াছে সেগুলির মধ্যে কোন আংশিক কোনটী ভ্রমাত্মক এবং কোন কোনটী বা এককালে ভ্রমপূর্ণ, সেই জন্য বিজ্ঞানের সহিত এক্ষণে ধর্ম্মতত্ত্বের বিরোধ ভাব দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এই বিরোধ ভাব চিরস্থায়ী হইবে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় আসিবে, যখন বৈজ্ঞানিক সত্য-সকল আধ্যাত্মিক সত্য-সকলের কিছুমাত্র বিরোধী হইবে না, যখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে না। এইরূপ যে ঘটিবে এখন হইতেই তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ধর্ম্ম-তত্ত্ব-বিরোধী বৈজ্ঞানিক মত-সকলের ভ্রম ক্রমে বহিষ্কৃত হইতেছে। আমরা এখানে ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুই শত বৎসর কাল পূর্ব্ব হইতে সে দিন পর্য্যন্ত অধিকাংশ ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল যে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কেবল জীবন্ত প্রাণ হইতেই যে প্রাণ উদ্ভূত হইতে পারে, কেবল চৈতন্য হইতেই চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে, সে দিন পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহা মানিতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে তাঁহারা উপর্য্যুপরি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কোন প্রাণের সাহায্য না লইয়া প্রাণ আপনা আপনি জন্মিতে পারে। তাঁহারা বলিতেন;—"Life is not the Gift of Life. It is capable of springing in to beiug of itself. It can be spontaneously generated." "জীবন জীবনের দান-স্বরূপ নহে। উহা আপনা হইতেই সত্তা পাইয়া উঠিতে পারে। উহা স্বতঃ উদ্ভূত হইতে পারে।" এই জড়বাদ-সমর্থনকারী ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বিরোধী মতটী আজ কালের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কোন প্রাণের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাণ আপনা আপনি উৎপন্ন হইতে পারে না, জড় হইতে

৭ গুণাদোষপ্রভৃতিপর্য্যায়াৎ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ।
সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
আগত্য গৌড় দেশেস্মিন্ গত্বা রাজান্তিকং ততঃ॥
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে * * * *।
সাপত্ন বিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং, নৈকত্রবাসো ন চ ভক্ষ্য ভোজ্যং।
বিভাগ মাসাদ্য তথা বিবর্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভিস্তে ক্ষ হুতা যথার্থতঃ।
দ্বিধা বিভক্তান্ বিদুষো রাঢ়া বারেন্দ্রবাসিনঃ।
বারেন্দ্র কুলজী।

প্রাণ, অচৈতন্য হইতে চৈতন্যের জন্ম কখনই সম্ভব নহে। আজ-কালের ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণের যে দুইজন সর্ব্বপ্রধান, অধ্যাপক হক্সলি ও টিণ্ডেল, তাঁহারা এই মতের প্রতিপোষক। অধ্যাপক হক্সলি বলেন, I affirm that no shred of trustworthy experimental testimony exists to prove that life in our day has ever appeared independently of antecedent life. * "আমি স্থির বলিতেছি যে, কণামাত্রও এমন বিশ্বাস-যোগ্য পরীক্ষিত বিবরণ নাই, যাহাতে প্রমাণ হয় যে, এখনকার দিনে পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে জীবন আপনা আপনি আবির্ভূত হইয়াছে।" আবার বলিয়াছেন;—"The doctrine of Biogenesis, or Life only from life, is victorious along the whole line at the present day." † "জীবাণু-জীবত্ব মত, অর্থাৎ জীব হইতেই জীব উৎপন্ন হয় এই মত, বর্ত্তমান সময়ে আদ্যোপান্ত জয় লাভ করিয়া আসিয়াছে।" জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি, অচৈতন্য হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে; বৈজ্ঞানিকগণ যখন এই মত প্রচলন করিয়াছিলেন, তখন সাধারণের মধ্যে অনেকে প্রাণের জন্মদাতা ঈশ্বরকে, চৈতন্যের প্রস্রবণ সেই চৈতন্যময় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ঐ মত উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সে অবিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান এক সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছিল, এক্ষণে স্বহস্তে সেই সন্দেহ ভাঙ্গিয়া দিল।

এইরূপে বিজ্ঞান ধর্ম্ম-তত্ত্ব-বিরোধী ও ধর্ম্ম-জগতের সত্যের বিলোপকারী যে সকল মত সৃষ্টি করিয়াছে, ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান তাহাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইবে। এইরূপে বিজ্ঞান ক্রমে যত ভ্রমশূন্য হইতে থাকিবে ততই ধর্ম্মের সহিত উহার বিরোধ চলিয়া যাইবে। এমন সময় আসিবে, যখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম অবিচ্ছিন্ন সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবে এবং উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ একপ্রাণতা সংস্থাপিত হইবে। তখন বিজ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তিভূমিকে শিথিল না করিয়া বিশেষরূপে দৃঢ় করিবে। তখন বৈজ্ঞানিক সত্য-সকল ধর্ম্মতত্ত্বের সত্য-সকলের অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ হইবে। তখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোক সম্মিলিত হইয়া সত্যরাজ্যকে অতুলনীয় রূপে উজ্জ্বল করিবে, এবং মানুষের জীবনপথের অন্ধকার দূর করিবে। তখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কার্য্য তুল্য হইয়া দাঁড়াইবে। তখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম মিলিত হইয়া একত্রে উন্নত হইতে থাকিবে এবং মানবজাতিকেও উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে থাকিবেক।

* Nineteenth Century, 1878, p. 507.

† Critiques and Addresses, T. H. Huxley F. R. S. p. [illegible]

সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর ভক্তি।

সাকারবাদীরা নিরাকারবাদীগণকে একটা অপবাদ দিয়া থাকেন যে তাঁহারা ঈশ্বরকে গাঢ় রূপে ভক্তি করিতে পারেন না। সাকারবাদী সগর্ব্বে বলিয়া থাকেন, আমি আমার আকারবিশিষ্ট উপাস্য দেবতাকে যেরূপ গাঢ় রূপে ভক্তি করিতে পারি, নিরাকারবাদী তাঁহার নিরাকার ঈশ্বরকে কখনই তেমন ভক্তি করিতে পারেন না। এই অপবাদটা সম্পূর্ণ অমূলক।

সাকারবাদী বলেন যে তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি খানি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পান, সুতরাং তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিতে পারেন; কিন্তু নিরাকারবাদী তাঁহার নিরাকার ঈশ্বরের

কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাকে তেমন প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিতে পারেন না। সাকারবাদীর এইটা কেবল অনুমান মাত্র। আমরা সাকারবাদীকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি যে তাঁহার উপাস্য দেবতাকে ভক্তি করেন সে কি তাঁহার আকারের জন্য, না তাঁহার গুণ-গুলির জন্য। যে উপাস্য দেবতার যে গুণ আছে, তাহা জানিয়াই সাকারবাদীর হৃদয়ে তাঁহার দেবতার প্রতি ভক্তি উদিত হয়। ভক্তি গুণেরই উপর এবং গুণেরই জন্য হয়, আকারের উপর কিম্বা আকারের জন্য ভক্তি হয় না। এ কথা কোন সাকারবাদীই অস্বীকার করিবেন না। একথা অস্বীকার করিলে তাঁহারা নিতান্ত জড়োপাসক নামের বাচ্য হইবেন। সাকার ঈশ্বরোপাসক বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে গণ্য করিবে না। ভক্তি গুণেরই উপর এবং গুণেরই জন্য হয়, আকারের উপর কিম্বা অকারের জন্য হয় না; এ কথা যখন সাকারবাদী অবিশ্বাস করিতে পারেন না, তখন তিনি কি প্রকারে বলিতে পারেন যে নিরাকারবাদীর ভগবদ্ভক্তি সাকারবাদীর ভক্তির ন্যায় কখন প্রগাঢ় হইতে পারে না? নিরাকারবাদী স্বীয় উপাস্য ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া জানেন ও বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকে আকারবিশিষ্ট মনে করা ঘোর ভ্রান্তির কার্য্য মনে করেন। তাঁহাকে পূর্ণাকারে সর্ব্ব প্রকার সমহৎ পবিত্র ও উচ্চ গুণের একমাত্র আধার ও অধিস্বামী বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। দেখা যাইতেছে সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী উভয়েই স্ব স্ব উপাস্য দেবতার গুণের ভক্ত, কিন্তু সাকারবাদীর যে গুণের প্রতি ভক্তি তাহা আকার সাপেক্ষ—আকার অবলম্বন না করিয়া তিনি স্বীয় উপাস্য দেবতার গুণ দেখিতে পান না ও উপলব্ধিও করিতে পারেন না। আর নিরাকারবাদীর যে গুণের প্রতি ভক্তি তাহা আকার সাপেক্ষ নহে, তিনি আকার অবলম্বন না করিয়া স্বীয় উপাস্য ঈশ্বরের গুণ ও সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। উভয় সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর পক্ষে তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতার গুণই যখন ভক্তির সামগ্রী ও ভক্তির উদ্রেককারী, তখন আর সাকারবাদী কি প্রকারে বলিতে পারেন যে তাঁহার ভক্তির ন্যায় নিরাকারবাদীর ভক্তি কখনই প্রগাঢ় হইতে পারে না?

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১। শকাব্দা ১৮০২।

৩ ভাদ্র। অদ্য "Contemporary Review for November 1879" পাঠ করি। ইহাতে জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাঠ করি। ইংরাজেরা অল্পপুঁজি অবলম্বন করিয়া কেমন ফেনাইয়া ফেনাইয়া লিখে। বাঙ্গালারা তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই বিদ্যা শিখিতেছে।

৮ ভাদ্র। অদ্য আমার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে কন্যাদিগকে পাক কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ করিবার আবশ্যকতা বিষয়ে কথা হয়। আমাদিগের জ্ঞানীদিগের কথা দূরে থাকুক, পার্কর বলিয়াছেন—"I cannot take that woman as my wife who cannot make my bread." "যে স্ত্রীলোক আমার রুটি প্রস্তুত করিতে পারে না তাহাকে আমি আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।" এখন দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাহ প্রার্থী ব্যক্তিরা পাত্রী উত্তম পাক করিতে পারে কি না অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহা শুভ চিহ্ন বলিতে হইবেক।

১০ ভাদ্র। অদ্য প্রাতে বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি দেবগৃহের সন্নিকট রোহিণী গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। ইনি আমার "সে কাল আর একাল" গ্রন্থ সম্বন্ধে অতি সদয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য রোহিণী হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পর্ব্বত, বন, উপবন ও দূর্ব্বাদলপরিশোভিত প্রশস্ত প্রান্তর দেখিয়া হঠাৎ ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে মন একীভূত

হইয়া গেল। যত দুঃখ, আমাদিগের মনের সঙ্কুচিত ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। সংসাররূপ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে মন বদ্ধ থাকিলেই উহা দুঃখ ভোগ করে। দুঃখের সময় একবার উজ্জলরূপে ভাব দেখি, চতুর্দ্দিকে অনন্ত আকাশ আবার সেই আকাশ আনন্দ স্বরূপের দ্বারা পূর্ণ, তাহা হইলে দেখ দেখি কেমন করিয়া তোমার দুঃখ থাকে। মন যতই প্রশস্ত হইবে ততই সুখ, আর যত সঙ্কুচিত থাকিবে ততই দুঃখ। অনন্তের দিকে মনকে প্রসারিত করিয়া দেও আর ক্ষুদ্র সংসারকে তুচ্ছ কর, দেখিবে তোমার সুখের অভাব হইবে না। "যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

১২ ভাদ্র। অদ্য "সাধারণী" পাঠ করি। এবারের "সাধারণী"তে পল্লিগ্রামের অবস্থা বিষয়ক একটি অতি উত্তম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। মেলেরিয়া ও দরিদ্রতা প্রযুক্ত পল্লিগ্রামের অবস্থা শোচনীয়। আমাদিগের দেশে নানা কারণে ক্রমশঃ দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে।

১৫ ভাদ্র। অদ্য গৃহ মধ্যে একটি সর্প দেখা যায়। ক্ষণেকের জন্য ইহা মনে করিয়া মন খিটড়িয়া থাকে যে ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে সর্প কেন থাকিবে? কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন মঙ্গলাভিপ্রায় আছে উহা চিন্তা করিয়া মন সুস্থতা লাভ করিল, এবং ক্ষণেকের জন্যও বিদ্রোহ ভাব আমার মনে উদিত হইয়াছিল বলিয়া লজ্জিত হইলাম।

১৯ ভাদ্র। অদ্য স্কুলগৃহে সন্ধ্যার পর বীরভূমের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও হাজারিবাগের রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহাদিগের সহিত অনেক বিষয়ে আমার কথোপকথন হয়। বালকের শরীরবিনাশকারী বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী, উপজীবিকার জন্য লোকের শোণিতশোষণকারী উদ্বেগ, কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদিগের ব্যায়ামের প্রতি এবং সন্ধ্যার পর সঙ্গীতাদি বিশুদ্ধ আমোদের প্রতি অমনোযোগ, বাবুগিরি ও বিলাসিতার বৃদ্ধি, এরূপে বৃদ্ধি যে সামান্য অবস্থার লোক দুই পা হাঁটিয়া যাইতে পারে না, গোচারণের অভাব জন্য গো জাতির ক্রমশঃ অবনতি, বাঙ্গালীর একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধের মহার্ঘ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কথা হয়। আমাদিগের দেশ অবনতির গড়ানে উপত্যকায় দ্রুতবেগে নামিতেছে।

২০ ভাদ্র। অদ্য এখানকার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনেক কথা হয়। তিনি মুসলমানদিগকে ব্রাহ্ম করিয়া হিন্দু করিবার অনেক পোষকতা করিলেন।

২২ ভাদ্র। অদ্য বিলাতের প্রসিদ্ধ পাদ্রি Canon Farrar কর্ত্তৃক রাজপুরুষদিগের ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে উপদেশ পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"It is righteousness which is the pillar of nations, yea, and the pillar of the universe Break down that pillar and the universe fall into ruin and desolation." "ধর্ম্মই মনুষ্য জাতিকে স্তম্ভস্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে; শুদ্ধ মনুষ্য জাতি নহে, জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সেই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দেও, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে।" এই বাক্য উপনিষদের "সঞ্চয়সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" সঙ্গে মিলে। উপনিষদের বাক্য উপনিষদকার ধর্ম্মাবহ পুরুষের প্রতি খাটাইয়াছেন, ফেরার সাহেব তাহা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি খাটাইয়াছেন। দুইই সঙ্গত বাক্য।

২৩ ভাদ্র। অদ্য আমার জন্মদিন। "জনম এমন বৃথা চলে গেল"। জন্মদিনে মনে কি গভীর ভাবের উদয় হয়! এই দিবসে মনুষ্যের অপূর্ণতা ও সেই অকাল পুরুষ ঈশ্বরের পূর্ণতা কি উজ্জলরূপে মনে প্রতিভাত হয়।

২৯ ভাদ্র। অদ্য "সুরুচির কুটীর" পাঠ সমাপ্ত করি। ইহাতে উপন্যাস ছলে অল্প আয়ে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এবং পরোপকার সাধনের উপায় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উপন্যাসটি নীরস বিষয় কর্ম্মের প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে, "In a business-like manner"। যে যে স্থানে ভাবের উচ্ছ্বাস হওয়া কর্ত্তব্য, সে সকল স্থান অতি নীরস ভাবে লিখিত হইয়াছে। এমন যে সুরেশ ও সুরুচির প্রথম প্রণয়ালাপ তাহা লোকে যেমন প্রাপ্তি কবলিয়ত লেখা কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছে; তাহাতে ভাবের লেশ মাত্র নাই। এই উপন্যাসটি "সুশীলার উপাখ্যানের" ন্যায় সাধারণ হিন্দু সমাজের উপযোগী করিয়া লেখা হয় নাই; কেবল ব্রাহ্মদিগের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। যাহা হউক, উহা হইতে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য অর্থ সঞ্চয় ও পরোপকার বিষয়ে অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারেন। অদ্য আমার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু দিবস। তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিলাম। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে কুশলে রাখুন। এই উপলক্ষে পরে দান করা হয়।

৩ আশ্বিন। অদ্য বৈদ্যনাথে ভাদ্র পূর্ণিমার মেলা।

অদ্য শুনিলাম মন্দিরে লোকের ভিড়ে দুই জন লোক নাকি মারা পড়িয়াছে।

৫ আশ্বিন। অদ্য শুনিলাম বৈদ্যনাথের মন্দিরে দুইটি লোক মারা পড়িবার কথা যে শুনিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। ভিড়ে একজন লোক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। "The queen vomited three black crows."

১০ আশ্বিন। অদ্য একটি ভাব মনে উদিত হয়। দুঃখ ধর্ম্মসাধনের অত্যন্ত সহকারী। ধর্ম্মের অঙ্গ তিনটী; সদা ঈশ্বর স্মরণ, পাপ প্রবৃত্তি দমন ও পরোপকার সাধন। দুঃখ যেমন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দেয়, এমন অন্য কোন পদার্থ নহে। বিদুর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তিনি যেন সর্ব্বদা তাঁহাকে দুঃখে রাখেন। Lady Fanshawe প্রার্থনা করিয়াছিলেন "O God! plant a thorn in every gourd of mine so that I may always remember thee" "হে পরমেশ্বর! আমার প্রত্যেক অলাবুতে একটি করিয়া কণ্টক নিহিত কর যে আমি তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারিব"। দুঃখ সংসারের সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া পাপ প্রবৃত্তি দমনের যেমন সহায়তা করে, এমন অন্য কিছু নহে। দুঃখ ধর্ম্মের গুরুত্ব যেমন দেখাইয়া দেয়, এমন অন্য কিছু নহে। নিজে দুঃখ পাইলে যেমন অন্যের দুঃখে সহানুভূত হয়, এমন অন্য কিছুতেই হয় না। অতএব দুঃখ পরোপকার সাধনের প্রতি অত্যন্ত সহকারী বলিতে হইবে। দুঃখ ভোগ ধর্ম্মসাধনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু দুঃখ সহ্য করা কঠিন। ঈশ্বর আমাদিগকে তদ্বিষয়ে বল প্রদান করুন।

১৫ আশ্বিন। অদ্য নলদিপুরের জমিদার বাবু গোপালপ্রসাদ ও তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও বন্ধু বাবু অখিলচন্দ্র দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। প্রথমোক্ত মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন হয়। তিনি উক্ত কথোপকথনের সময় ব্রাহ্মদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতা ও তদনুবর্ত্তীদিগের আচরণ এই দুয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? আমি বলিলাম তাহার কারণ মনুষ্যের অপূর্ণতা। উত্তম মধ্যম লোক তাবৎ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, সেইরূপ ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও আছে; তবে আমি স্বীকার করি, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তদ্বিষয়ে আমাদিগের প্রতিজ্ঞা যে রূপ উচ্চ ও তাহার তুলনায় আমাদিগের আচরণ যেরূপ নিকৃষ্ট, এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেক লোকের চক্ষে যেরূপ চট্ করিয়া লাগে, অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের সম্বন্ধে সেরূপ চট্ করিয়া লাগে না। অতএব আচরণ বিষয় ব্রাহ্মদিগের অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

১৯ আশ্বিন। অদ্য "Sunday Mirror" পাঠ করি। কেশব বাবুরা এক্ষণে স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষে বড় লিখিতেছেন। তোমরাইত, ঠাকুর! প্রথম আরম্ভ করিলে।

২০ আশ্বিন। অদ্য গত বারের "বঙ্গদর্শন" পাঠ করি। বঙ্গদর্শনে "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" বিষয়ে যে ব্যক্তি প্রস্তাব লিখিতেছেন, তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার কাব্যের দোষগুণ বিচারে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী স্বভাবের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অসাধারণ মানবস্বভাব পরিজ্ঞান প্রদর্শন করিতেছে।

২৩ আশ্বিন। অদ্য শেষ সংখ্যক বান্ধব পাঠ করি, তাহাতে দুর্গা পূজা সম্বন্ধীয় "ভারতশাক্তির মহোৎসব" শীর্ষক প্রস্তাবে লেখকের বিলক্ষণ ক্ষমতা ও শাস্ত্রীয় গবেষণার প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে। এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া যদি বাঙ্গালার হৃদয়ে সামরিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত করা যাইতে পারে; তাহা হইলে যত দিন পৌত্তলিকতা ভারতে থাকিবে, তত দিন উক্ত উৎসব হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে সামান্য মেটেফিরিঙ্গিরা যাহা পারে অর্থাৎ রাজার বিপদের সময় তাঁহাকে যুদ্ধে সাহায্য করা, বাঙ্গালীরা তাহা পারে না; এই জন্য তাহারা পর্য্যন্ত আমাদিগকে ঘৃণা করে। আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী কল্পনা সকলই রূপক মূলক। তাহা প্রাচীন হিন্দুদিগের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ করিতেছে।

আগামী ৮ কার্ত্তিক শুক্রবার "বালী-ধর্ম্মসমাজের" তৃতীয় সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে।

শ্রী হারালাল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

---

৯ কার্ত্তিক শনিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজে দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে [illegible] দিবা [illegible] পর ব্রাহ্মধর্ম্মের [illegible] হইবে এবং সন্ধ্যা [illegible] সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী [illegible] চট্টোপাধ্যায়

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫০৮ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ | ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ কার্ত্তিক রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

আচার্য্যের উপদেশ।

শরৎকালের প্রসন্ন মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি কেমন দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়! সরোবরে কুমুদ-কমলিনী প্রস্ফুটিত হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতি কেমন হৃদয়ের সুগন্ধ-ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়! পদ্ম কুমুদ কহ্লার সকলেরই নয়ন আকাশের প্রতি প্রেম-রশ্মিতে বাঁধা পড়িয়া আছে, আমাদের আত্মাই কি কেবল মৃত্তিকার দিকে নয়ন নিয়োজিত করিয়া—ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া—ম্রিয়মাণভাবে দিবা অবসান করিবে? ঈশ্বরের এই শারদীয় শোভায় অচেতন প্রকৃতি চেতন পাইয়া উঠিয়াছে—আমাদের সচেতন আত্মা কি অচেতন-প্রায় মোহ-শয্যায় শয়ান থাকিবে? ইহা হইতেই পারে না। প্রকৃতির সুন্দর বিমল প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি—ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মাত্মার প্রেম-সুধাময় প্রসন্ন অন্তঃকরণ—এ দুয়ের কেমন মিল! ইহার সহিত আমরাও আইস আমাদের হৃদয়ের সুর মিলাইয়া প্রেমময় পরমাত্মার প্রেমামৃত-সাগরে আত্মাকে নিমগ্ন করি। নিস্তব্ধ চিত্তে ঈশ্বরের মধুর আশ্বাস-বাণীতে এই সময়ে আইস আমরা শ্রবণ-সমর্পণ করি; তাহা হইলে শত-কোটি নাস্তিকের অমঙ্গল কোলাহলের প্রতি আমাদের কর্ণ বধির হইয়া যাইবে, এবং ঈশ্বরের নামের মঙ্গল জয়ধ্বনি সমস্ত জগৎময় ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। এই সময়ে আইস আমরা যত পারি—ঈশ্বরের প্রেম-নয়নের কৃপা-রশ্মিতে আমাদের হৃদয়-পদ্মের পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া লই, তাহা হইলে অমঙ্গলের বিভীষিকার প্রতি আমাদের নয়ন অন্ধ হইয়া যাইবে,—তখন বৃক্ষের শ্যামল পত্রে, পুষ্পের সুকোমল অঙ্গুলিতে, তটিনীর নৃত্য লীলায়, আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায়, ধর্ম্মাত্মার প্রশান্ত মুখ-জ্যোতিতে, ঈশ্বরের মঙ্গল নামাঙ্ক নব নব বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এমন মঙ্গলের আকর—এমন করুণার সাগর—পরমেশ্বরকে আমরা যেন ভুলিয়া না থাকি। তিনি যদি আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিতেন তবে আমাদের দশা কি হইত। তাহা হইলে কোথায় বা আমাদের বিজ্ঞান থাকিত—কোথায় বা কবিতা-কলাপ থাকিত—কোথায় বা তরুলতা

পশুপক্ষী থাকিত—কোথায় বা আমরা থাকিতাম! কি এক হতভাগা বিজ্ঞান পশ্চিম হইতে আমাদের দেশে সংক্রামিত হইয়াছে—ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকাই যাহার এক—ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধাই যাহার পরম পুরুষার্থ! ভুলিয়া থাকিবার এত এত বস্তু থাকিতে আমরা কি কেবল পরমেশ্বরকেই ভুলিয়া থাকিব? যাঁহাকে আমরা প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করিলে আমাদের প্রাণ শীতল হয়—তাঁহাকেই আমরা সর্ব্বাগ্রে অবিশ্বাস করিব? আমরা কি ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্য চাকচিক্যে অবিশ্বাস করিতে পারি না—কৃত্রিম সভ্যতার মায়াবী চাটু বচনে অবিশ্বাস করিতে পারি না—আমরা কি সত্যের ছদ্মবেশধারী কৃত্রিম সত্যে অবিশ্বাস করিতে পারি না—মঙ্গলের ছদ্ম-বেশ-ধারী কৃত্রিম মঙ্গলের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারি না,—আমাদের অবিশ্বাসের কি এতই পাত্রাভাব যে, যিনি সকল সত্যের পরম সত্য—সকল মঙ্গলের পরম নিদান—তাঁহাকে অবিশ্বাস না করিলে আমাদের আর উপায়ান্তর নাই! সংসারে পূতনা রাক্ষসীর কি এতই অনটন যে, মাতাকে অবিশ্বাস না করিলে আর উপায়ান্তর নাই! মায়াবী কৃত্রিম বাহ্য শোভাময় বিজ্ঞান—যাহা মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা—তাহার কি এমনিই স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে যে, যাঁহা হইতে জ্ঞান ধার করিয়া সে জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসকে আপনার অঙ্গের ভূষণ করিয়া নির্লজ্জ সে লোক-সমাজে অম্লানবদনে বিচরণ করিতেছে! অবিদ্যায় মোহান্ধ হইয়া মূল-ভ্রষ্ট বিজ্ঞান কেমন দম্ভের সহিত বলিতেছে "যে বাষ্পায় শকট আমার কার্য্য—তাড়িত বার্ত্তাবহ আমার কার্য্য—সুয়েজের নাল আমার কার্য্য—আমার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা"। হে বিজ্ঞান—মূঢ় বিজ্ঞান! যাহা তুমি বলিলে সমস্তই তোমার কার্য্য—কিন্তু তুমি কাহার কার্য্য—তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখা কি তোমার উচিত হয় না! তুমি অনেক দিন ধরিয়া দাগা বুলাইয়া বুলাইয়া কিঞ্চিৎ হাত পাকাইয়াছ ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু যিনি তোমাকে হাত ধরিয়া লিখাইতেছেন, তাঁহার লেখা আর তোমার লেখার মধ্যে যে, কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহা কি তুমি আজিও জানিতে পার নাই? জান যে, একগাছি তৃণের সঙ্গেও তোমার বাষ্পযন্ত্রের তুলনা হয় না—জানিয়া অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার অন্তর্যামী গুরুর চরণে প্রণিপাত কর—ও সভক্তিচিত্তে সকৃতজ্ঞ চিত্তে দিন দিন জ্ঞান-পথে অগ্রসর হও। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, নীরস ভক্তিহীন অকৃতজ্ঞ বিজ্ঞান বিজ্ঞান-নামের যোগ্যই নহে—তাহা বিজ্ঞানের কলঙ্ক-স্বরূপ! ইহা স্মরণ করিতেও মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে যে, মনুষ্যের আত্মার প্রেম-সমুদ্র শুখাইয়া যতক্ষণ না মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, জ্ঞানের সূর্য্যালোক নির্ব্বাণ হইয়া যতক্ষণ না অন্ধতমিস্রায় পরিণত হইতেছে,—ততক্ষণ মনুষ্য ঈশ্বরকে ভুলিয়া শুষ্ক বিজ্ঞানের দাসত্ব করিতে পারিবে না।

ঈশ্বর আমাদের আত্মার আত্মা—তিনি আমাদের পর নহেন; আমরা জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রীতি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেছি—সকলই তাঁহারই প্রসাদাৎ। যদি আমরা বিজ্ঞানের ভক্ত হই, তবে তাঁহাকে আদি গুরু বলিয়া সর্ব্বাগ্রে যেন তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি; যদি আমরা কবিতার ভক্ত হই, তবে তাঁহাকে আদি কবি জানিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রেমে যেন হৃদয়কে আর্দ্র করি; কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের সময় তাঁহাকে নেতা জানিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া সব কার্য্য করি; সম্পদ্ বিপদের সময় যেন আমরা তাঁহাকে

প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনকে ঠিক্ রাখি,—এই-রূপে চলিয়া যদি ঈশ্বরের প্রেমময় সহবাসের মাধুর্য্য একবার আমরা হৃদয়-ক্ষেত্রে রীতিমত অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে পারি—তবে মোহ-কোলাহলের সহস্র ঝটিকা সেখান হইতে তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারিবে না।—কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে অতীব সাবধানে পোষণ করা কর্ত্তব্য;—কেন না অপক্ক অবস্থায় তাহা একটুতেই বিচলিত হইতে পারে; একদিনের বিঘ্নে এক বৎসরের পরিশ্রম নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এখন কার কালের নাস্তিক্য-বুদ্ধি এমনি প্রবল যে, অনেক সরস-হৃদয় ধার্ম্মিক ব্যক্তিও তাহার প্রবল স্রোত সামলাইতে না পারিয়া, আশা ভরসা সমস্ত হারাইয়া ফেলিয়া অবশেষে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন যে, জগৎ আমার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় আর শোভা পায় না—সকলই অসার! শরীর হইতে জ্ঞানময় প্রেমময় আত্মাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে শরীর অসার হইবে না তো কি হইবে? জগতের অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে না দেখিলে জগৎ অসার মরু-ভূমি তুল্য দেখাইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যিনি অন্তরে বাহিরে পরমাত্মার মহিমা ও করুণা অবলোকন করেন—তাঁহারই নিকট জগতের অর্থ বিদ্যোতিত হইয়া উঠে—তিনিই সংশয়ের অমানিশা হইতে জ্ঞানের দিবালোকে উত্থান করিয়া, অপার আনন্দে ঈশ্বরের প্রীতি-সুধা পান করিয়া সংসারের সমস্ত দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া উঠেন।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের মোহ-আঁধারের আলোক। যতক্ষণ না আমরা তোমার দর্শন পাই, ততক্ষণ আমরা ভয়ে মোহে শোকে আবৃত হইয়া অরণ্যে রোদন করিতে থাকি,—তোমাকে পাইলেই আমরা আনন্দের জীবন্ত উৎস পাই। আমরা সকল সুহৃদে মিলে তোমাতে হৃদয় সমর্পণ করিব বলিয়া এখানে সমাগত হইয়াছি। তুমি তোমার প্রসন্ন মুখজ্যোতিতে আমাদের হৃদয়কে পবিত্র কর এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উদ্ধৃত।

"পজিটিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

কমটির মতানুযায়ী ধর্ম্মের আদর্শ কৃষ্ণকমল বাবু ভারতীতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকমল বাবু ইতিপূর্ব্বে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে সহজেই প্রতীতি হইতে পারে যে, কমটের গ্রন্থ সমুদ্র-বিশেষ। তাহা মন্থন করিয়া তাহা-হইতে সারোদ্ধার করা—ব্যাপারটি যে বড় সহজ তাহা নহে; লেখকের মত সার-গ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তি দ্বারাই তাহা সম্ভবে।

তাঁহার প্রবন্ধটির সার কথা এই যে, মনুষ্যে মনুষ্যে সহানুভূতি-বিস্তারই কমটের মতে প্রধান ধর্ম্ম। কৃষ্ণকমল বাবু বলেন যে "লেখা পড়ার চর্চ্চাকারী কোন ব্যক্তিই সাহস পূর্ব্বক অস্বীকার করিতে পারেন না যে পরের সুখে-সুখী এবং পরের ক্লেশে ক্লেশ-যুক্ত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ একটি গুণ। আদম স্মিথ তাঁহার Moral sentiments বিষয়ক গ্রন্থে ইহা এক প্রকার জ্যামিতির তত্ত্বের ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাও কমটির নূতন আবিষ্ক্রিয়া নহে, কমটের নূতন আবিষ্ক্রিয়া এই যে, তিনি কহেন, এই সহানুভূতিকেই আমাদের ধর্ম্মনীতির নিয়ন্তা ও মূলীভূত কারণ করিয়া তুলিতে হইবেক।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এ যাবৎ কাল লোকে

যে-সিংহাসন ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে দিয়া আসিতেছে—কমটি সেই সিংহাসনে সহানুভূতিকে বসাইতে চান। এখন সহানুভূতি সত্যসত্যই সে সিংহাসনের যোগ্য কি না তাহাই বিচার্য্য।

কমটের মতে সহানুভূতি আর-দশটা প্রবৃত্তির মধ্যে একটা প্রবৃত্তি—এ বই আর কিছুই নহে। কৃষ্ণকমল বাবু বলিতেছেন—"কমটের মতে কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রভুত্বের ইচ্ছা যশের ইচ্ছা, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি স্নেহ, সাধারণের প্রতি সহানুভূতি, এই গুলি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি।" তাহা হইলে হয়—তবে কমটি প্রবৃত্তি দিয়াই প্রবৃত্তিকে দমন করিতে বলিতেছেন। এক প্রবৃত্তির সবিশেষ প্রাদুর্ভাবে অন্যান্য প্রবৃত্তি দমনে থাকিতে পারে—ইহা আমরা অস্বীকার করি না; এরূপ প্রবৃত্তি-দমনের দৃষ্টান্ত পশুদিগের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পশুদিগের যখন অপত্য-স্নেহ প্রবল হয়—তখন তাহাদের ভয়-প্রবৃত্তি একেবারেই মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়; কোন একটা বড় জন্তু যদি একটা ক্ষুদ্র মুরগীর ছানার নিকট-পানে যায়—ধাড়া মুরগী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি তাড়া করে; মাছের প্রতি বিড়ালের খুবই লোভ, কিন্তু মনুষ্যের ভয়ে তাহার সে লোভ সব-সময় নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না;—ইত্যাদি। মনুষ্যের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু হইলে হইবে কি—প্রবৃত্তি স্বভাবতই অন্ধ, এমন কি—প্রবৃত্তি জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী; প্রবৃত্তি যেখানে যে অংশে প্রবল হয়, জ্ঞান সেখানে সেই অংশে মোহে অভিভূত হয়; আর জ্ঞান যেখানে যে-অংশে প্রাদুর্ভূত হয়, প্রবৃত্তি সেখানে সেই অংশে দমনে থাকে; জ্যামিতির তত্ত্বের ন্যায় ইহা একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। কাম ক্রোধ লোভ যখনি অতি-মাত্রায় প্রবল হয়—তখন লোকে একেবারেই জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে; তেমনি আবার, উত্তেজিত কাম-ক্রোধাদির উপরে যখন জ্ঞানের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি জাজ্বল্যরূপে নিপতিত হয়, তখন আপনা হইতেই তাহাদের তেজ নরম পড়িয়া আসে। সহানুভূতি-প্রবৃত্তি যে, এ-নিয়মের এলাকা-বহির্ভূত, তাহা নহে;—সে-দিন ভারতবর্ষীয় শ্বেতাঙ্গ-দিগের সহিত ব্রানসন্ সাহেবের কেমন প্রবল সহানুভূতি হইয়াছিল, কিন্তু সে সহানুভূতি যে অন্যায়ের কতদূর পক্ষপাতী তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এখানে কি দেখা যাইতেছে? দেখা যাইতেছে যে, ব্রানসন সহানুভূতি-প্রবৃত্তির উত্তেজনা-প্রভাবে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহানুভূতিই বলো, আর অন্য কোন প্রবৃত্তিই বলো, তাহার উত্তেজনায় যে কখনই কোন ভাল কার্য্য হয় না—ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে;—সে কার্য্য অন্ধভাবে হয় বলিয়াই তাহার প্রতি আমাদের যত কিছু আপত্তি। প্রবৃত্তির কাছে পাত্রাপাত্রের বা ন্যায়ান্যায়ের বিচার নাই;—কোন প্রবৃত্তিকে যদি মনোরাজ্যের রাজারূপে অভিষিক্ত করা যায়, তবে সে রাজা উপলক্ষে এই প্রবাদটি সম্পূর্ণই খাটে—"অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ;" তাহা দ্বারা ভাল কাজ হইলেও হইতে পারে—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার উপর আমাদের কোন আস্থা থাকতে পারে না। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, সহানুভূতির নিজের এমন-কোন রাজোচিত গুণ নাই যাহাতে মনের সিংহাসনে তাহার অধিকার জন্মিতে পারে। ইহার উত্তরে কৃষ্ণকমল বাবু হয়তো এইরূপ বলিবেন—কমট বলিয়াছেন বটে যে, "সহানুভূতিকেই আমাদের ধর্ম্মনীতির নিয়ন্তা ও মূলীভূত

কারণ করিয়া তুলিতে হইবেক," কিন্তু তাহাকে অসহায় অবস্থায় একাকী রাজত্ব করিতে দেওয়া হইতে পারে না—জ্ঞানকে তাহার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা বিধেয়—ইহাই কমৃটির নিগূঢ় অভিপ্রায়। এখানে ইংলণ্ডের রাজার কথা মনে পড়ে,—রাজা কেবল নামেই রাজা—কাজে মন্ত্রীই রাজা। ঐরূপ কৃত্রিম নাম-করণ ইংলণ্ডের স্বদেশোচিত একটি পুরাতন প্রথা—তাহা ইংলণ্ডকেই সাজে; কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনাস্থলে যে যাহা—তাহাকে তাহা বলাই ভাল, তাহা হইলে—আর-কিছু না হোক—কথার ঘোর-ফের হইতে আপাততঃ পারত্রাণ পাওয়া যায়। অতএব ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা-স্থলে—সহানুভূতিকে ধর্ম্মনীতির নিয়ন্তা না বলিয়া ধর্ম্ম-নীতিকে সহানুভূতির নিয়ন্তা বলিলেই ঠিক হয়।

অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায়, মনুষ্যের সহানুভূতি প্রথম প্রথম সঙ্কীর্ণ-ক্ষেত্রে এলোমেলো ভাবে কার্য্য করে; পরে জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত পথ অনুসরণ করে। যতক্ষণ সহানুভূতির বা (মৈত্রী ভাবের) সঙ্কীর্ণতা-দোষ জ্ঞান-দ্বারা প্রক্ষালিত না হয়—ততক্ষণ বৈরীভাব বলিয়া একটা পার্শ্বচর তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া থাকে;—আপনার স্ত্রীপুত্রকে অন্ধভাবে ভাল বাসিতে গেলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠে;—পারস্য দেশের সহিত বৈরিতার প্রভাবে গ্রীকদিগের স্বদেশানুরাগ যেমন ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—সহজ অবস্থায় সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণে সহানুভূতি অন্ধ-প্রবৃত্তি আকারে কার্য্য করে, সেই পরিমাণে তাহার সহিত বৈরীভাব যুক্ত থাকে; ইহা তো আমাদের চক্ষের সামনেই পড়িয়া আছে যে, মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে-পরিমাণে বেশী, পর-জাতির প্রতি বৈরীভাবও সেই পরিমাণে বেশী; মুসলমানদিগের মধ্যে রীতিমত জ্ঞানের চর্চ্চা হইলেই এইরূপ বৈরীভাব হইতে তাহারা উদ্ধার পাইতে পারে। অতএব অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় সহানুভূতিকেও জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত করা বিধেয়। জ্ঞান-দ্বারা এইরূপ যে, নিয়মিত করা, ইহার দুইটি পদ্ধতি আছে;—প্রথম, বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা; দ্বিতীয়, ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা। বিষয়-বুদ্ধির লক্ষ্য স্বার্থ, ধর্ম্ম-বুদ্ধির লক্ষ্য পরমার্থ। এ বিষয়টি আমরা গত সংখ্যক ভারতীতে বিশদরূপে বিবৃত করিয়া দাঁড়াইয়াছি—সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য।

এখানে কেহ বলিতে পারেন যে, "বিষয়-বুদ্ধিই বা কি—আর ধর্ম্ম-বুদ্ধিই বা কি—বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিয়া সহানুভূতির প্রতি একবার ভাল করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখ; সহানুভূতি বলিয়া মনুষ্যের যে একটি প্রবৃত্তি আছে তাহা কোন সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকিবার নহে, মনুষ্য-মাত্রই মনুষ্যের সহানুভূতির পাত্র।" আমরা বলি যে, জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত না হইলে সহানুভূতি স্বভাবতই ওরূপ বন্ধন মুক্ত হইতে পারে না কিন্তু সে কথা থাক্—এখন আমরা তর্কের খাতিরে তাঁহার ঐ কথাই শিরোধার্য্য করিলাম; তাহা হইলে ফলে কি দাঁড়ায় দেখা যা'ক্;—যদি প্রবৃত্তি-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া জন-সমাজের যৎপরোনাস্তি সুশৃঙ্খলা-সাধন কখনও মনুষ্য-জাতির সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে ইহা আর অস্বীকার করিবার জো থাকিবে না যে, মৌমাছি এবং পিপীলিকার সমাজ অনেক পূর্ব্বে সেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং ঐ দুই পতঙ্গ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মৌমাছিরা কেমন দেখ সকলেই সকলের জন্য অষ্ট প্রহর কার্য্য করিতেছে—বিরাম যে কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না; তাহাদের সুশৃঙ্খল সমাজের তুলনায় আমাদের সভ্যতম সমাজ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সত্য-ই কি তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব? কখনই না?—তাহারা সত্য কাহাকে বলে জানে না, মঙ্গল কাহাকে বলে জানে না, ন্যায় কাহাকে বলে জানে না—প্রবৃত্তিই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; ইহাতেই মনুষ্যের সহিত তাহাদের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

কম্‌ৎ একদিকে বলিতেছেন—প্রবৃত্তি-বিশেষকে মনের অধিপতি-রূপে বরণ করিলেই ধর্ম্ম-কার্য্য চলিতে পারে,—ও-দিকে বলিতেছেন "উন্নতিই আমাদের উদ্দেশ্য।" উন্নতি বলিতে দুইরূপ উন্নতি বুঝাইতে পারে,—(১) মনুষ্যের আত্মার উন্নতি—ইহা অনন্ত উন্নতি—ইহা ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যতিরেকে শুদ্ধ কেবল প্রবৃত্তি দ্বারা ঘটনা-সাধ্য নহে; (২) জন-সমাজের সুশৃঙ্খলার উন্নতি,—আমাদের মতে ইহা আত্মার উন্নতিরই ফল-স্বরূপ। কিন্তু যদি আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ কেবল জন সমাজের সুশৃঙ্খলাই উন্নতির চরম লক্ষ্য হয়, তবে সে উন্নতিকে অনন্ত উন্নতি বলা সঙ্গত নহে—কেন না মধুমক্ষিকারা সে-উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। মধুমক্ষিকা-সুলভ পরস্পর-সহানুভূতি—একটা অন্ধ প্রবৃত্তি—যদি মনুষ্যের একমাত্র পথ-প্রদর্শক হয়, তবে মনুষ্য-সমাজের খুবই সুশৃঙ্খলা সাধিত হইতে পারে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু মনুষ্যের সেরূপ অবস্থাকে আমরা উন্নতির অবস্থা বলিতে পারি না। মনুষ্যের পক্ষে—প্রবৃত্তির অধীনতাই অবনতি—আত্মার আধিপত্যই উন্নতি; আর, ধর্ম্ম-বুদ্ধিই সে উন্নতির পথ-দর্শক।

এখন ধর্ম্ম-বুদ্ধি কি? ধর্ম্ম-বুদ্ধি কি তাহা জানিতে হইলে—মনুষ্যের ধর্ম্ম কি তাহা জানা আবশ্যক;—মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? জলের ধর্ম্ম যেমন শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম যেমন উত্তাপ মনুষ্যের ধর্ম্ম সেইরূপ মনুষ্যত্ব। যে বুদ্ধি মনুষ্যত্বের অনুকূল তাহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধি; এই জন্য মনুষ্যত্ব কি তাহার সন্ধান পাইলেই, ধর্ম্ম-বুদ্ধি কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। মনুষ্যত্ব কি? সত্যের জন্য সত্যকে ভালবাসিতে কেবল মনুষ্যকেই দেখা যায়, পশুরা ইহার দিক্ দিয়াও যায় না; এই জন্য আমরা বলি যে, ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মনুষ্য একটি ক্ষুদ্র জীব—সে দুই দিনের জন্য পৃথিবীতে আসে—দুই দিনে চলিয়া যায়; এ হিসাবে অন্য জীবের সহিত মনুষ্যের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। প্রভেদ তবে কি হিসাবে? প্রভেদ যে-হিসাবে তাহা এই—গোড়ার সত্যের জন্য (মূল-সত্য এবং ধ্রুব সত্যের জন্য) অন্য জীবদিগের কোন মাথা-ব্যথা নাই, মনুষ্যই কেবল তাহার একমাত্র অনুরক্ত ভক্ত। আপাততঃ মনে হইতে পারে—ইহাতে আর বিশেষ কি হইল? কিন্তু যখন দেখা যায়—সত্য কি বৃহৎ ব্যাপার, কালে তাহার আদি অন্ত পাওয়া যায় না, গভীরতায় তাহার তল পাওয়া যায় না, আকাশে তাহার ব্যাপ্তির ইয়ত্তা পাওয়া যায় না—অথচ সেই সত্যের জন্য মনুষ্যের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই শান্তি মানে না—তখন মনে হয় যে, এরূপ পরম-স্পর্দ্ধা অনন্ত ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি কেবল মনুষ্যেরই সম্ভবে। সচ্ছন্দে একজন কেহ বলিতে পারে—"তুমি সেদিন-কার ক্ষুদ্র মনুষ্য—[illegible] তোমার কি কাজ? খাও, দাও, [illegible] সহিত আমোদ আহ্লাদ কর, [illegible]

বস্‌ !” কিন্তু মনুষ্যের আত্মা এ কথায় প্রবোধ মানিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের আত্মার স্পৃহা পরিপূর্ণ সত্যের দিকে এমনি প্রবলরূপে আকৃষ্ট রহিয়াছে—যে, সে নাড়ীর টান কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে। মূল সত্যের জন্য আত্মার এই যে আঁকুবাকু—ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয় ? মূল-সত্যকে মনুষ্য আজিও সমুচিত আয়ত্ত করিতে পারে নাই, এবং কখনও যে পারিবে—তাহারও সম্ভাবনা নাই,—তবুও কেন মনুষ্যের আত্মা মূল সত্যের পানে তৃষিত চাতকের ন্যায় মুগ্ধনয়নে চাহিয়া আছে ?—কেবল কি চাহিয়া থাকাই সার ! শিশুর পিপাসা নিবৃত্তির জন্য স্তন্য দুগ্ধ রহিয়াছে,—মনুষ্যের আত্মার পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য কি কিছুই নাই ! এ যদি হয়, তবে মনুষ্যত্ব অপেক্ষা পশুত্ব শতগুণে ভাল ! কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, মূল সত্যের প্রতি আত্মার ঐ যে ঐকান্তিক স্পৃহা—তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। আত্মা মূল সত্যকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে না পারুক, যুগে যুগে কিছু কিছু করিয়া আয়ত্ত করিয়া আসিতেছে—সাধক-গণের আপনার আপনার আত্মার পরীক্ষাই ইহার বলবৎ প্রমাণ। প্রকৃত সাধক-গণের মধ্যে মুখ্য অভিসন্ধি এবং মুখ্য কর্ত্তব্য লইয়া মতভেদ নাই—সকল শৃগালেরই এক রায় ;—সাধকের আত্মা যখনই মূল সত্যের সহিত একতানে মিলিত হয় তখনই প্রশান্ত জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া নবীভূত হইয়া উঠে। স্পেন্‌সরের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও ইহা অকাট্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জগতের সকল সত্যই আপেক্ষিক সত্য—কেবল, জগতের মূল-স্থিত সত্যই পরিপূর্ণ সত্য ; তবে, স্পেন্সর বলেন—যে মূল-সত্য একেবারেই অজ্ঞেয়, সুতরাং আমাদের জ্ঞান ও-কার্য্যের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত; কিন্তু স্পেন্সর ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মূল সত্যের প্রভাবেই সমস্ত জগৎ সত্য হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত জগতের সহিত মূল-সত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে : তবেই হইল যে আমাদের আত্মার সহিত—জ্ঞান-প্রেমের সহিত—মূল-সত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে ; এই জন্যই আমরা বলি যে, মূল সত্যের প্রভাব যখন সকল সত্যেতেই বর্ত্তমান—তখন মূল-সত্যের প্রতি আমাদের জ্ঞানের ঐ যে, আকর্ষণ, উহার মধ্যেও সেই তাঁহার প্রভাব কার্য্য করিতেছে ; মূল-সত্য তাঁর প্রভাবেই আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন—আমাদের কল্পনা-প্রভাবে নহে। অনতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, মূল-সত্যের প্রতি আত্মার এই যে আন্তরিক টান, ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ;—শৈত্য যেমন জলের ধর্ম্ম—উত্তাপ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম, মূল-সত্যের প্রতি আকর্ষণ সেইরূপ মনুষ্যের ধর্ম্ম। যে-বুদ্ধি সেই আকর্ষণের অনুকূল—তাহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধি ; আর, যে কার্য্য ধর্ম্ম-বুদ্ধি অনুসারে কৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম-কার্য্য। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মূল-সত্যের উপরে যেমন সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেইরূপ মনুষ্যের ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা মূল সত্য কাহাকে বলি তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা এখন আবশ্যক ;—

মূল সত্য সকল সত্যেরই মূল ; সুতরাং তাহা পরিপূর্ণ সত্য—তাহাতে অপূর্ণতা-সূচক কোন লক্ষণই থাকিতে পারে না। জ্ঞান মঙ্গল, ন্যায়, ইত্যাদি যত কিছু সদ্ভাব আছে সমস্তই সেই একাধারে বর্ত্তমান—এবং অন্যায়, অমঙ্গল, অজ্ঞান, এ-সকল অসদ্ভাব সেখানে স্থান পাইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলি—সমস্ত জগৎ মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের মূল-স্থিত ন্যায় মঙ্গলও

জ্ঞানের উপর মনুষ্যের এমনি অটল আস্থা যে, যদিও আমরা জগতের অপূর্ণতা-নিবন্ধন অন্যায়ের জয়—অমঙ্গলের জয়—অসত্যের জয় শত শত বার দেখিতে পাই, তথাপি আমরা ইহা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হই না যে, জগতে সত্যের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গলের জয় হইবেই হইবে, ন্যায়ের জয় হইবেই হইবে। জগতের মূলস্থিত ন্যায়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতে পারি যে, যে ব্যক্তি জগৎকে ঠকাইতে যায়, সে আপনি ঠকে, যে ব্যক্তি জগতের হিতসাধন করিতে যায় সে আপনার হিতসাধন করে; যে ব্যক্তি জগতের চিরস্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে যায় সে আপনারও চিরস্থায়ী উন্নতি সাধন করে; যে ব্যক্তি জগতের অক্ষয় জীবন এবং অনন্ত উন্নতির জন্য আপনার প্রাণ ঢালিয়া দেয়, সে ব্যক্তি নিজেও অক্ষয় জীবন এবং অনন্ত উন্নতিলাভ করে। ঈশ্বরের ন্যায় নিয়ম—প্রতি মনুষ্যের আত্মা এবং সেই আত্মা-ছাড়া আর সমস্ত জগৎ—এই দুইকে তৌল-দণ্ডের দুই পাত্রে ধরিয়া আছে;—ন্যায়বান্ মূল-সত্য মূলস্থলে আছেন বলিয়াই মনুষ্যের আত্মা যেমন জগতের মঙ্গল চায়, জগৎও তেমনি মনুষ্যের আত্মার মঙ্গল চায়। যে ব্যক্তি জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য আপনার হৃদয়ের ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে এক দিকে রাখ এবং জগৎকে একদিকে রাখ, দেখিবে তাহার গুরুত্ব জগতের গুরুত্ব অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। কাণ্ট বলিয়াছেন যে, একদিকে আকাশ-স্থিত অসংখ্য নক্ষত্র-জগৎ আর এক দিকে আত্মার অভ্যন্তরস্থিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি, এই দুইটি আশ্চর্য্য ব্যাপার যেমন আমার সমক্ষে জাজ্বল্য-রূপে ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে; ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, একটি-মাত্র আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা—অসংখ্য জগতের অপরিমেয় ব্যাপ্তির সহিত ওজনে সমান। যদি জগতেরই অনন্ত কাল উন্নতি চলিতে পারে—তবে কি জগতের ব্যথার ব্যথী—সুখের সুখী—মনুষ্য দুই-চারি-দিন পৃথিবীতে মহা রব-দব লম্ফ-ঝম্প আস্ফালন করিয়া—কিয়ৎকাল পরেই জন্মের মত সাড়া শব্দ বিসর্জ্জন দিয়া অগাধ মহা-শূন্যে পরিণত হইবে! তাহা যদি হয় তবে জগতের মূলস্থিত ন্যায়ের গাত্র চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া রহিবে। জগতের মূলেতেই এইরূপ ন্যায়ের বিপর্য্যয়-দশা!—ইহা যদি একবার মনেতেও ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে ন্যায়-ও-ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিতে আমাদের হস্ত পদ একেবারেই অসাড় হইয়া পড়ে। মূল সত্য যদি সত্যসত্যই লক্ষ্যবিহীন—উদ্দেশ্য-বিহীন—হ'ন, কিম্বা যদি মূল সত্যের উদ্দেশ্য সত্যসত্যই আত্মার বিনাশ ও জগতের অমঙ্গল হয়, তবে কখনই আমরা মঙ্গলকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না, ইহা সুনিশ্চিত;—তাহা হইলে মঙ্গল-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে ঘোরতর বিড়ম্বনা। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, পৃথিবী বরং সূর্য্যের আকর্ষণ ছাড়াইয়া লইয়া অন্ধকারময় মহাশূন্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে, তথাপি মঙ্গল-নিষ্ঠ আত্মা কখনই মঙ্গলময় মূল সত্যের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনাশ পাইতে পারে না। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। আত্মার অভ্যন্তরে অন্বেষণ করিলেই এই আনন্দ-জনক সত্যটি উপলব্ধি করা যাইতে পারে—দূরে যাইতে হয় না। মূল-সত্যের প্রতি আমাদের আত্মার এই যে একটি মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ—ইহা একদিকে আমাদের সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের মূল-প্রবর্ত্তক, আর একদিকে আমাদের আত্মার অমরত্বের নিদান। [illegible]

মূল-সত্যকে ছাড়িয়া, অবিনাশী আত্মার অনন্ত উন্নতিকে ছাড়িয়া, জনসমাজের অনন্ত উন্নতির প্রয়াসী।—ইহারই নাম "গোড়া কাটিয়া আগায় জল।"

আমরা যেখানে বলি মূল-সত্যেই আমাদের বিশ্বাস, কম্‌টি সেখানে বলেন "প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদিগের বিশ্বাস"। ইহা বলিয়াই যদি তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে ও-কথাটি আমরা শিরোধার্য্য করিয়া, তাহার উপর আর-একটি কথা কেবল এই বলিতাম যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীও যেমন বিশ্বাস্য—আধ্যাত্মিক নিয়মাবলীও তেমনি বিশ্বাস্য। আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী কাহাকে বলে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সহিত তাহার প্রভেদ কি, ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে এখানে আমরা একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার স্বল্প আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি, —এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে, ধ্রুব-তারার দিকে চুম্বক-শলাকার আকর্ষণ যেমন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, মূল-সত্যের প্রতি আত্মার আকর্ষণ সেইরূপ আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞেয় বিষয়, মনুষ্য জ্ঞাতা পুরুষ;—জ্ঞেয় বিষয় সকলকে জ্ঞানে আয়ত্ত করা মনুষ্যের পক্ষে যেমন আবশ্যক, জ্ঞাতা পুরুষকে জ্ঞানে আয়ত্ত করাও তেমনি আবশ্যক। বাহ্য-বিষয় সকলকেও আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারি না, আমাদের আপনাদের আত্মাকেও আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারি না; বাহ্য বিষয় সকলও আমরা কিছু কিছু জানি, আত্মাকেও আমরা কিছু কিছু জানি। যাহাকে যতটুকু জানি—তাহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক জানিবার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা অবশিষ্ট থাকে। কোন বিষয়েই—যথেষ্ট সত্য জানা হইয়াছে বলিয়া মনুষ্য অহঙ্কার করিতে পারে না; মনুষ্য আপনার জ্ঞানের মহিমা জ্ঞাপনার্থে কেবল এই পর্য্যন্তই বলিতে পারে যে, সত্যের প্রতি তাহার অসামান্য টান আছে, তাহার সত্য-পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্তি মানিবার নহে। সত্যের এই যে দুর্নিবার পিপাসা—ইহাই মনুষ্য-জ্ঞানের জীবন। কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু "প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস"—এই কথাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, "প্রামাণিক দর্শন বলিতে চাহে না—কেমন করিয়া পৃথিবী সৃষ্ট হইল, অথবা পুরুষের অস্থি হইতে স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইল অথবা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল ইত্যাদি। প্রামাণিক দর্শন বলে জ্যামিতিতে বিশ্বাস কর, বীজগণিতে বিশ্বাস কর, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরবিধান, সমাজ শাস্ত্র, ও ধর্ম্মনীতি (Morals) এই সমস্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস কর; এই বিশ্বাস করিতে মতভেদ নাই, বিবাদ বিসম্বাদ নাই, অনৈক্য নাই। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই ঐ সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। কম্‌টি কহেন এই সকল সিদ্ধান্তই প্রামাণিক দর্শনের বনিয়াদ।" ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, জ্যামিতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের কতকগুলি আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তেই মনুষ্যের জিজ্ঞাসা বা জ্ঞান-পিপাসা সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চুম্বক-শলাকা ধ্রুব-তারার দিকে আকৃষ্ট থাকে—ইহা যেমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, সেইরূপ আত্মার লক্ষ্য পূর্ণ সত্যের দিকে আকৃষ্ট থাকে ইহা একটি আধ্যাত্মিক নিয়ম। এই নিয়মের প্রভাবে আত্মার সত্য-জিজ্ঞাসা কিছুতেই নিবৃত্তি মানিবার নহে। যে দিন মনুষ্যের সত্য-জিজ্ঞাসা একেবারে নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, সেইদিন তাহার মনুষ্যত্বও একেবারে

চলিয়া যাইবে;—তাহার জ্ঞানের জীবন বিনষ্ট হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র যেরূপ অপক্ক সিদ্ধান্ত হইতে ক্রমে ক্রমে পরিপক্ক সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, অধ্যাত্ম-বিদ্যাও সেইরূপ। এখন যেমন Caloric হইতে (অর্থাৎ তাপ-বাহী সূক্ষ্ম পদার্থ-বিশেষ হইতে) উত্তাপের উৎপত্তি কেহই বিশ্বাস করেন না, সেইরূপ আত্মার সুখ হইতে ভালবাসার উৎপত্তি কেহই বিশ্বাস করেন না, উভয় বিশ্বাসেরই কাল এখন গিয়াছে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, আণবিক কম্পনই উত্তাপের কারণ—এবং পরিপূর্ণ মূল সত্যই সকল জগতের মূলাধার। আণবিক প্রকম্পন কিরূপ তাহা যেমন আমরা বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা জানি, মূল সত্য কিরূপ তাহা তেমনি আধ্যাত্মিক পরীক্ষা দ্বারা জানি। তবে কি? না পূর্ণ-মাত্রায় আমরা ইহাও জানি না, উহাও জানি না। কৃষ্ণকমল বাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম যাহা কিছু ইহারি মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই সামাজিক উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মনুষ্যের আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল জনসমাজের সুশৃঙ্খলা সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়াকেই উন্নতি বলিয়া ধরা যায়, তবে মধু-মক্ষিকার সমাজের মত একটা সমাজ গঠন করিতে পারিলেই মনুষ্যের উন্নতির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; তাহা হইলেই অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, মধু-মক্ষিকাই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ ও মধু-মক্ষিকা মনুষ্য-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রকৃত মর্য্যাদার প্রতি আমরা অন্ধ নহি,—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনুষ্যের স্বার্থ-সাধনের খুবই সহায়তা করিতে পারে ইহা আমরা স্বীকার করি,—এমন কি যোগরূপে পরমার্থ সাধনেরও সহায়তা করিতে পারে—কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানই পরমার্থ-সাধনের সবিশেষ উপযোগী—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অধ্যাত্ম-বিদ্যাই আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারে যে, মূল সত্যের সহিত আত্মা এক-তানে মিলিত হইলে—সমস্ত জগতের মূল উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের প্রতিজনের উদ্দেশ্য এক তানে মিলিত হইলে—প্রতি-জনের আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জন-সমাজের উন্নতি সাধিত হইতে থাকে।

"আত্মার উন্নতি" এই কথাটি শুনিয়া কৃষ্ণকমল বাবু হয় তো হাসিবেন, তিনি হয় তো বলিবেন—"আপনার আপনার আত্মাকে লইয়াই যদি সকলে ব্যস্ত রহিলেন তবে জন-সমাজের গতি কি হইবে? এ উপলক্ষে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "যাবতীয় প্রাচীন দর্শন আমি, আমার সুখ, আমার দুঃখ পরিহার, আমার স্বর্গসুখ ভোগ, আমার মোক্ষ, এই সকল ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য জানে না। কিন্তু প্রামাণিক-বাদ (Positivism) সকলের সুখ ও সকলের স্বচ্ছন্দ ইহাকেই উদ্দেশ্য স্বরূপ পরিগ্রহ করে।" ইহার অর্থ অবশ্য এই যে, কমটির ধর্ম্মের মধ্যে "আমি" "আমার" এ সকল কথা স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু কিছু পরেই আবার লেখক বলিতেছেন—"আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভালবাস, আপনার জন্মভূমিকে ভালবাস—তাহাতেও তোমার ভালবাসার খাঁই না মেটে সমস্ত নরজাতিকে ভালবাস, যদি পার তো যতদূর পার ইতর জন্তু সকলকে ভালবাসিতে পারিলেও ক্ষতি নাই,"—এখানে এ কি দেখিতেছি! এখানে দেখিতেছি "আমি" "আমার" এ তার-ওতার ছড়াছড়ি-ব্যাপার! [illegible] "আমার" স্ত্রী-পুত্র, [illegible] "আমার"

জন্মভূমি ; নরজাতি যে—সে আমার স্বজাতীয় জীব ; পশু-পক্ষীর সহিত "আমার" দূর সম্পর্ক বলিয়া তাহাদিগকে ভাল বাসিতে পারি—ভাল,—না পারি—ক্ষতি নাই। এই তো দেখা যাইতেছে যে, আমার স্ত্রী-পুত্র হইতে আমার স্বজাতীয় জীব (অর্থাৎ নরজাতি) পর্য্যন্ত যে-একটী ভালবাসা-বিস্তারের সোপান-পরম্পরা রহিয়াছে, তাহাই ভালবাসার মুখ্য পরিসর, এবং তাহার প্রতি-ধাপেই 'আমি' 'আমার' জড়িত রহিয়াছে। কাজেই 'আমি' 'আমার' এই শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দিলে কমটির অতগুলা কথা একেবারেই ধূমে পরিণত হইয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, আত্ম ও পর এই দুয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত ভালবাসা দাঁড়াইতে পারে না। পরকে ছাড়িয়া দিলেও ভালবাসা চলিতে পারে না—আপনাকে ছাড়িয়া দিলেও ভালবাসা চলিতে পারে না। আত্ম-পরের পরস্পর তন্ময়-ভাবের উপরেই ভালবাসার আদান-প্রদান সুচারু-রূপে চলিতে পারে। ভালবাসা নিজেই একটি আনন্দের বিষয় ;—কাহার আনন্দের বিষয়? যে ভালবাসে তাহারই। আমি যদি ভালবাসি তাহাতে আর কাহারো আনন্দ হোক আর নাই হোক, তাহাতে আমার আনন্দ হইবে তাহাতে আর ভুল নাই। পরের সুখে যদি আমার আনন্দ না হয় তাহা হইলে পরকে ভালবাসার কোন অর্থই থাকে না। এইরূপ দেখা-যাইতেছে যে, যদি আমি ও আমার এই ভাব একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া কম্‌টের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্য একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা হইলেও কম্‌টের নিজের কথাতেই তাহা সমূলে ভূমিসাৎ হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, মূল সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার মঙ্গল-সাধন করিলেও পরের মঙ্গলসাধন করা হয়, পরের মঙ্গলসাধন করিলেও আপনার মঙ্গল সাধন করা হয় ; কেননা মূল সত্যের প্রভাবে আত্ম-পর সমস্তই এক মঙ্গল-সূত্রে আবদ্ধ। সেক্সপিয়ার এ বিষয়ে কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes.

করুণা-গুণ বলপূর্ব্বক নিঙড়াইয়া আনিতে হয় না,—সুধীর বারিধারার ন্যায় তাহা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য-ভূমিতে অবতীর্ণ হয়। তাহা যুগল কল্যাণ-ময়ী—দাতার প্রতিও কল্যাণ বর্ষণ করে, গৃহীতার প্রতিও কল্যাণ বর্ষণ করে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যে, আমার সুখ, আমার মোক্ষ, ইত্যাদি আছে তাহার অর্থ তো আর ইহা নহে যে, শাস্ত্রকার তাঁহার নিজের সুখের জন্যই—নিজের মোক্ষের জন্যই—ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন ; সমস্ত জন-সমাজ যদি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তবে সমস্ত জন-সমাজেরই মঙ্গল হইবে—ইহা যে শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নহে ইহা কে বলিল? আমরা কথায় বলি "জন-সাধারণ," কিন্তু জন-সাধারণ জিনিস্-টা কি? শত সহস্র আমিরই (অর্থাৎ আত্মারই) কেবল সমষ্টি। সে আমি-গুলি বাদ দিলে জন সাধারণের কি-আর অবশিষ্ট থাকে? যন্ত্রায়মান চর্ম্ম-পুত্তলিকা-প্রবাহের শূন্য-গর্ভ আড়ম্বর—এ ভিন্ন আর কি? কিন্তু বাস্তবিক কিছু-আর জন-সমাজ কলের পুতুলের সমাজ নহে—তাহা জ্যান্ত আত্মারই সমাজ ; "আমি" এবং "আমার" তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুস্যূত রহিয়াছে ; এমন কি—ঈশ্বর-ভক্ত ব্যক্তি যখন নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরকে ডাকেন তখনও তিনি বলেন "আমার ঈশ্বর"। তবে যদি কৃষ্ণকমল বাবু এইরূপ বলেন যে, স্বর্গ-সুখ-

কেবল আত্ম-সুখ মাত্র, স্ত্রীপুত্র পরিবারকে লইয়া সে সুখ ভোগ করা যায় না, সুতরাং সে সুখ-সাধনের বিধি দিলে লোকের স্বার্থপরতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়; তবে তাহার উত্তর এই যে মনে কর এক ব্যক্তি শীত-প্রধান সাইবিরিয়ার জনশূন্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইতেছেন, তাঁহার গায়ে শীত বস্ত্র নাই; এস্থলে তাঁহাকে যদি কোন হিতৈষী ব্যক্তি শীতবস্ত্র পরিধানের উপদেশ দেন, কম্‌টি কি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিবেন—"তুমি এমন কর্ম্ম করিতেছ। দেখিতেছ না—শীতবস্ত্র গায়ে দিলে উঁহার কেবল আপনারই সুখ হইবে, উঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার আর কেহই উঁহার সে-সুখের ভাগী হইবে না; এরূপ উপদেশ দান পূর্ব্বেকার লোকেরা যাহা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন—কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীতে ইহা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।" এইরূপ যুক্তিতেই বলা যাইতে পারে যে, পরলোক প্রয়াণের সময় স্ত্রী পুত্র কেহই সঙ্গে যাইবে না—অতএব পরলোকের সুখের জন্য পুণ্য-সংগ্রহ করিতে বলা—অতি অহৃদয় ব্যক্তির কার্য্য। কৃষ্ণকমল বাবু যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, পরকালোচিত ধর্ম্ম-ইহকালোচিত ধর্ম্মের বিরোধী পক্ষ, তাহা হইলে তিনি নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ডের উপর একবার-মাত্র চক্ষু বুলাইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার সে ভ্রম তিরোহিত হইয়া যাইবে;—তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে, ইহকালের ধর্ম্মই পরকালের ধর্ম্ম;—সে ধর্ম্ম কি? না, ঈশ্বরকে ভক্তি করা, পিতা-মাতাকে ভক্তি করা, স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করা, সত্য কথা বলা—সত্য ব্যবহার করা, ইত্যাদি; এবং ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, ইহকালের আত্মপ্রসাদ এবং পরকালের স্বর্গ-সুখ—একই অভিন্ন বস্তু। এ বিষয়ে আমাদের চরম বক্তব্য এই যে, পৌরাণিক হিন্দু-শাস্ত্র স্বতন্ত্র এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক হিন্দু-শাস্ত্র স্বতন্ত্র; শেষোক্ত হিন্দু-শাস্ত্রে ঐহিক পারত্রিক আত্ম-প্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য কোন স্বর্গ-সুখকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ কম্‌টের উপদেশ হইতে যে কিসে কম তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কম্‌টি যেরূপ সহানুভূতির কথা বলিতেছেন, আমাদের শাস্ত্রে তাহা কেমন-যে নির্দ্দোষ-রূপে বলা হইয়াছে তাহা আমরা পরে দেখাইব। কিন্তু আগে একটা গল্প বলি। একজন খৃষ্টান বাঙ্গালী একজন হিন্দু বাঙ্গালীকে বলিতেছিলেন "আমাদের দেখ দেখি কেমন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম—প্রভু যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "যদি কেহ তোমার এক গালে চড় মারে তবে তাহাকে আর এক গাল ফিরাইয়া দিবে।" একজন পার্শ্ববর্ত্তী বাঙ্গালী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"যাহা কিছু ভাল সব তোমাদের শাস্ত্রেই বলে। তবে কি আমাদের শাস্ত্রে বলে—মানুষ দেখেছ কি অমনি তাড়াইয়া গিয়া লাঠি মারিবে?" অধুনা আমাদের মধ্যে, স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি অবিচার করা—একরূপ লৌকিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু, কৃষ্ণকমল বাবুর স্বদেশের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ বোধ হয় স্বতন্ত্র;—আমাদের অনুমানে দুইটি কারণ দেখা দিতেছে (১) কম্‌টের প্রতি অসামান্য ভক্তি, (২) বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মূঢ় জনের পাণ্ডিত্যের প্রতি চটা ভাব—ইহা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক;—এমন অনেক কুসংসর্গ আছে, যাহার সহিত সহানুভূতি করিতে গেলে, আপনাকে

পতিত হইতে হয়, এবং মন্দকে উৎসাহ দেওয়া হয়; এমন স্থলে সহানুভূতি আত্ম-পর কাহারো পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তবেই দাঁড়াইতেছে সহানুভূতি-বিস্তারেরও সীমা আছে। অতএব "সকলের প্রতি সহানুভূতি" শুনিতে যেমন জোরের শুনায় উহা প্রকৃত পক্ষে তেমন নহে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার উপর কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না; আমাদের শাস্ত্রে আছে

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ পুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং।"

সুখের প্রতি মৈত্রী, অর্থাৎ পরের সুখে সুখ-বোধ; দুঃখের প্রতি করুণা, অর্থাৎ পরের দুঃখে দুঃখ-বোধ; পুণ্যের প্রতি মুদিতা (অর্থাৎ অনুমোদন); এবং পাপের প্রতি উপেক্ষা (অর্থাৎ তাচ্ছিল্য); এই সকল ভাবদ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা সাধন করিবে। দেখ—কেবল সহানুভূতির চর্চ্চা অপেক্ষা এ সাধন কত নির্দ্দোষ এবং শুভ-জনক! ঐ উপদেশ বাক্যটিতে কেবল সুখ-দুঃখ ও পুণ্যের প্রতি সহানুভূতি করিবার বিধি আছে—পাপের প্রতি নহে। আবার, পাপের প্রতি পাপাচরণ—যেমন শঠে শাঠ্য—ইহাও শাস্ত্রকারের মতে নিষিদ্ধ; পাপের প্রতি কেবল উপেক্ষারই অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন—পাপের প্রতি উপেক্ষা হইলে আর পাপ-সংশোধন হইল কই? শুধু পাপের প্রতি উপেক্ষা এই কথাটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে ঐরূপ দোষ ঘটে তাহা আমরা স্বীকার করি—কিন্তু পাপের প্রতি উপেক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের প্রতি অনুমোদন—অর্থাৎ উৎসাহ দান—ইহার বিধি দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক দেখা যায়, পাপকে পাপ দ্বারা পরাজয় করা যায় না, পুণ্যই পাপকে পরাজয় করিতে সমর্থ। পাপের প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি লোকের চক্ষের সমক্ষে পুণ্যের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার গুণে যেমন মনুষ্যের ধর্ম্ম-ভাব উত্তেজিত হইতে পারে ও পাপের প্রতি বিরাগ জন্মিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। ইহাই পাপ-সংশোধনের প্রশস্ত উপায়। পতঞ্জল মুনির ঐ প্রাচীন উপদেশটি কমৃটের সহানুভূতির উপদেশ অপেক্ষা কত না সার-গর্ভ।

কৃষ্ণকমল বাবু বলিতে পারেন—আমাদের শাস্ত্রের উপরি-উক্ত ঐ যে ব্যবস্থা উহার উদ্দেশ্য কেবল আপনার চিত্তের প্রসাদনা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পরের সুখে যদি আমার নিজের আনন্দ না হয় তাহা হইলে পরকে ভালবাসার কোন অর্থই থাকে না। প্রসন্ন চিত্তে ভালবাসাই ভালবাসা; ওষুধ-গেলা রকমের ভালবাসা ভালবাসাই নহে। ধর্ম্ম-কার্য্যের সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্ত-প্রসাদ লাগিয়া থাকা আবশ্যক; ধর্ম্মানুষ্ঠাতার যতক্ষণ না চিত্ত-প্রসাদ হয় ততক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। শুধু কার্য্যেতেই ধর্ম্ম হয় না, কার্য্য-কর্ত্তার মনের ভাবেতেই ধর্ম্ম হয়। একই কার্য্য নানা ভাবে কৃত হইতে পারে—যদি তাহা ধর্ম্ম-বুদ্ধি অনুসারে কৃত হয় তবেই তাহা ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া উক্ত হইতে পারে। শুধু যদি কার্য্য লইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার্য্য হইত, তাহা হইলে একটা অবাস্তব শূন্য ভাব অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবারও যে মূল্য, পূর্ণ সত্য পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবারও সেই মূল্য হইত। কিন্তু মনের ভাবকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু কেবল কৃত কার্য্যেতে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন লক্ষণই বর্ত্তিতে পারে না,—একটা কলের পুতুল আর একটা পুতুলকে হত্যা করিলে সে পাপে লিপ্ত হয় না—একটা ব্যাঘ্র নরহত্যা করিলেও পাপে

লিপ্ত হয় না; মনুষ্য যদি কেবল একটা যন্ত্র মাত্র হইত, অথবা পশু-বিশেষ হইত, তবে মনুষ্য মূলেই ধর্ম্ম-কার্য্যের অধিকারী হইত না—ইহা জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় সুস্পষ্ট। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আছে বলিয়াই—পরিপূর্ণ মঙ্গল-সত্যের প্রতি তাহার আত্মার আকর্ষণ আছে বলিয়াই—এবং মনুষ্য সেই আকর্ষণের অনুকূলে আপনার বুদ্ধিকে নিয়োগ করিতে পারে বলিয়াই—সেইরূপ মঙ্গল-সত্য-নিষ্ঠ বুদ্ধিকে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধি বলি; ও সেইরূপ বুদ্ধির অনুসারে যে কার্য্য কৃত হয় তাহাকেই আমরা ধর্ম্ম-কার্য্য বলি। মূল-সত্য-নিষ্ঠ ধর্ম্ম-বুদ্ধি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-কার্য্য হইতেই পারে না। গত মাসের ভারতীতে এটি আমরা বিশদরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি; কম্‌টি আর-একরূপ বলেন—ইহা লইয়াই কম্‌টির সহিত আমাদের যত কিছু বিবাদ। গত মাসের ভারতীতে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার সার-সিদ্ধান্ত এই;—মনুষ্যের কার্য্যের উদ্দেশ্য তিনটি, (১) উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন; (২) উত্তেজিত এবং অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তির যথোপযুক্ত চরিতার্থতা-সাধনের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার স্থায়ী সুখ-সাধন, এক কথায় স্বার্থ সাধন; (৩) আপনার প্রকৃত স্বার্থ এবং অন্য-সকলকার প্রকৃত স্বার্থ—এই সকল স্বার্থের যথোপযুক্ত চরিতার্থতা-সাধনের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মূল-সত্যের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন—এক কথায় পরমার্থ-সাধন। পরমার্থ-সাধনই আমাদের মতে ধর্ম্ম-সাধন এবং পরমার্থদর্শী বুদ্ধিই আমাদের মতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, পরমার্থ-সাধন করিতে হইলে স্বার্থকে একেবারেই উড়াইয়া দিতে হয়;—স্বার্থ-সাধন করিতে হইলেও প্রবৃত্তিকে উড়াইয়া দিতে হয় না, পরমার্থ-সাধন করিতে হইলেও স্বার্থকে উড়াইয়া দিতে হয় না;—করিতে হয় কেবল—সামঞ্জস্য-সাধন; অর্থাৎ উচ্চকে প্রাধান্য দেওয়া—নীচকে নীচে রাখা—মধ্যমকে মধ্যে রাখা—ইত্যাদি। উত্তেজিত এবং অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য (এক কথায়—স্বার্থ) অগ্রে বিবেচ্য, উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা তাহার পরে বিবেচ্য; উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা যে অংশে স্বার্থের অনুমোদিত সে অংশে তাহা কার্য্য-কর্ত্তার বৈষয়িক ক্ষতি-জনক নহে; ঠিক এইরূপ যুক্তি-অনুসারে পাওয়া যায় যে, আপনার এবং পরের—সকলকার—মঙ্গল (এক কথায় পরমার্থ) অগ্রে বিবেচ্য, আপনার স্বার্থ তাহার পরে বিবেচ্য; আপনার স্বার্থ-সাধন যে অংশে পরমার্থের অনুকূল সে অংশে তাহা ধর্ম্মের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক—বরং তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে,—পরমাত্মার অধীনে জীবাত্মাকে, জীবাত্মার অধীনে মনকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; অথবা, যাহা একই কথা,—ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে বিষয়-বুদ্ধিকে, বিষয়-বুদ্ধির অধীনে ইন্দ্রিয়-গণকে, নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; অথবা যাহা একই কথা,—পরমার্থের অধীনে স্বার্থকে, স্বার্থের অধীনে প্রবৃত্তি-গণকে, নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য;—ইহাই, আমাদের মতে, ধর্ম্মের বীজ মন্ত্র। উপসংহার-স্থলে সহানুভূতি বা মৈত্রী সম্বন্ধে আমাদের শেষ কর্ত্তব্য এই যে, যে মৈত্রী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সহসা উৎপন্ন হয়—যেমন বালকে বালকে মৈত্রী—তাহা এক-রূপ; আবার, যে মৈত্রী স্বার্থের মন্ত্রণায় বিধেয় বলিয়া মনে হয়—যেমন রাজনৈতিক সাম, দান, ভেদ, মৈত্রী, ইত্যাদি শেষের টি—ইহা আর-একরূপ; কেবল, যে মৈত্রী পরমার্থ-উদ্দেশে সাধন করা হয়, অর্থাৎ আমার

তোমার এবং সকলকার মঙ্গল-সাধন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য—ইহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে সাধ্যানুসারে আত্ম-পর-নির্বিশেষে সাধন করা হয়, সেইরূপ মৈত্রীই ধর্ম্ম-নামের যোগ্য।

ভারতী

চরিত্র রক্ষিণী সভা।

সম্প্রতি একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য বালকদিগের চরিত্ররক্ষা। উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ কিন্তু চরিত্ররক্ষার যে সমস্ত উপায় অবধারিত হইয়াছে তাহা বিবেচ্য।

চরিত্র বলিতে কার্য্যমাত্র বুঝায়। তাহার মূলে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। এই দুইটী নির্দ্দোষ হইলে চরিত্রও নির্দ্দোষ হয়। সুতরাং চরিত্র সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। কিন্তু বালকদিগের এই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কিরূপে নির্দ্দোষ হয়। কেহ বলেন শিক্ষার সহিত নীতির সংযোগ থাকিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা তো বিদ্যালয়ে ইহার কিছুমাত্র অভাব দেখি না কিন্তু ফলে কি হইতেছে। বাস্তবিক কেবল নীতিশিক্ষা দ্বারা বিশেষ কিছুই ফল হইতে পারে না—কুশ্চরিত্রের সংসর্গত্যাগ এবং সাধু-সঙ্গের আবশ্যক। বিশেষতঃ গৃহেতে পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্ত চরিত্র গঠনের প্রধান উপায়।

বিদ্যালয়ই বল আর বন্ধু বান্ধবই বল বালকের অধিক সংশ্রব গৃহের সহিত। পিতা মাতা ও আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত। ইহাদের সহিত ব্যাপক কালের সংশ্রব নিবন্ধন ইহাদিগের কার্য্যাকার্য্য অপ্রত্যক্ষরূপে বালকদিগের চরিত্র প্রস্তুত করিতেছে থাকে। গৃহই চরিত্রের মূল, সুতরাং গৃহ যদি বিশুদ্ধ হয় তাহা হইলে বালকদিগের চরিত্রশুদ্ধির জন্য উপায়ান্তর অনাবশ্যক।

বহু পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে জননী পুত্রকে স্তনপান করাইবার কালে একটী মন্ত্র গান করিত *। তাহার অর্থ এই যে আমার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহানাম্নী ব্রতের পারগামী হইবে। কি চমৎকার নিয়ম। মাতৃস্তন-দুগ্ধের সহিত মাতার সাধু ইচ্ছা বালক গ্রহণ করিত। আবার দেখ পিতা ও আত্মীয় অন্তরঙ্গের চেষ্টাও বালকের চরিত্র গঠনের কতদূর অনুকূল ছিল। ইহাঁরা রাত্রি প্রভাত হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত যা কিছু করিতেছেন তৎসমস্তেরই সহিত ধর্ম্মের প্রগাঢ় যোগ। এখন বিবেচনা কর এইরূপ পিতা মাতার পুত্র কিরূপ হওয়া সম্ভব। আমি এমন কিছু বলিতেছি না যে পূর্ব্বকালে সকল বালকই সুশীল ও সচ্চরিত্র হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি চরিত্র সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। সুতরাং সচ্চরিত্রতার হেতু আত্মসংযম। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া আত্মসংযম অভ্যাস করা বড় কঠিন ব্যাপার। ইহা বালকের কর্ম্ম নহে। তবে যে ইহা সম্ভব তাহা পিতা মাতা ও আত্মীয় অন্তরঙ্গের গুণে। বালকের ধর্ম্ম এই যে যাহা সর্ব্বদা দেখে সে তাহাই শিখে। কঠিন হইলেও তাহা সহজে শিখে। সুতরাং পুত্রেরা পূর্ব্বে পিতা মাতার যেরূপ দেখিত কঠিন হইলেও তাহা সহজে শিখিত। এই জন্য তখনকার বালকদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই চরিত্র শুদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং তাহাই হইত।

এখন বুঝা গেল যে গৃহ এবং যে সমস্ত বাহ্য ব্যাপার দ্বারা নিরন্তর পরিবৃত থাকা যায় সেই গুলি বালকের চরিত্র গঠনের মূল। কিন্তু এখনকার জনসমাজের অবস্থা কি। ইহা অতি শোচনীয়। ধনী ও দরিদ্র উভয়

---

* কুমারান্ স্তন্যং বৈ পায়য়মানা আহুঃ সক্করীণাং পুত্রকা ব্রতং পারয়িষ্ণবো ভবতেতি।

শোভিল গৃহ্য সূত্র।

লিপ্ত হয় না; মনুষ্য যদি কেবল একটা যন্ত্র মাত্র হইত, অথবা পশু-বিশেষ হইত, তবে মনুষ্য মূলেই ধর্ম্ম-কার্য্যের অধিকারী হইত না—ইহা জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় সুস্পষ্ট। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আছে বলিয়াই—পরিপূর্ণ মঙ্গলসত্যের প্রতি তাহার আত্মার আকর্ষণ আছে বলিয়াই—এবং মনুষ্য সেই আকর্ষণের অনুকূলে আপনার বুদ্ধিকে নিয়োগ করিতে পারে বলিয়াই—সেইরূপ মূল-সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিকে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধি বলি; ও সেইরূপ বুদ্ধির অনুসারে যে কার্য্য কৃত হয় তাহাকেই আমরা ধর্ম্ম-কার্য্য বলি। মূল-সত্য-নিষ্ঠ ধর্ম্ম-বুদ্ধি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-কার্য্য হইতেই পারে না। গত মাসের ভারতীতে এটি আমরা বিশদরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি; কম্‌টি আর-একরূপ বলেন—ইহা লইয়াই কম্‌টির সহিত আমাদের যত কিছু বিবাদ। গত মাসের ভারতীতে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার সার-সিদ্ধান্ত এই;—মনুষ্যের কার্য্যের উদ্দেশ্য তিনটি, (১) উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন; (২) উত্তেজিত এবং অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তির যথোপযুক্ত চরিতার্থতা-সাধনের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার স্থায়ী সুখ-সাধন, এক কথায়—স্বার্থ সাধন; (৩) আপনার প্রকৃত স্বার্থ এবং অন্য সকলকার প্রকৃত স্বার্থ—এই সকল স্বার্থের যথোপযুক্ত চরিতার্থতা-সাধনের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মূল-সত্যের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন—এক কথায় পরমার্থ-সাধন। পরমার্থ-সাধনই আমাদের মতে ধর্ম্ম-সাধন এবং পরমার্থদর্শী বুদ্ধিই আমাদের মতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, পরমার্থ-সাধন করিতে হইলে স্বার্থকে একেবারেই উড়াইয়া দিতে হয়;—স্বার্থ-সাধন করিতে হইলেও প্রবৃত্তিকে উড়াইয়া দিতে হয় না, পরমার্থ-সাধন করিতে হইলেও স্বার্থকে উড়াইয়া দিতে হয় না;—করিতে হয় কেবল—সামঞ্জস্য-সাধন; অর্থাৎ উচ্চকে প্রাধান্য দেওয়া—নীচকে নীচে রাখা—মধ্যমকে মধ্যে রাখা—ইত্যাদি। উত্তেজিত এবং অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য (এক কথায়—স্বার্থ) অগ্রে বিবেচ্য, উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা তাহার পরে বিবেচ্য; উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা যে অংশে স্বার্থের অনুমোদিত সে অংশে তাহা কার্য্য-কর্ত্তার বৈষয়িক ক্ষতি-জনক নহে; ঠিক এইরূপ যুক্তি-অনুসারে পাওয়া যায় যে, আপনার এবং পরের—সকলকার—মঙ্গল (এক কথায় পরমার্থ) অগ্রে বিবেচ্য, আপনার স্বার্থ তাহার পরে বিবেচ্য; আপনার স্বার্থ-সাধন যে অংশে পরমার্থের অনুকূল সে অংশে তাহা ধর্ম্মের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক—বরং তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে,—পরমাত্মার অধীনে জীবাত্মাকে, জীবাত্মার অধীনে মনকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; অথবা, যাহা একই কথা,—ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে বিষয়-বুদ্ধিকে, বিষয়-বুদ্ধির অধীনে ইন্দ্রিয়-গণকে, নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; অথবা যাহা একই কথা,—পরমার্থের অধীনে স্বার্থকে, স্বার্থের অধীনে প্রবৃত্তি-গণকে, নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য;—ইহাই, আমাদের মতে, ধর্ম্মের বীজ মন্ত্র। উপসংহার-স্থলে সহানুভূতি বা মৈত্রী সম্বন্ধে আমাদের শেষ কর্ত্তব্য এই যে, যে মৈত্রী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সহসা উৎপন্ন হয়—যেমন বালকে বালকে মৈত্রী—তাহা এক-রূপ; আবার, যে মৈত্রী স্বার্থের মন্ত্রণায় বিধেয় বলিয়া মনে হয়—যেমন রাজনৈতিক সাম, দান, ভেদ, মৈত্রী, ইহার শেষেরটি—ইহা আর-একরূপ; কেবল, যে মৈত্রী পর-মার্থ-উদ্দেশে সাধন করা হয়, অর্থাৎ আমার

তোমার এবং সকলকার মঙ্গল-সাধন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য—ইহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে সাধ্যানুসারে আত্ম-পর-নির্ব্বিশেষে সাধন করা হয়, সেইরূপ মৈত্রীই ধর্ম্ম-নামের যোগ্য।

ভারতী

চরিত্র রক্ষিণী সভা।

সম্প্রতি একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য বালকদিগের চরিত্ররক্ষা। উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ কিন্তু চরিত্ররক্ষার যে সমস্ত উপায় অবধারিত হইয়াছে তাহা বিবেচ্য।

চরিত্র বলিতে কার্য্যমাত্র বুঝায়। তাহার মূলে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। এই দুইটী নির্দ্দোষ হইলে চরিত্রও নির্দ্দোষ হয়। সুতরাং চরিত্র সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। কিন্তু বালকদিগের এই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কিরূপে নির্দ্দোষ হয়। কেহ বলেন শিক্ষার সহিত নীতির সংযোগ থাকিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা তো বিদ্যালয়ে ইহার কিছুমাত্র অভাব দেখি না কিন্তু ফলে কি হইতেছে। বাস্তবিক কেবল নীতিশিক্ষা দ্বারা বিশেষ কিছুই ফল হইতে পারে না—কুচরিত্রের সংসর্গত্যাগ এবং সাধু-সঙ্গের আবশ্যক। বিশেষতঃ গৃহেতে পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্ত চরিত্র গঠনের প্রধান উপায়।

বিদ্যালয়ই বল আর বন্ধু বান্ধবই বল বালকের অধিক সংশ্রব গৃহের সহিত। পিতা মাতা ও আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত। ইহাদের সহিত ব্যাপক কালের সংশ্রব নিবন্ধন ইহাদিগের কার্য্যাকার্য্য অপ্রত্যক্ষরূপে বালকদিগের চরিত্র প্রস্তুত করিতে থাকে। গৃহই চরিত্রের মূল। সুতরাং গৃহ যদি বিশুদ্ধ হয় তাহা হইলে বালকদিগের চরিত্রশুদ্ধির জন্য উপায়ান্তর অনাবশ্যক।

বহু পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে জননী পুত্রকে স্তনপান করাইবার কালে একটী মন্ত্র গান করিত *। তাহার অর্থ এই যে আমার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহানাম্নী ব্রতের পারগামী হইবে। কি চমৎকার নিয়ম। মাতৃস্তন-দুগ্ধের সহিত মাতার সাধু ইচ্ছা বালক গ্রহণ করিত। আবার দেখ পিতা ও আত্মীয় অন্তরঙ্গের চেষ্টাও বালকের চরিত্র গঠনের কতদূর অনুকূল ছিল। ইহাঁরা রাত্রি প্রভাত হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত যা কিছু করিতেছেন তৎসমস্তেরই সহিত ধর্ম্মের প্রগাঢ় যোগ! এখন বিবেচনা কর এইরূপ পিতা মাতার পুত্র কিরূপ হওয়া সম্ভব। আমি এমন কিছু বলিতেছি না যে পূর্ব্বকালে সকল বালকই সুশীল ও সচ্চরিত্র হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি চরিত্র সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। সুতরাং সচ্চরিত্রতার হেতু আত্মসংযম। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া আত্মসংযম অভ্যাস করা বড় কঠিন ব্যাপার। ইহা বালকের কর্ম্ম নহে। তবে যে ইহা সম্ভব তাহা পিতা মাতা ও আত্মীয় অন্তরঙ্গের গুণে। বালকের ধর্ম্ম এই যে যাহা সর্ব্বদা দেখে সে তাহাই শিখে। কঠিন হইলেও তাহা সহজে শিখে। সুতরাং পুত্রেরা পূর্ব্বে পিতা মাতার যেরূপ দেখিত কঠিন হইলেও তাহা সহজে শিখিত। এই জন্য তখনকার বালকদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই চরিত্র শুদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং তাহাই হইত।

এখন বুঝা গেল যে গৃহ এবং যে সমস্ত বাহ্য ব্যাপার দ্বারা নিরন্তর পরিবৃত থাকা যায় সেই গুলি বালকের চরিত্র গঠনের মূল। কিন্তু এখনকার জনসমাজের অবস্থা কি। ইহা অতি শোচনীয়। ধনী ও দরিদ্র উভয়

---

* কুমারাণিহ্ম বৈ পায়য়মানা আহঃ সক্বরীণাং পুত্রকা ব্রতং পারয়িষ্ণবো ভবতেতি।

শোভিল গৃহ্য সূত্র।

শ্রেণীর ভাবই পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাঁহাদের অন্ন সংস্থান আছে বর্ত্তমানে তাঁহাদের ভিতর কেবলই ভোগ বিলাস, পানদোষ ও ব্যভিচার। আবার যাহারা দরিদ্র তাহাদের কেবলই জীবনের নিমিত্ত কঠোর চেষ্টা! দেশের অর্থ দেশের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশগামী হইতেছে। এ সময় যে কোন উপায়ে হউক অন্যের মুখ হইতে যে যা কিছু কাড়িয়া লইতে পারে সেই টুকুই তাহার লাভ। এই জন্য প্রবঞ্চনা প্রতারণা খুব বাড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং জনসমাজ এখন বাহ্য ভাবে মুহ্যমান। আবার অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে ধর্ম্ম থাকে না। সুতরাং এখনকার গৃহ আর পূর্ব্ববৎ নাই। জনসমাজে ধর্ম্ম ও নীতি ক্রমশঃ কথা মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া আসিতেছে। সৎ দৃষ্টান্ত অপেক্ষা এখন অসৎ দৃষ্টান্তই অধিক। এইরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়ে ভূরি ভূরি নীতিগ্রন্থই নির্ব্বাচিত হউক, আর সভা সমিতিই কর, চরিত্র শুদ্ধিকল্পে কিছুতেই বালকদিগের সহায়তা হইবে না। যত দিন গৃহ ও বাহ্য ব্যাপার ইহার অনুকূল না হইতেছে তাবৎ সমস্ত চেষ্টাই বিফল।

এক্ষণে উপসংহারে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা ভারতবাসী, অকিঞ্চন হইয়াও ধর্ম্মরক্ষা করা আমাদের চির দিনের অভ্যাস। এক্ষণে সেই অভ্যাসের বলে জীবনের চেষ্টাকে তুচ্ছ করিয়া যদি আবার গৃহে গৃহে ধর্ম্মকে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে পার তাহার চেষ্টা দেখ। তখন ধর্ম্মও আবার পূর্ব্ববৎ রাজত্ব করিবে। তখন সাধু দৃষ্টান্তের অভাবে বালকেরা বিপথে যাইবে না এবং চরিত্ররক্ষিণী সভারও কোন আবশ্যকতা থাকিবে না।

ব্রাহ্ম-জীবন।

ধর্ম্মমত ধর্ম্মজীবনকে গঠিত করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতে দেখা যায় না। কার্য্যতঃ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন দুইটী সম্বন্ধহীন বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার ধর্ম্মমত যেরূপ, তাহার ধর্ম্মজীবন ঠিক সেইরূপ, ইহা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মমত উচ্চ ও পবিত্র হইলে ধর্ম্ম-জীবনও উচ্চ ও পবিত্র হওয়া উচিত, কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় তাহা আমরা বড় অল্প দেখিতে পাই। জীবনের উপর ধর্ম্মের প্রভাব অতি বলবৎ ও গভীর, কিন্তু মানুষ এতদূর ইন্দ্রিয়ের দাস, এতদূর প্রবৃত্তির বশ, এতদূর সংসারাসক্ত ও ভোগ-সুখাভিলাষী যে সে সহজে স্বীয় ধর্ম্মমতানুসারে সম্পূর্ণরূপে জীবন গঠন করিতে পারে না। পৌত্তলিক মতাবলম্বীগণের মধ্যে অল্পই প্রকৃত ভক্ত ও চরিত্রবান পৌত্তলিক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে খ্রীষ্টের উপদেশানুসারে কার্য্য করেন এরূপ লোক অতি বিরল। মুসলমানদিগের মধ্যে মহম্মদের প্রকৃত শিষ্য কয় জন আছেন? এইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের মধ্যেই দেখা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতানুসারে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে পারে না।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যেমন, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মত অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি মহান, অতি সুন্দর, কিন্তু ব্রাহ্মগণের মধ্যে কয় জন ব্রাহ্ম জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন? কয় জন ব্রাহ্মের জীবন ব্রাহ্মমতের ন্যায় উচ্চ পবিত্র, মহান ও সুন্দর হইয়াছে? [illegible] কাল হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম [illegible] য়াছে। ইহার [illegible]

ছেন, ব্রাহ্ম মতে বিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সেই বিশ্বাসানুসারে জীবন গঠন করিয়াছেন। ব্রাহ্মমতের তত অভাব আমরা বোধ করি না, কিন্তু ব্রাহ্ম-জীবনের বড়ই অভাব দেখা যায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মই মত প্রচারের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন কিরূপে সেই মতানুসারে গঠিত হইবে তাহার প্রতি তত দৃষ্টি করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন তাহা হইলে অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়েরও সেইরূপ অবস্থা হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্ম শত শত বৎসর প্রচলিত হইলেও খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রকৃত ধর্ম্মজীবন দেখা যাইবে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। ঐ সকল ধর্ম্ম বহুকালে ঠেকিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, না ঠেকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের তাহা বুঝা উচিত। প্রথম প্রথম ঐ সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণের বিশ্বাস ছিল যে কেবল মতপ্রচারেই লোকের ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে পারা যায়, কিন্তু বহুকালের অভিজ্ঞতায় তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে কেবল মত প্রচার দ্বারা লোকের জীবন নিয়মিত করা প্রায় অসম্ভব। প্রাচীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গণের এই অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকগণের কখনই উচিত নহে। অগ্রাহ্য করিলে, ঐ সকল ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বহুকাল জগতে প্রচলিত হইলেও লোকের ধর্ম্মজীবন গঠনে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইবে না।

[illegible] যাহাতে ব্রাহ্মজীবনের অধিকারী হইতে পারেন, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতের না[illegible] আপনাদিগের জীবনকে উচ্চ, পবিত্র, মহা[illegible] ও সুন্দর করিতে পারেন, তৎসাধনের প্রতি অধিকতর যত্নবান হইলে ব্রাহ্ম প্রচারকগ[ণ] ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন কেননা লোকে ব্রাহ্মদিগের জীবনের মহত্ত্ব পবিত্রতা, উচ্চতা ও সৌন্দর্য্য দেখিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণে যতদুর আকৃষ্ট হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম মতের মনোহর ব্যাখ্যা শুনিয়া তদ্দূর আ[কৃষ্ট] হইবে না। আমরা আশা করিয়া থাকি যে এমন এক কাল আসিবে যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, কিন্তু আমরা যদি ব্রাহ্মজীবন গঠনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ অর্পণ না করি, আমরা যদি প্রকৃত চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারি, আমরা যদি লোককে ব্রাহ্ম করিয়া তাহাদিগের জীবনকে প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবনে উন্নত করিয়া তুলিতে না পারি কেবল যদি আমরা ব্রাহ্মমত প্রচারেই ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের সে আশা কখন পূর্ণ হইবে না, সে বিশ্বাস কখন সফল হইবে না। যদি আমরা সমগ্র পৃথিবীর লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পবিত্রাত্ত করাইতে চাহি, তবে ব্রাহ্ম জীবনের মহত্ত্ব দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতে হইবে, ব্রাহ্মজীবনের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ মত ও মহৎ উপদেশের অনুযায়ী না হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম হইবার আশা নাই।

দুইটী প্রধান কারণে ব্রাহ্মজীবন গঠন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে মহান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্ম হইয়া যদি জীবনই উন্নত না হইল, ব্রাহ্ম হইয়া যদি ব্রাহ্মের অনুযায়ী কার্য্য ও মতি গতি না হইল তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে কি ফল হইল

ব্রাহ্ম যিনি তিনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে না পারিলেন তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্ম হইবার উদ্দেশ্য যে জীবন্মুক্তি লাভ তাহা সম্পন্ন হইল কোথায়? প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার এই প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের [illegible] জীবন গঠন করা যেরূপ কর্ত্তব্য হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার [illegible] উহা সেই রূপ আবশ্যক হইয়াছে। [illegible] প্রচার-কার্য্য অনেক লোকের [illegible] করিবে। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবন যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী না হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ [illegible] কর্ত্তব্য কখনই সম্যক্ রূপে পালন করিতে পারেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম, জীবনকে তদনুযায়ী উচ্চ করা বড় কঠিন বড় দুরূহ কার্য্য, কিন্তু যিনি ব্রাহ্ম হইয়াছেন সে কার্য্য তাঁহার পরম কর্ত্তব্য। দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদ-বলে এবং আত্ম-প্রভাব-বলে ব্রাহ্মগণ সেই কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হউন।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের

ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

সপ্তদশ ব্যাখ্যান।

(আশ্বিন মাসের পত্রিকার ১২১ পৃষ্ঠার পর)

বৃক্ষ সব আশ্রয় করিয়া পক্ষীগণ।
যেমন সুখেতে করে জীবন যাপন।
সেইরূপ জীবচয়, তাঁহাতে আশ্রিত হয়,
তাঁরে অবলম্ব করি থাকে অনুক্ষণ॥

বায়ু বিনা যথা নাহি আলোক সঞ্চার।
গৃহ নাহি তিষ্ঠে বিনা স্তম্ভ-আধার।
সেইরূপ সে আশ্রয়, বিনা ছাড়া কেহ নয়,
তাঁহাতে রয়েছে এই অখিল সংসার॥

বিশেষ আশ্রিত হই আমরা তাঁহার।
অন্য জীব জড় নহে কভু সে প্রকার।
কি সম্বন্ধ তাঁর সনে, ভাব দেখি মনে মনে,
কি রূপ আশ্রয় তিনি হন সবাকার॥

তিনি পিতা—মোরা তাঁর স্নেহের সন্তান।
কত সুখ রত্ন তিনি করেন প্রদান।
যে কাতরে তাঁরে চায়, সেই তাঁরে হৃদি পায়,
তাঁহার কৃপায় পায় অমৃত-সোপান॥

তিনি মাতা স্নেহময়ী অমিয় বচনে।
ডাকিছেন কোলে তাঁর পুত্র কন্যাগণে।
যে তাঁর শরণ লয়, থাকে না তাহার ভয়,
প্রেম-অন্ন দিয়া তারে তোষেন যতনে॥

তিনি রাজা—প্রজা মোরা আশ্রিত তাঁহার।
সুমঙ্গল বিধি তিনি করিয়া প্রচার।
সবে করি সম জ্ঞান, ধরি ন্যায় তুলামান,
বিতরেন যথাযোগ্য দণ্ড পুরস্কার॥

তিনি প্রভু—ভৃত্য মোরা—রাখেন চরণে।
কহেন আদেশ তাঁর হৃদি সঙ্গোপনে।
দেন ভৃতি—সহবাস, তাঁর সুপ্রসন্ন হাস,
তাঁহার চরণ-ছায়া জীবন মরণে॥

চিরকাল রবে আত্মা হয়ে তাঁর দাস।
তাঁর পুত্র পাবে তাঁর চির সহবাস।
তিনি পিতা মাতা প্রভু, ছাড়িবে না তাঁরে কভু
তাঁহার রাজ্যেতে চির করিবেক বাস॥

কতই সম্বন্ধে আত্মা তাঁহাতে জড়িত।
কিবা প্রেম রজ্জু টানে তাঁহাতে কর্ষিত।
যে সম্বন্ধ কে জানা'ল, তাঁরে প্রেম কে শিখা'ল,
আত্মাতে তাঁহার ভাব কা' হ'তে উদিত॥

দয়াময় তাঁর দয়া আত্মারে জানান।
প্রীতি দিয়া তার ঠাঁই প্রীতি তিনি চান।
বলেন "পবিত্র হও, পাপ হতে দূরে রও,
ধর্ম্ম-বলে আপনারে কর বলীয়ান্॥

কুটিল কামনা হৃদি কর বিসর্জ্জন।
সমস্ত হৃদয় কর আমাতে অর্পণ।
আমাতে করিলে মতি, পাইবে পরম গতি,
পাবে সুনির্ম্মলা শান্তি—অভয় শরণ॥"

হায়! মোরা ভুলি সদা মোহের ছলনে।
তাঁহার আদেশ মত চলিব কেমনে।
দীন হীন ক্ষীণ হয়ে, "মর্ত্তের এ ধূলি লয়ে,"
কেমনে যাইব মোরা তাঁহার সদনে॥

যবে আত্মা নিজে দেখি ভাবে নিরুপায়।
কাতর নয়নে তবে তাঁর পানে চায়।
তাঁর পথে যাইবার, তিনি নেতা—নাহি আর,
যে পায় তাঁহারে পায় তাঁহার কৃপায়॥

যখন দেখি যে মোরা নিতান্ত দুর্ব্বল।
তিনিই ভরসা মাত্র উপায় সম্বল।
তবে প্রাণ কাঁদি কয়, "ওহে দীন দয়াময়।
লও মোর প্রাণ মন যা আছে সকল॥

অন্ধকার হতে মোরে করহ উদ্ধার।
লয়ে যাও জ্যোতির্ম্ময় পথেতে তোমার।
তব পথে যাইবার, করি যেন [illegible] যাব,
তুমি যে উপায় কর তোমা পাইবার॥

তাঁর প্রতি এই রূপ নির্ভরের ভাব।
ঘুচাবেন তিনি মোর সকল অভাব॥
মলিন হৃদয় তাঁরে করহে অর্পণ।
লইবেন তিনি তাহা করিয়া শোধন।
অন্ধ মোরা—তাঁর পথ না পাই দেখিতে।
চাহিলে দিবেন চক্ষু সে পথ চিনিতে॥
এই তাঁর উপাসনা—তাঁহাতে নির্ভর।
জীবনের উচ্চ ভোগ মজ্ঞ ইথে নর!॥
তাঁর উপাসনা হেথা কর আরম্ভন।
করিবে যে উপাসনা অনন্ত জীবন॥
ত্রিকাল ধরিয়া তাঁর উপাসনা কর।
অতীতে করুণা তাঁর মনে মনে স্মর॥
অতীতে কতই সুখে যাপিলে জীবন।
প্রদাতার হস্ত তবে করহ স্মরণ॥
অজস্র প্রসাদ তুমি ভুঞ্জিতেছ যাঁর।
কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁরে কর নমস্কার॥
বর্ত্তমানে দেখ তাঁরে পিতা বিদ্যমান।
পরম দেবতা বিশ্বে যাঁর অধিষ্ঠান॥
প্রেম ভক্তি পুষ্পে তাঁর করহ অর্চ্চনা।
তাঁর কার্য্য করি কর তাঁহার সাধনা॥
অন্তরে বাহিরে তাঁর দেখহ প্রকাশ।
প্রত্যক্ষ করিতে তাঁরে করিবে অভ্যাস॥
শুদ্ধ হও—পাবে তাঁর সহবাস চিতে।
কিবা সুখ তাঁরে লয়ে জীবন যাপিতে॥
ভবিষ্যতে তাঁরে কর একান্ত নির্ভর।
তাঁর পানে চেয়ে হও বিশোক অন্তর॥
চাও তাঁরে ধর্ম্ম বল পাপ-নিরসন।
তাঁহার প্রসন্ন মুখ হৃদয়-রঞ্জন॥
দিন দিন পূজ তাঁরে মধুর বন্দনে।
নব ভক্তি মালা দাও তাঁহার চরণে॥
নব নব দেখ তাঁর করুণা বর্ষণ।
নব নব কৃতজ্ঞতা করহ অর্পণ॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! তোমার স্তুতি কেমনে করিব!
তোমারে হৃদয়ে রাখি কেমনে পূজিব!
তোমারে পূজিতে নাথ! তুমিই শিখাও।
তোমাকে পাবার পথ তুমি বলে দাও।
কবে নাথ! কবে তব উপাসনা বলে।
তব পথে অগ্রসর হইব সকলে॥
এই ইচ্ছা তুমি নাথ! করহ পূরণ।
তোমারে সেবিয়া হোক সফল জীবন॥
সপ্তদশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

শরতে আরতি।

তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্ব্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকামং।
হিমাংশুরপাণ্ডুরকুচিঃ শশলাঞ্ছনোঽয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবনমুজ্জিহীতে। ১
স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্বাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।
বাযো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে। ২

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ধর্ম্ম পরিচয়। প্রথম ভাগ। কাগজ, সিংহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

২। The Universal Religion By R. K. Sen, Comille.

৩। The English works of Raja Rammohan Ray Vol I. Compiled and published by Eshan Chander Bose.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol LIV. Part II. No II. 1885

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal August 1885.

Theosophist—November 1885

Interpreter - November 1885,

নববজীবন আশ্বিন

প্রচার শ্রাবণ

ভারতী আশ্বিন ও কার্ত্তিক

বালক আশ্বিন ও কার্ত্তিক

ধর্ম্মপ্রচারক আশ্বিন

বামাবোধিনী পত্রিকা আশ্বিন

… খণ্ড ১১।১২ সংখ্যা।

নব্য ভারত আশ্বিন ও কার্ত্তিক

ধর্ম্মবন্ধু আশ্বিন

কৃষিগেজেট ভাদ্র

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ শনিবার সন্ধ্যা ৭ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের অষ্টবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র ও আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় … …	১০১৭।৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭৬৩।/০
সমষ্টি … …	৩৭৮০৸৩
ব্যয় … …	৮৪৮॥/০
স্থিত … …	২৯৩৩৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ … … …	৪৭৸০
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন চৌধুরী বাহাদুর কৃপভাণ্ডার	২৫
শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০
,, কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	২
,, হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১।৶০
দানাধারে দান প্রাপ্ত।	৶০
	৪৭৸০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …	২৪৮৸০
পুস্তকালয় …	৯৬৸/৩
যন্ত্রালয় ..	৩৫২।০
গচ্ছিত	৩৯৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৮৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫০
দাতব্য	১৯৩॥/৩
সমষ্টি	১০১৭।৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	১৯১৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা … …	১৩২৸৩
পুস্তকালয় … …	১১৸৶৩
যন্ত্রালয় … …	২২৯।৶৩
গচ্ছিত … …	৮৶৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫০
দাতব্য	[illegible]৩
সমষ্টি …	[illegible]/০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
পৌষ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ

৫০৯ সংখ্যা

১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

ষট্পঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

---

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৭৷০ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

অগ্রহায়ণ। রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, সকলই পৃথি-বীর—যত জীব আছে, সকলেই পৃথিবীর জীব; কেবল মনুষ্যের সম্বন্ধেই তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যই কেবল বলিতে পারে যে "আমি পৃথিবীর নহি—পৃথিবী আমার!" কোথা হইতে পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের এ রূপ স্বত্ব জন্মিল? মনুষ্য যদি কেবল পার্থিব জীব ভিন্ন আর কিছুই না হয়, তবে "পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের আধিপত্য" এ কথা অতি হাস্য-জনক; সমুদ্রের উপর তরঙ্গ-ফেনের আধিপত্য, পর্ব্বতের উপর পার্ব্বতীয় তৃণের আধিপত্য, ইহা যেমন হাস্যের কথা; পৃথিবীর উপরে পার্থিব জীবের আধিপত্যও সেই রূপ। মনুষ্য যদি সত্য-সত্যই পার্থিব জীব হয়, তবে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে কিছু-তেই শোভা পায় না, তাহা হইলে তাহার সমস্ত প্রভুত্বের দর্প এক কথায় চূর্ণ হইয়া যায়; সে কথা এই যে, "পৃথিবী হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ; তোমার চরণ পৃথিবীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে; তুমি যাহা কিছু করিতেছ, পৃথিবী তোমাকে দিয়া তাহা করাইয়া লইতেছে; পৃথিবীই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তুমি কেবল একটা উপলক্ষ

মাত্র। মেঘমালা, পৃথিবীর কঠোর কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া কিয়ৎকালের জন্য মনের উল্লাসে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, কিন্তু পরক্ষণেই জলাকারে ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীর সে বাষ্প পৃথিবীতে অবনত হইয়া পড়ে; তুমিও সেইরূপ যতই কেন আকাশে উড্ডীন হও না—যতই কেন গর্ব্ব কর না যে, তুমি আর এখন পৃথিবীকে প্রভু বলিয়া মান না—পৃথিবী তোমাকে প্রভু বলিয়া মানে,—সে তোমার সুখ-স্বপ্ন দুই দিনের জন্য! দুই দিন পরেই পৃথিবী তোমাকে আপনার উদরে টানিয়া লইয়া তোমার সে ভ্রম জন্মের মত ঘুচাইয়া দিবে।” সত্যই যদি এরূপ হয় যে, মনুষ্য পৃথিবীর জীব অথচ প্রভুত্বের বন্ধন তাহাকে এরূপ অধীর করিয়া তুলিয়াছে যে, পৃথিবীর উপরে আধিপত্য বিস্তারের বৃথা চেষ্টায় ব্যাপৃত না হইয়া সে কোন-ক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; তবে পৃথিবীর ন্যায় এমন হাস্য-রসাত্মক নাট্যশালা আর কুত্রাপি নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আদি কবির বিরচিত জগৎ এত লঘু নহে যে, তাহা কেবল হাস্য-রসেই পর্য্যবসিত হইবে;—তাঁহার রচনা নানা রসযুক্ত গভীর রচনা, তাহা শুদ্ধ কেবল হাস্য-রসের শফরী-ক্রীড়া নহে। পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের যে আধিপত্য তাহা পার্থিব জীবের হাস্যজনক আধিপত্য নহে, তাহা ঈশ্বরের পুত্রের ন্যায্য আধিপত্য। ঈশ্বর মনুষ্যের পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু,—পিতার ঐশ্বর্য্য যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সেইরূপ মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য। অতএব হে মানব! হে অমৃতের পুত্র! চতুর্দ্দিকে পিতার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া—মাতার আরোগ্য-দায়ক হস্ত দেখিয়া—উন্নত মস্তকে পৃথিবীতে বিচরণ কর! আপনার উচ্চ অধিকার বিস্মৃত হইয়া—পৃথিবীর দাসত্ব-শৃঙ্খলকে কণ্ঠের ভূষণ করিয়া—নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় অবনত মস্তকে জীবন অতিবাহন করিও না। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির মঙ্গল উৎস উৎসারিত হইতেছে—তোমার আত্মার প্রেমের উৎস উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেও! ঈশ্বর কি করিতেছেন, একবার এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখ—“এক ভানু অযুত কিরণে উজ্জলে যেমতি সকল ভুবন, তাঁহার প্রেম হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম জননী-হৃদয়ে করে বসতি।” মাতাকে শিশু কতটুকু জানে—কতটুকু বুঝে? না জানিয়াও—না বুঝিয়াও—আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল প্রেমটুকু মাতাকে অর্পণ করে। ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা কি জানি—কি বুঝি? কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম কি আমরা তাঁহাকে সমর্পণ করিতে পারি না? ইহা তো আমরা জানি যে, এই বিশাল পৃথিবী সেই মাতার ক্রোড়—সূর্য্য-কিরণ সেই পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ—প্রাতঃসমীরণ সেই আরোগ্য-দায়ক বন্ধুর মুখ-মারুত আমাদের শরীর মন হইতে রোগ-শোক বিধূত করিয়া ফেলে,—তবে কেন তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম সমর্পণ না করিব?

মণি মুক্তা হীরক সূর্য্য-কিরণের প্রত্যুত্তরে কিরণ বিতরণ করে, তাই তাহারা মূল্যবান্ সামগ্রী,—আমাদের আত্মা যদি ঈশ্বরের প্রেমের প্রত্যুত্তরে প্রেম দান করিতে পারে, তবেই তাহা মূল্যবান্ হয়; ঈশ্বরের প্রেমের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে—আমাদের হৃদয়ের উপর তাহা যদি ব্যর্থ হইয়া যায়, তবে আমাদের হৃদয় হৃদয়ই নহে; যে হৃদয় আপনার প্রেম দিয়া ঈশ্বরের প্রেম গ্রহণ করিতে পারে, সেই হৃদয়ই প্রকৃত হৃদয়। মাতা যখন শিশুর মুখের প্রতি আপনার স্নেহ-চক্ষু নিপাতিত

করেন—অজ্ঞান শিশুও তাহার দুইটি চক্ষু মাতার চক্ষুর প্রতি নিবিষ্ট করে, ইহাতে মাতার স্নেহ-পূর্ণ চক্ষু শিশুর চক্ষুতে জন্মের মত মুদ্রিত হইয়া যায়,—সেই চক্ষুর গুণে মাতা যে কি বস্তু, শিশু তাহা চিরকালের মত বুঝিয়া লয়; ঈশ্বরের প্রেম-চক্ষুর প্রতি যে ব্যক্তি আত্মার চক্ষু ফিরাইয়াছেন, তাঁহারই অন্তশ্চক্ষুতে ঈশ্বরের প্রেম-চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে—ঈশ্বর যে কি বস্তু, তাহা তিনিই বুঝিয়াছেন,—তর্ক দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরকে বুঝিতে গিয়াছেন, তাঁহারা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পৃথিবী যেমন জ্ঞান-শিক্ষার স্থান, তেমনি প্রেম-শিক্ষার স্থান। মাতা পিতার অকৃত্রিম স্নেহে, পতি পত্নীর অকৃত্রিম প্রেমে, বন্ধুর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে যদি আমরা ঈশ্বরের প্রেম দেখিতে না পাই, তবে আমাদের প্রেম-শিক্ষা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত একটি ক্ষুদ্র ফলের ভূ-পতন দেখিয়া সমস্ত ভৌতিক জগতের মূলে আকর্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমরা যদি মাতৃ-স্নেহ দেখিয়া, দম্পতি-প্রেম দেখিয়া, সমস্ত জগতের মূলে স্নেহ-প্রেমের আকর দেখিতে পাই, তবে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু কত না প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে! সেই প্রেমের মধুর হিল্লোলে আমাদের হৃদয়ের উৎস খুলিয়া গেলে আমরা কি পর্য্যন্ত না কৃতকৃতার্থ হই? ঈশ্বরের প্রেমরস-পানে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি সেই হৃদয়ের ভাণ্ডার সমস্ত জগতে খুলিয়া দিতে পারেন; তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী, তিনিই সাধু, তিনিই মনুষ্যের চরম আদর্শ।

যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের কলিকা কাল-ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠিবে, তখন পুণ্যাত্মারা ব্রাহ্মমণ্ডলীর শিরোভূষণ হইবেন,—তখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য পৃথিবীময় প্রচারিত হইবে।

হে পরমাত্মন্। তুমি পরিপূর্ণ মঙ্গল—আমরা তোমার আশীর্ব্বাদের প্রার্থী। তোমার এক বিন্দু কৃপা আমাদের প্রতি জনের হৃদয়ের সম্বল—আমাদের জন্মভূমি ভারত-ভূমির সম্বল; এই দুঃখ শোকের মধ্যে তুমি আমাদিগকে অভয়-দান করিলে তবে আমরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পথে অটল থাকিতে পারি, তোমার প্রেম-মুখের উৎসাহ-বাণী শুনিলে আমরা সকল বিপদ্ তুচ্ছ করিতে পারি; তুমি আমাদের সঙ্গের সঙ্গী হও, বিপদের কাণ্ডারী হও, আত্মার প্রতিষ্ঠা হও, মোহান্ধকার যেন আমাদের চক্ষু হইতে তোমাকে আবৃত করিয়া না রাখে—এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব।

ইউরোপীয় দার্শনিক জগতে হিউম্ কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের সমুদ্র-মন্থন সুরু করিয়াছিলেন, আজিও তাহা প্রবল বেগে চলিতেছে; তাহা হইতে গরল উঠিতেছে, অমৃত উঠিতেছে; যাঁহারা অমৃতের আস্বাদ জানেন তাঁহারা অমৃত বাছিয়া লইতে পারেন; কিন্তু যিনি সে রসে বঞ্চিত তাঁহাকে বলি যে, তিনি একটু সাবধানে সে দিকে পা বাড়াইবেন—এক জন জানা-শুনা পথ-প্রদর্শককে সহায় করিয়া অমৃতের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন, নচেৎ গোড়াতেই ভ্রান্ত হইবেন,—অমৃতের হ্রদ মনে করিয়া তিনি কি শেষে বিষের হ্রদে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে যাইবেন—তাঁহার পরম শত্রুও তাঁহাকে এরূপ পরামর্শ দিবে না। যদি কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের সাগর-মন্থন দেখিতে নিতান্তই তাঁহার ইচ্ছা

হইয়া থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে আসুন; কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাকে আমরা বলিতেছি যে, মন্থনের কোলাহলে তাঁহার মস্তক বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে; তাঁহার গাত্রে কখনো বা বিষের ছিটা—কখনো বা অমৃতের ছিটা—লাগিবে; তাহার মধ্যে এই এক সুবিধা আছে যে, যে দিক্ দিয়া অমৃতের ছিটা আসিতেছে, সেই দিক্ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলে আর কোন ভয় নাই—আনন্দ মঙ্গলোনাস্তি। তবে আর বিলম্ব কি—আসুন যাওয়া যাউক।

পরিভাষা।

অগ্রপশ্চাৎ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ভাল হয়;—কাহাকে বলে আবির্ভাব—কাহাকে বলে ভাব—কাহাকে বলে তত্ত্ব—কাহাকে বলে মূল-তত্ত্ব—এই চারিটি বিষয় পূর্ব্বাহ্নে জানিয়া রাখিলে ভাল হয়।

সূর্য্যকে প্রথমে আমরা চক্ষে দেখি, তাহার পরে মনে ভাবি; যাহা চক্ষে দেখি তাহা সূর্য্যের আবির্ভাব—যাহা মনে ভাবি তাহা সূর্য্যের ভাব। ক্ষুধার বিষয় যখন আমরা মনে ভাবি, তখন সেই মন-গড়া ক্ষুধাকে আমরা বলি—"ক্ষুধার ভাব"; আবার, সেই ক্ষুধা যখন উদরাভ্যন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠে তখন আর তাহাকে "ভাব" বলা শোভায় না—তখন বলি "ক্ষুধার আবির্ভাব"। আমাদের বুদ্ধি যখন সম্মুখ-স্থিত বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া আছে, তখনকার সেই জীবন্ত বুদ্ধি আমাদের মনোমধ্যে টাট্‌কা টাট্‌কা যেরূপ প্রতীয়মান হয়—তাহাই বুদ্ধির আবির্ভাব; কিন্তু তাহার পরে যখন সেই বুদ্ধি-ব্যাপার-টি আমাদের স্মরণে উদ্বোধিত হয়, তখন দেখিতে পাই তাহা বাসী হইয়া গিয়াছে—তাই তখন আর তাহাকে "বুদ্ধির আবির্ভাব" বলি না, তখন বলি—"বুদ্ধির ভাব।" আবির্ভাব যে কেবল বহির্বস্তুরই হয়—এমন নহে, আধ্যাত্মিক বস্তুরও আবির্ভাব হয়; বহিরিন্দ্রিয় সমক্ষে বহির্বস্তুর আবির্ভাব হয়, অন্তরিন্দ্রিয় সমক্ষে আধ্যাত্মিক বস্তুর আবির্ভাব হয়। কিন্তু বহির্বস্তুর ভাব এবং আবির্ভাবের মধ্যে যেমন একটি সুস্পষ্ট সীমাচিহ্ন অঙ্কিত হইতে পারে, আধ্যাত্মিক বস্তুর ভাব এবং আবির্ভাবের মধ্যে তেমনটি হওয়া দুর্ঘট; সূর্য্যের আবির্ভাব আকাশে—সূর্য্যের ভাব আমাদের মনে—দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ব্যবধান; পক্ষান্তরে, বুদ্ধির আবির্ভাব এবং ভাব উভয়ই আমাদের মনোমধ্যে—এ জন্য এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান নির্দ্দেশ করা সুকঠিন,—কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা তাহাও করিয়াছেন। ফরাসীস দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত কুজান্ আবির্ভাবরূপী বুদ্ধিকে "উৎসায়মান" (spontaneous) এবং ভাব-রূপী বুদ্ধিকে "প্রাতিভ" (reflective) উপাধি প্রদান করিয়াছেন, এবং উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যে কত প্রকার, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন; এ বিষয়টি এখন এই পর্য্যন্ত থাক্—যথাস্থানে পরে আসিবে। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহিরিন্দ্রিয়-সমক্ষে বা অন্তরিন্দ্রিয়-সমক্ষে উপস্থিত হয়, তাহাকেই বলি "আবির্ভাব"; আর, যাহা সাক্ষাৎ আবির্ভাব নহে—অথচ সেই আবির্ভাবের অনুপস্থিতি-কালে তাহার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গৃহীত হয়, এক কথায়—যাহা আবির্ভাবের প্রতিনিধি, তাহাকেই বলি "ভাব"। সূর্য্যের ভাব কিছু-আর সাক্ষাৎ সূর্য্য নহে—তাহা সূর্য্যের প্রতিনিধি মাত্র। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হামিল্টন আবির্ভাব-রূপী জ্ঞানকে "সাক্ষাৎ-সিদ্ধ" (presentative) এবং ভাব-রূপী জ্ঞানকে "প্রতিনিধি-সিদ্ধ" (representative) এইরূপ উপাধি প্রদান করিয়াছেন;

আমরাও বলি যে, ব্যাঙ্কনোট্ যেমন নগদ্ টাকার প্রতিনিধি, ভাব সেইরূপ আবির্ভাবের প্রতিনিধি। এই গেল ভাব এবং আবির্ভাব,—এখন তত্ত্ব এবং মূলতত্ত্ব এই দুই শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই পাথেয়-সম্বলের জন্য আর আমাদের কোন ভাবনা থাকে না।

শুধু একটি ভাবে কিম্বা শুধু একটি আবির্ভাবে তত্ত্ব হয় না;—তত্ত্ব-একটি দাঁড় করাইতে হইলে, দুই ভাবের মধ্যে—অথবা আবির্ভাব এবং ভাবের মধ্যে—বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ অবধারণ করা চাই; "হস্তী" একটি ভাব, "চতুষ্পদ" আর একটি ভাব; এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, হস্তী চতুষ্পদ-শব্দের বাচ্য ও চতুষ্পদ হস্তী-শব্দের বাচক;—উভয়ের মধ্যে এইরূপ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ থাকাতেই আমরা "হস্তী চতুষ্পদ" এই বাক্যটিকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করি। শুধু যদি বলি "সূর্য্য", তবে তাহা তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না,—কিন্তু যদি সূর্য্যের ভাবের সঙ্গে উদয়াস্তের ভাব যোগ করিয়া দিই, তবে সেই দুই ভাবের যোগে এই একটি তত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে যে, সূর্য্য উদয়াস্তবান্। "সূর্য্য উদয়াস্তবান্" ইহা যেমন একটি তত্ত্ব, পরিবর্ত্তন হেতুমান্ (অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ আছে) ইহাও সেইরূপ একটি তত্ত্ব। সূর্য্যের ভাব এবং উদয়াস্তের ভাব এই দুই ভাবের যোগ-দৃষ্টে এই তত্ত্বটি পাওয়া যাইতেছে যে, সূর্য্য উদয়াস্তবান্; তেমনি, পরিবর্ত্তনের ভাব এবং কারণের ভাব এই দুই ভাবের যোগ-দৃষ্টে এই তত্ত্বটি পাওয়া যাইতেছে যে, পরিবর্ত্তন হেতুমান্। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, সূর্য্যের উদয়াস্তবত্তা আমাদের মনের সংস্কার মাত্র; "পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে" ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব,—পৃথিবীর পরিভ্রমণ-শীলতাই প্রকৃত তত্ত্ব। সূর্য্যের উদয়াস্ত-বত্তা যে, কতকালের পুরাতন তত্ত্ব, তাহা বলা যায় না—তাহারও দেখ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে,—কিন্তু "পরিবর্ত্তন-মাত্রই হেতুমান্ বা সহেতুক," এ তত্ত্বটির বিপর্য্যয় ভাবনাতেও স্থান পাইতে পারে না; "সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে দেখা দিতেছে অথচ তাহা স্থির আছে" এরূপ ভাবনাকে মনে স্থান দেওয়া কিছুই কঠিন নহে; কিন্তু "পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে অথচ তাহার কোন কারণ নাই" এরূপ ভাবনা মনের এক কোণেও স্থান পাইতে পারে না; পরিবর্ত্তনের ভাবের সঙ্গে হেতুমত্তার ভাব এরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে যে, সে বন্ধন-সূত্রের ছেদন ভাবনাতেও স্থান পাইতে পারে না। এইরূপ, যে-কোন তত্ত্বের অন্যথা আমাদের ভাবনাতেও স্থান পাইতে পারে না, তাহাকেই আমরা মূলতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। "দুই স্থানের মধ্যে সরল-রেখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম পথ" ইহাও একটি মূলতত্ত্ব—কেননা ইহার অন্যথা ভাবনারও অগোচর। কোন বস্তুরই মূল-উপাদান বিলুপ্ত হইতে পারে না—ইহাও একটি মূলতত্ত্ব; মূলতত্ত্ব এখন এই পর্য্যন্ত থা'ক্—পথে যতই অগ্রসর হইব ততই তাহার অর্থ বোধ-সুলভ হইবে,—অতএব আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন নাই—প্রয়াণে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

লকের সিদ্ধান্ত।

প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় দার্শনিক লক্ বলিয়াছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-পটে বহির্জগতের যে-সকল ছাপ পড়ে, তাহাই আমাদের মনের ভাব-রূপে পরিণত হয়; এবং সেই বহির্মূলক ভাব-সমূহের যোগাযোগ হইতেই বুদ্ধির তত্ত্ব-সকল উৎপন্ন হয়। আমাদের মনো-মধ্যে যে-কোন ভাব বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়—ইন্দ্রিয়ই তাহার একমাত্র প্র-

বেশ-দ্বার ; এমন ভাবই নাই—এমন তত্ত্বই নাই—যাহা ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রবেশ লাভ না করিয়া মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে বা হইতে পারে।

হিউমের সিদ্ধান্ত।

হিউম্ সাহেব ঐ প্রথাটি শিরোধার্য্য করিয়া—কারণ কার্য্য প্রভৃতি মনস্তত্ত্ব গুলি ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া কিরূপে আমাদের মনে প্রবেশ পাইতে পারে তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বীজ হইতে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন—অগ্রে বীজের বপন পরে অঙ্কুরের উত্থান—ইহাই কেবল আমরা চক্ষে দেখি, কিন্তু বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের কি-যে বাধ্য-বাধকতা সে-টি আমরা আদবেই দেখিতে পাই না—অথচ সেইটিকেই কারণের কারণত্ব কয়। অগ্রে যদি কোন-একটি স্থানে বীজ বপন করা যায়, এবং পরে আর-এক স্থান হইতে অঙ্কুর আনিয়া সেই স্থানে রোপণ করা যায়, তাহা হইলেও তো বীজ-বপনের পরে অঙ্কুরের উত্থান নয়ন-গোচর হয়,—তবে কেন আমরা বলি না যে, এবারেও বীজ অঙ্কুরোদ্গমের কারণ? অতএব শুধু যে, পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেই কারণ হয় এবং পরবর্ত্তী হইলেই কার্য্য হয়, তাহা নহে,—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার মধ্যে যদি এমন একটা কিছু থাকে—যাহার গুণে পরবর্ত্তী ঘটনা উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়—তবেই আমরা ঐ দুই ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ উপলব্ধি করি; কিন্তু সেই যে, "একটা-কিছু" যাহার গুণে কার্য্য উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়, তাহা কি? তাহাকে কেহ চক্ষে দেখিয়াছে? কর্ণে শুনিয়াছে? জিহ্বায় আস্বাদন করিয়াছে? তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, সে-ভাবটি আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া মনে প্রবেশ করিয়াছে! দিনের পর রাত্রি হয় বলিয়া দিনকে কিছু-আর রাত্রির কারণ বলা যাইতে পারে না—বীজের পরে বৃক্ষ হয় বলিয়াই কিছু আর আমরা বীজকে বৃক্ষের কারণ বলি না;—"বীজের মধ্যে এমন একটা-কিছু আছে যাহাতে করিয়া বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়" এই ভাবিয়াই আমরা বীজকে বৃক্ষের কারণ বলি; কিন্তু সেই যে "একটা কিছু" তাহা একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর,—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, কারণের ভাব ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আমাদের মনো-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে? পক্ষিরাজ ঘোড়া কেহই চক্ষে দেখে নাই—কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আমাদের মনে প্রবেশ করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারা কিছুই কঠিন নহে; সকলেই ঘোড়া দেখিয়াছে—সকলেই পক্ষীর পক্ষ দেখিয়াছে,—এই দুই চক্ষে-দেখা বস্তু একত্র সন্নিবেশিত হইলেই পক্ষিরাজ ঘোড়া হইয়া দাঁড়ায়; অতএব পক্ষিরাজ ঘোড়া ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আমাদের মনে প্রবেশ করিয়াছে ইহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু কার্য্য-কারণের অদৃশ্য বন্ধন-সূত্র—যাহার গুণে কার্য্য উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়—তাহা মূলেই ইন্দ্রিয়-গম্য নহে,—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, তাহা ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে? তবে যদি বল যে, কার্য্য-কারণের বন্ধন-সূত্র বাস্তবিক কিছুই নহে—তাহা আমাদের মনের সংস্কার মাত্র, তাহাও বলিতে পার না; অগ্রে যাহা ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভূয়োভূয় দর্শন বা শ্রবণ করা যায়, তাহারই সংস্কার কাল-ক্রমে মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়; পরন্তু কখনও যাহা দেখা যায় নাই—শুনা যায় নাই, এবং কস্মিন্ কালে দেখা যাইবে বা শুনা যাইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই—তাহার আবার সংস্কার কিরূপ? আরবদেশীয় বর্ণমালা, যে ব্যক্তি, চক্ষেও দেখে নাই—কর্ণেও শুনে নাই—তাহার মনে কি কখনও এরূপ

সংস্কার জন্মিতে পারে যে, ক-অক্ষরের পর খ-অক্ষর, অথবা ক-বর্গের পর চ-বর্গ? যদি বল যে, কার্য্য-কারণের সংস্কারও আমাদের নাই—কার্য্য-কারণ কেবল একটা অমূলক কথা-মাত্র; তবে নিশ্চিত জানিও যে, কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব মুখের কথা নহে যে, তাহাকে এক কথায় উড়াইয়া দিবে, বরং হিমালয় পর্ব্বতকে ফুঁয়ে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু ইন্দ্রের বজ্রও কার্য্য-কারণ-তত্ত্বকে এক-তিল টলাইতে পারে না,—পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে—কারণ "আছে" শুধু নয় কিন্তু কারণ "থাকিতেই চায়" এই যে একটা প্রকাণ্ড জোরের কথা, কাহারো সাধ্য নাই যে, এ কথার এক চুল এদিক ওদিক করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আমরা যে-কোন বৃত্তান্ত অবগত হই, তাহার সম্বন্ধে আমরা কেবল এই পর্য্যন্তই বলিতে পারি যে, "এইরূপ হইয়া আসিতেছে" বা "এইরূপ হইয়া থাকে," যেমন—"প্রত্যহ সূর্য্য উঠিয়া থাকে;" তদ্ভিন্ন এমন বলিতে পারি না যে "এইরূপ হইবেই হইবে"—"প্রত্যহ সূর্য্য উঠিবেই উঠিবে।" যদি কেহ বলেন যে, "সূর্য্য প্রত্যহ উদিত হইতেই চায়, কোন দেশেই—কোন কালেই—এতত্ত্বটির তিলমাত্রও ব্যভিচার সম্ভবে না," তবে এটি তাঁহার মনের সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে; মেরুর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ছয় মাস সূর্য্য উদিত হয় না—ইহা দেখা কথা। লাপ্‌লাণ্ডে প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হয় কি না—ইহার স্থির তথ্য জানিতে হইলে লাপ্‌লাণ্ড দেশে যাওয়া আবশ্যক হয়; কিন্তু মনুষ্যের অগম্য সূর্য্যের গাত্রে সময়ে সময়ে যে কালো দাগ ফুটিয়া বাহির হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ আছে কি না ইহা জানিবার জন্য সূর্য্য-লোকে যাইবার কিছু-মাত্র প্রয়োজন নাই,—আমরা ঘরে গৌঁঠা হেলান দিয়া বসিয়া নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি যে তাহার কারণ আছেই আছে। আমরা প্রত্যহ সূর্য্যোদয় দেখিতেছি এবং পুরুষানুক্রমে দেখিয়া আসিতেছি, তথাপি আমরা বলিতে সাহস করি না যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐরূপ নিয়ম; কিন্তু কার্য্য-কারণের বেলায় আমরা অকুতোভয়ে বলি যে, "পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে" ইহা নিখিল জগতের সর্ব্বস্থানেই বলবৎ;—ইহাকেই তো বলে "এক যাত্রায় পৃথক্ ফল।" হয় বলো যে, প্রাত্যহিক সূর্য্যোদয় তত্ত্ব যেমন ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আসিয়াছে, কার্য্যকারণ-তত্ত্ব সেরূপ করিয়া আসে নাই; নয় বলো যে, সূর্য্যের প্রাত্যহিক উদয়-বার্ত্তা যেমন কোথাও বা খাটে কোথাও বা খাটে না, পরিবর্ত্তনের হেতুমত্তাও তেমনি কোথাও বা খাটে—কোথাও বা খাটে না; মেরু-প্রদেশে তাহা খাটে কি না—তাহা মেরুবাসীরাই বলিতে পারে! ইহার কোন্‌টা ঠিক্ হিউম্ তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া সংশয়-বাদ অবলম্বন করিলেন; তিনি ভাবিলেন "ইহাই বা কেমন করিয়া বলি যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে—এত বড় একটা বিশ্বব্যাপী কথা অল্প-ব্যাপী পরীক্ষার ক্ষুদ্র নীড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; আর, ইহাই বা কেমন করিয়া বলি যে, কার্য্য-কারণ তত্ত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই—অথচ প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবেই হইবে।"

কাণ্টের সিদ্ধান্ত।

হিউমের সংশয়-বাদের বিরুদ্ধে কাণ্ট যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাহা এই;—

কাণ্ট বলেন লকের সিদ্ধান্তের গোড়াতেই ভুল। আমাদের মনোনিহিত সকল ভাবই যে, ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আসিয়াছে, তাহা সত্য নহে। ইন্দ্রিয়-পটে বহির্বস্তুর যে সকল ছাপ উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞানের উপকরণ-মাত্র—তাহা স্বয়ং জ্ঞান নহে;—ইট কাট প্রভৃতি

গৃহের উপকরণ-মাত্রকে যেমন গৃহ বলা সঙ্গত নহে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-গত ছাপ সকলকে জ্ঞান বলা সঙ্গত নহে। নির্ম্মাতা যখন আপনার গঠন প্রণালী অনুসারে ইট-কাট-গুলিকে যথাবিধি সন্নিবেশিত করে তখনই গৃহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জ্ঞাতা যখন ইন্দ্রিয়ের ছাপ-গুলিকে নিজের ছাঁচে ফেলিয়া গড়িয়া লয় তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। লক্ বলিয়াছিলেন জ্ঞানের সমস্তই বাহির হইতে আইসে, কাণ্ট বলিতেছেন জ্ঞানের উপকরণই কেবল বাহির হইতে আইসে, জ্ঞানের প্রকরণ জ্ঞাতা আপনার ভিতর হইতে উদ্ভাবন করে; ভিতরকার এই প্রকরণ এবং বাহিরের ঐ উপকরণ—দুয়ের সংযোগে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়-সমক্ষে কোন একটি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে জ্ঞানের একটি উপকরণ উপস্থিত হয়—হইবামাত্র জ্ঞানের ভিতর হইতে এই একটি প্রত্যয় উদ্বোধিত হয় যে, সেই পরিবর্ত্তনের কারণ আছেই আছে,—এই যে প্রত্যয় ইহা জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রকরণ। জ্ঞানের উপকরণ ইন্দ্রিয়-দ্বারে নিয়তই আসা যাওয়া করিতেছে,—কখনও এক উপকরণ আসিতেছে, কখনো আর-এক উপকরণ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে; কখনও বায়ু শীতল হইতেছে, কখনও উষ্ণ হইতেছে, কখনও দ্রুত-বেগে বহিতেছে, কখনও মৃদু-মৃদু বহিতেছে; জ্ঞানের এই-যে-সব উপকরণ ইহারা আগন্তুক-মাত্র, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কোনটির আসিবারও বারণ নাই—যাইবারও বারণ নাই, তাহাকে আসিতেই হইবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই; উষ্ণ বায়ু বহিলেও বহিতে পারে—না বহিলেও না বহিতে পারে, মৃদু বায়ু বহিলেও বহিতে পারে—না বহিলেও না বহিতে পারে; কিন্তু শীত বায়ু বহিলেও তাহার কারণ থাকা চাই—উষ্ণ বায়ু বহিলেও তাহার কারণ থাকা চাই, মৃদু বায়ু বহিলেও তাহার কারণ থাকা চাই, দ্রুত বায়ু বহিলেও তাহার কারণ থাকা চাই; এই যে, কারণের অবশ্যম্ভাবিতা, ইহা আগন্তুক উপকরণ মাত্র নহে; উষ্ণ বায়ুর পরিবর্ত্তে অনুষ্ণ বায়ু বহিতে পারে কিন্তু সহেতুক ঘটনার পরিবর্ত্তে অহেতুক ঘটনা ঘটিতে পারে না; ঘটনা-দর্শন জ্ঞানের আগন্তুক উপকরণ কিন্তু কারণের অবশ্যম্ভাবিতা-বোধ জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ প্রকরণ। কাণ্ট এইরূপ যুক্তি অনুসারে হিউমের উত্থাপিত তর্কের মীমাংসা এই করিলেন যে, কার্য্যকারণ-তত্ত্ব বাহির হইতে কুড়াইয়া পাওয়া মনের সংস্কার মাত্র নহে—তাহা জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রকরণ। কিন্তু অবশেষে কাণ্ট আপনার ফাঁদে আপনি জড়াইয়া পড়িলেন; কাণ্ট বলিলেন, জ্ঞানের প্রকরণ—জ্ঞানেরই প্রকরণ,—জ্ঞানের বাহিরে যে, তাহার কোন বাস্তবিকতা আছে তাহার প্রমাণাভাব! কাণ্টের এ-কি বিষম বিপত্তি—হিউমকে সংশয়-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া আপনি সংশয়ের অতলস্পর্শ পাতাল-গহ্বরে নিমগ্ন হইলেন! হিউমের অর্দ্ধ-গ্রাসী সংশয় কাণ্টের হস্তে পড়িয়া ভয়ানক সর্ব্ব-গ্রাসী হইয়া দাঁড়াইল,—কম্‌টের মূল-বৈমুখ্য, স্পেন্‌সরের অজ্ঞেয়তা এবং হ্যামিল্‌টনের জ্ঞান-দৌর্ব্বল্য, উহারই সন্তান-সন্ততি। ফরাসীস্ দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত কুজান্ এই ভীষণ-মূর্ত্তি সংশয়ের বিরুদ্ধে জ্ঞানের শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন।

কুজানের সিদ্ধান্ত।

কাণ্টের প্রত্যুত্তরে কুজান্ এইরূপ বলেন যে, নীচের আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উপর আদালতে আপীল চলে, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচারের উপরে কোথাও আর আপীল চলিতে পারে না;

বিজ্ঞানের যাহা-কিছু পাকা সিদ্ধান্ত তাহার প্রামাণিকতা জ্ঞানের মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু মূলতত্ত্বের প্রামাণিকতা আর-কাহারো উপর নির্ভর করে না—তাহা আপনি আপনার প্রমাণ, এক কথায়—তাহা স্বতঃসিদ্ধ। রসায়ণ-বিৎ পণ্ডিতেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, নয় ভাগ জলের আট ভাগ অক্সিজেন এবং এক ভাগ হাইড্রোজেন, এবং ইহার প্রমাণ তাঁহারা এই দেখান যে, নয় সের জলের মধ্য হইতে ঐ দুই মূল বাষ্প উদ্ধৃত করিয়া উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ তৌল করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অক্সিজেন্ আট সের—হাইড্রোজেন এক সের—সাকল্যে নয় সের; নয় সের জলের ঐ দুই বাষ্পাংশ মিলিয়া যখন ঠিক নয় সের দাঁড়াইতেছে, তাহার কমও নয়—বেশীও নয়, তখন সেই দুই বাষ্প ভিন্ন জলের তৃতীয় কোন মূল উপাদান নাই ইহা একেবারেই অকাট্য। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি এত প্রামাণিক হইল কিসে? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, "কোন অবস্থাতেই কোন বস্তুর কোন উপাদানের বিলোপ বা আকস্মিক উৎপত্তি হইতে পারে না" এই মূলতত্ত্ব-টির নিশ্চয়তার উপরেই ঐ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রামাণিকতা নির্ভর করিতেছে, কিন্তু এই মূলতত্ত্বটির প্রামাণিকতা অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই মূল তত্ত্বটি এমনি বলবৎ প্রমাণ যে, পূর্ব্ব-কালীন রসায়ণ-বিৎ পণ্ডিতেরা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন্ যথা-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়াও নূতন জল উৎপাদন করিতে নিতান্তই পরাভব মানিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা এক নিমিষের জন্যও এরূপ সংশয়কে মনে স্থান দেন নাই যে, হয় তো বা ঐ দুই বাষ্প ভিন্ন জলের তৃতীয় কোন একটি মূল উপাদান আছে—সেইটির অভাবে বোধ হয় জল উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না। অতঃপর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ভাবিলেন যে, জলোৎপত্তির কোন-না-কোন কারণ আছেই আছে এবং সেই কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, ঐ দুই বাষ্পকে যথা-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জল উৎপন্ন হয়; ইহাতে এইরূপ প্রমাণ হইল যে, পূর্ব্বে তাড়িত সঞ্চার না হওয়াতেই জল উৎপন্ন হইতে পারে নাই; এখন যে, জল উৎপন্ন হইতেছে, তাড়িত-সঞ্চারই তাহার কারণ; দ্রব্য পূর্ব্বে যাহা ছিল (কি না অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন) এখনো তাহাই আছে—দ্রব্যের এক তিলও ন্যূনাধিক্য হয় নাই—অথচ চকিতের মধ্যে তাহাদের পূর্ব্বতন বাষ্পীয় অবস্থা জলীয় অবস্থায় পরিণত হইল,—এই প্রকার অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কারণ অবশ্যই আছে, তাড়িত-সঞ্চার ব্যতিরেকে ওরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় না—অতএব তাড়িত সঞ্চারই উহার কারণ। এই সিদ্ধান্তটির প্রামাণিকতা এই মূলতত্ত্বটির উপর নির্ভর করিতেছে যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাই; কিন্তু এ মূলতত্ত্বটির প্রামাণিকতা আর কিছুরই উপর নির্ভর করে না, উহা আপনি আপনার প্রমাণ। কুজান্ দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞানের এই-যে-সকল মূলতত্ত্ব, ইহারা যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের চরম প্রমাণ-স্থল—ইহাদের কথার উপরে আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। কাণ্টের বিরুদ্ধে কুজান্ যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এই;—

আমাদের বুদ্ধি দুই প্রকার (১) আবির্ভাবরূপী জাগ্রত বুদ্ধি, এবং (২) ভাব-রূপী বুদ্ধি—যাহা ঐ জাগ্রত বুদ্ধির প্রতিবিম্ব-স্বরূপ; আমাদের বুদ্ধি যখন স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া

আছে, তখনকার সেই জাগ্রত বুদ্ধি মনো-মধ্যে টাট্‌কা টাট্‌কা যেরূপ প্রতীয়মান হয়—তাহাই আবির্ভাবরূপী বুদ্ধি, কুজান্ ইহার নাম দিয়াছেন "উৎসায়মান বুদ্ধি" (Spontaneous Reason); আবার সেই বুদ্ধির কার্য্য যখন স্থগিত হইয়া গিয়া তাহার ভাব-টুকু কেবল মনোমধ্যে আন্দোলিত হয়, তখনকার সেই ভাব-রূপী প্রতিবিম্ব-বুদ্ধিকে কুজান্ "প্রাতিভ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কান্ট বুদ্ধির ভাবকে আর আর ভাব হইতে বিশ্লেষিত করিয়া, সেই ভাবটির অঙ্গ-বিভাজন-দ্বারা কতকগুলি মূলভাব আবিষ্কার করিয়াছেন, কার্য্য-কারণের ভাব তাহার মধ্যে একটি। কুজান্ বলেন যে, কান্ট বুদ্ধির জাগ্রত আবির্ভাবকে ছাড়িয়া বুদ্ধির শুষ্ক ভাব মাত্রকেই আলোচনা-ক্ষেত্রে আমল দিয়াছেন, এই জন্য সেই ভাবের মূলে যে বাস্তবিক সত্য আছে—জাগ্রত জীবন্ত সত্য আছে—ইহা তিনি দেখিতে পা'ন নাই; স্বতঃসিদ্ধ মূল-জ্ঞানের মৃত-শরীরকে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া কাটিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের ভিতরে জীবনের কোন চিহ্ন নাই. সে জ্ঞান আমাদিগকে বাস্তবিক সত্যে পৌঁছিয়া দিতে পারে না। কুজান্ বলেন, স্বতঃসিদ্ধ মূল-জ্ঞানের শুষ্ক ভাব ছাড়িয়া দিয়া তাহার জাগ্রত আবির্ভাবের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার বাস্তবিকতা বিষয়ে তিল-মাত্রও সংশয়, কাহারো মনে স্থান পাইতে পারে না;—আমাদের বুদ্ধি যখন স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তখন একবারও এরূপ সংশয় আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে না যে, "কপাট নড়িল—ইহার কারণ আছে বটে, কিন্তু সে কারণ কি বাস্তবিকই আছে—না তাহা শুধু কেবল জ্ঞানের একটা বিশ্বাস-মাত্র?" কুজান বলেন এরূপ সংশয়ের কোন অর্থ নাই। সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, স্বতঃসিদ্ধ মূলতত্ত্ব প্রবঞ্চনা জানে না; মূলতত্ত্ব আমাদিগকে সত্যেরই পথ প্রদর্শন করে—মিথ্যার পথ প্রদর্শন করে না। কুজানের সার সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ প্রদেশে জ্ঞান এবং সত্যের মধ্যে বিবাদ থাকিতে পারে না,—সেখানে জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস এবং বাস্তবিক সত্যে বিশ্বাস এ দুয়েরমধ্যে তিল মাত্রও প্রভেদ স্থান পাইতে পারে না। "পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে" ইহা যখন জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ মূলতত্ত্ব তখন উহা বাস্তবিকই সত্য ইহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না। কুজানের এই সিদ্ধান্ত-টি তাঁহার গ্রন্থের শতাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত নিম্ন-লিখিত একটি-মাত্র শ্লোকে তাহার সমুদায় মর্ম্ম খুলিয়া গিয়াছে;

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহা সুধিয়ঃ॥"

সকল প্রমাণের প্রামাণিকতা সাধন করে যে জ্ঞান (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ মূল জ্ঞান) তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন, সেই সকল মহা পণ্ডিতেরা কি করেন? না কাষ্ঠকে দহন করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে যা'ন!

ইহার উপরে আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না।

স্পেন্‌সরের সিদ্ধান্ত।

স্পেন্‌সর বিজ্ঞানের গভীর সমুদ্র-গর্ভ হইতে বহুতর কায়-ক্লেশে যে-একটি সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা দেখিলে আমাদের দেশের এই প্রবাদ-টি মনে পড়ে—"বজ্রের বাঁধুনি ফস্কা গিরে।" তাঁহার সিদ্ধান্ত-অনুসারে দাঁড়ায় যে, কার্য্যকারণ-তত্ত্ব মনুষ্যের ব্যক্তি-গত সংস্কার; তিনি স্পষ্ট বলেন যে, তাহা স্বতঃ—তাহা কার্য্য-

পরম্পরা-গত পৈতৃক সংস্কার; কীটাণু-হইতে বানর-জাতি পর্য্যন্ত—বানর-জাতি হইতে মনুষ্য-পর্য্যন্ত সেই সংস্কার প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। স্পেন্‌সরের এ কথাটিকে যদি বাস্তবিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা হয় না; তাহা হইলে এইমাত্র প্রতিপন্ন হয় যে, কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্ব অল্প কালের সংস্কার নহে কিন্তু দীর্ঘ কালের সংস্কার। কার্য্য-কারণের অকাট্য বন্ধন-সূত্র যদি যুগ-যুগান্তর-প্রবাহিত পৈতৃক সংস্কারও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে এক সময়ে তাহা কাহারো না কাহারো ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়াছিল; বানর জাতি যদি সে বন্ধন-সূত্রটি প্রত্যক্ষ করিয়া না থাকে, তবে হয় তো তাহার পূর্ব্বপুরুষ কাটবিড়ালী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে,—"কোন না কোন জীব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে" ইহা না মানিলে উক্ত সংস্কারের দাঁড়াইবার একটা ভিত্তি-মূল থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে-ব্যক্তি ভারত-বর্ষীয় বর্ণমালা চক্ষেও দেখে নাই—কর্ণেও শুনে নাই—তাহার মনোমধ্যে কখনই এরূপ সংস্কার জন্মিতে পারে না যে, ক-অক্ষরের পর খ-অক্ষর। অতএব কার্য্য-কারণের অদৃশ্য বন্ধন-সূত্রকে যদি সংস্কার বলিয়া মানিতে হয়, তবে তাহার সঙ্গে ইহাও মানিতে হইবে যে, কোন এক অনির্দ্দেশ্য অতীত যুগে কোন জাতীয় জীবের তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছিল, হয় তাহা সেই জীবের চক্ষে দৃষ্ট হইত, নয় কর্ণে শ্রুত হইত, নয় জিহ্বায় আস্বাদিত হইত, ইত্যাদি; কিন্তু সেই যে অদৃশ্য বন্ধন-সূত্র—সেই যে উৎপাদিকা শক্তি—যাহা দ্বারা বাধ্য হইয়া কারণ-হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়—তাহা কোন কালেই কোন জীবেরই ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে পারে না, সুতরাং কোন জীবেরই মনোমধ্যে তাহার সংস্কার বদ্ধমূল হইতে পারে না, সুতরাং তাহা সংস্কার-রূপে এক জীব হইতে অন্য জীবে প্রবাহিত হইতে পারে না। আর-একটি কথা এই যে, মনের একটা সংস্কার অল্প কালেরই হউক্ আর দীর্ঘ কালেরই হউক্,—কোন কালেই তাহা মূলতত্ত্ব পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে না,—অর্থাৎ তাহা এমন একটি তত্ত্ব হইয়া উঠিতে পারে না যাহার উলটা-ভাবনা মনেতেও স্থান পাইতে পারে না। সত্যের জন্য আবশ্যক হইলে আমরা সুদীর্ঘ কালের সুদৃঢ় সংস্কারকেও অসংকোচে পরিত্যাগ করিয়া থাকি, কিন্তু মূল-তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে-পারা দূরে থাকুক, তাহার অন্যথা আমরা মনোমধ্যে ভাবনা করিতেও পরাভব মানি;—"পৃথিবী চ্যাপ্‌টা" ইহা মনুষ্য-জাতির কত কালের পুরাতন পৈতৃক সংস্কার, কিন্তু এক শত বা দুই শত বৎসরের বিজ্ঞানের আলোকে তাহা চকিতের মধ্যে উল্টাইয়া গিয়াছে;—অতএব, "কোন পরিবর্ত্তনই কারণ-ব্যতিরেকে ঘটিতে পারে না" ইহা যদি সেইরূপ একটা সংস্কার হয়, তবে তাহাও কোন্ দিন উল্টাইয়া যাইতে পারে! কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, তাহা একেবারেই অভ্রান্ত এবং অকাট্য সত্য—কোন-কালেই—কোন দেশেই—তাহার তিলমাত্রও ব্যতিক্রম সম্ভবে না। এইরূপ অখণ্ডনীয় ধ্রুব তত্ত্ব-সকল নির্ব্বাচন করিবার অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে; তদ্ভিন্ন কোন নিকৃষ্ট জন্তু কোন তত্ত্বকেই মূলতত্ত্ব বলিয়া—অকাট্য সত্য বলিয়া—জানে না; তবে তাহাদের নিকট হইতে মনুষ্য কেমন করিয়া মূলতত্ত্ব ধার করিয়া পাইবে? পিতা যদি নিজে নির্ধন হ'ন, তবে পুত্রের পৈতৃক ধন কোথা হইতে আসিবে? স্পেন্‌সর ইহার বিরুদ্ধে এইরূপ বলিতে পারেন যে, পৈতৃক

ধন পুত্রের হস্তে যথা-প্রাপ্ত তথা-স্থিত হইয়া বসিয়া থাকিবে এমন কোন কথা নাই; পিতার নিকট হইতে একগুণ ধন পাইয়া পুত্র তাহাকে দশ গুণ বর্দ্ধিত করিতে পারে। মনুষ্য পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জীবদিগের নিকট হইতে যে সকল সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই তাহার পৈতৃক ধন—কিন্তু তাহা মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া—রীতিমত পরিশুদ্ধ এবং পরিমার্জ্জিত হইয়া—মূল-তত্ত্বের আকার ধারণ করিয়াছে। স্পেন্সরের একথার গোড়ায় একটি মহৎ দোষ লুক্কায়িত আছে—তাহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি।

মনে কর স্পেন্সর আমাদের হাত ধরিয়া জগৎ-নাট্য-শালার সাজ-ঘরে লইয়া গেলেন; সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, ভারাকর্ষণ—রাসায়নিক আকর্ষণ—জীবনী শক্তি—চেতনী শক্তি—সমস্তই একই মূল-প্রকরণের অনুবর্ত্তী হইয়া উত্তরোত্তর-ক্রমে উদ্বোধিত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তখনও আমরা বলিব যে, কোন প্রকরণ দ্বারাই সসীম হইতে অসীম উদ্বোধিত হইতে পারে না;—নাক্ষত্রিক জগৎ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কা-পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া পৃথিবী যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু কোন প্রকরণ দ্বারাই অসীম পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না; একটি ক্ষুদ্র বট বীজ পঞ্চভূত ভক্ষণ করিয়া একটা প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ হইয়া উঠিতে পারে—কিন্তু কোন প্রকরণ দ্বারাই অসীম বিস্তৃত হইতে পারে না; এমনি আবার, সংস্কার-বিশেষ কাল-ক্রমে মনোমধ্যে অধিক হইতে অধিকতর বদ্ধ-মূল হইয়া এরূপ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে যে, তাহাকে ছাড়ানো দুষ্কর, কিন্তু এরূপ অসীম-প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না যে, তাহার অন্যথা ভাবনা করাও জ্ঞানের সাধ্যাতীত। "পৃথিবী স্থির" ইহা যে কত যুগ-যুগান্তরের সংস্কার তাহা বলা যায় না, তথাপি কত অল্প-দিনের মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল মনুষ্য-মণ্ডলীর মন হইতে তাহা জন্মের মত তিরোহিত হইয়া গেল। কিন্তু "পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকিতে চায়" এ তত্ত্বের প্রবলতা এমনি অসীম যে, কোটি জন্মের সংস্কারও তাহার সহিত বলে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অতএব মূলতত্ত্ব-গুলিকে যদি পরিবর্দ্ধিত সংস্কার বলিতে চাও, তবে পরিবর্দ্ধিত বলিয়াই থামিয়া থাকিতে পারিবে না—বলিতে হইবে যে, তাহা অসীম-পরিবর্দ্ধিত সংস্কার;—কিন্তু অসীম পরিবর্দ্ধন অসীম-কালকে অপেক্ষা করে—তাহার এ দিকে সম্ভবে না, এক কথায়—তাহা অসম্ভব। অতএব, কার্য্যকারণের মূলতত্ত্ব আমাদের মনের-সংস্কার মাত্র নহে—না তাহা আমাদের ব্যক্তি-গত সংস্কার—না তাহা আমাদের পৈতৃক সংস্কার—পরন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব; এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। কার্য্য কারণের মূলতত্ত্ব সংস্থাপিত হইল—এখন তাহার কোথায় কিরূপ প্রয়োগ হয়—তাহার সবিশেষ তথ্য নির্ণয় করা যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্ম-প্রচারক ও দুর্গোৎসব।

কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীতে দুর্গোৎসব শিরস্ক একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। বারানসীর আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী সভার [illegible] ধর্ম্মপ্রচারক তাহার একটী বিস্তীর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। কথাটী প্রায়ই ঐতিহাসিক। আমরা বলিয়াছিলাম রামায়ণের মধ্যে দুর্গোৎসবের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে যে দুর্গোৎসব হয় তাহা রামের প্রবর্ত্তিত এই যে সাধারণ সংস্কার তাহা ভ্রমাত্মক। রামায়ণে দুর্গোৎসবের কথা নাই

বটে কিন্তু কালিকা পুরাণে তাহা আছে। কিন্তু এস্থলে আমরা কহিয়াছিলাম বাল্মীকি রামায়ণ রামের জীবদ্দশায় রচিত। তাহাতে যখন দুর্গোৎসবের কোনও কথা নাই তখন কালিকা পুরাণকে প্রমাণস্থলে লইয়া বলিতে পারি না যে দুর্গোৎসব রামের প্রবর্ত্তিত। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারকের সুযোগ্য সম্পাদক প্রতিবাদস্থলে কহিতেছেন রামায়ণের উক্তির সহিত কালিকা পুরাণের উক্তির বিরুদ্ধতা নাই কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। অর্থাৎ রামায়ণের আদিত্যহৃদয় স্তোত্র এবং কালিকাপুরাণের দুর্গোৎসব উভয়ই ব্রহ্মোপাসনা। তিনি এই যুক্তিতে প্রমাণ করিতে চান যে দুর্গোৎসব রামের প্রবর্ত্তিত। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখাই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন বা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা। অমূর্ত্তের রূপ নাই সুতরাং কোন রূপে বা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারে না। এই জন্য উপনিষদকারেরা বলিয়াছেন নেদং যদিদমুপাসতে। অর্থাৎ নামরূপে যাঁহার উপাসনা কর তাহা ব্রহ্ম নহে। এইটুকু প্রাচীন ঋষিদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সুতরাং ঋষিদিগের বাক্যপ্রমাণে অসঙ্কোচে বলা যায় যে নামরূপে ব্রহ্মবোধ শুক্তিতে মুক্তাভ্রমের ন্যায় একটা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। যে জন্য ব্রহ্মোপাসনা সেই মুখ্য ফলটা মূর্ত্তিপূজা দ্বারা লাভ হইবার নয়। তবে সূর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মদর্শনের একটু কথা আছে। আমরা যে সৌর জগতে বাস করিতেছি তাহার মধ্যবিন্দু সূর্য্য। প্রাচীন ঋষিরা এইটুকু বুঝিতেন যাঁহারা আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন করিতে অসমর্থ তাঁহারা জগতের মধ্যবিন্দু সূর্য্যে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে ভাবনা করিবে। ইহা তাঁহাদের [illegible] ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। রাম ঋষিদিগের পথ [illegible] করিয়া সূর্য্যের [illegible] সেই ব্রহ্মদর্শনই করিয়াছিলেন। সুতরাং এস্থলে রামায়ণের সহিত কালিকা পুরাণের কেবল বিভিন্নতা নয় কিন্তু একটা প্রাণগত বিরোধ দাঁড়াইতেছে।

ধর্ম্মপ্রচারক লিখিয়াছেন বাল্মীকি রামায়ণ রামের জীবদ্দশায় রচিত বলিয়া, যে সকল কথাই উহাতে লিখিত ছিল তাহার প্রমাণ কি। দেখা গিয়াছে অনেক লোকের জীবনচরিত জীবদ্দশায় ও মরণান্তে রচিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশার গ্রন্থখানিতে হয় তো যে কথার আদৌ উল্লেখ ছিল না তাহার মরণান্তকালের ইতিহাসলেখক বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তাহার জীবনের অনেক নূতন সত্য ঘটনা সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ লিখিত গ্রন্থদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় না। ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদক যাহা বলিয়াছেন তাহা আধুনিক ব্যবস্থা বটে কিন্তু প্রাচীন কালের নয়। মনে কর ইংলণ্ডের কোন ব্যক্তি তদ্দেশীয় কোন রাজচরিত রচনা করিয়াছেন। হয় তো তাহাতে কোন কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী লোক অনেক অনুসন্ধানে সেই সমস্ত ঘটনা বাহির করিলেন। এইরূপ সে করিতে পারা তাহার একটু কারণ আছে। এখন ঐতিহাসিক কাল। একটা প্রধান রাজার জীবনের নানা ঘটনা নানা স্থানে নানা রূপে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লোক যাহা না জানিতে পারে কিন্তু হয় তো ফ্রান্সের লোক তাহা জানিতে পারে। এই ঐতিহাসিক কালে একটা প্রকাশ্য চরিত্রের আন্দোলন সভ্য দেশ মাত্রেই হওয়া সম্ভব এবং তাহা হইয়াও থাকে। যিনি বিশেষ অনুসন্ধান করেন প্রকৃত বৃত্তান্ত সংগ্রহ তাঁহারই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন কালে কিম্বদন্তী ভিন্ন ইতিহাস রচনার অন্য কোনও উপায় ছিল না। এখন কথা

এই কালিকা পুরাণ যে কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া দুর্গোৎসব রামের প্রবর্ত্তিত বলিয়াছেন সেই কিম্বদন্তী বাল্মীকির সময় হইতে অবশ্যই চলিয়া আসিতেছে। নহিলে কালিকা পুরাণ তাহা পান কোথা হইতে। তাই যদি হয় তবে বাল্মীকির ন্যায় এক জন প্রধান কবি তাহা ত্যাগ করিয়া রামায়ণে আদিত্যহৃদয় স্তোত্রের উল্লেখ করিলেন কেন। এস্থলে সহজ উত্তর এই বাল্মীকির সময় দুর্গোৎসব রামের প্রবর্ত্তিত এই অমূলক কিম্বদন্তী আদৌ ছিল না। থাকিলে বাল্মীকি তাহা ত্যাগ করিয়া স্বগ্রন্থে আদিত্যহৃদয় স্তোত্রের কখন সন্নিবেশ করিতেন না। যদি বল রামায়ণের পূর্ব্বে কালিকা পুরাণ রচিত হইয়াছিল। এ কথাও বলিতে পারি না। কারণ বাল্মীকি আদি কবি। বেদরচনার পর বাল্মীকিই সর্ব্বপ্রথম সহজ ও সরল ভাষায় অনুষ্টুভ ছন্দ সাধারণে প্রচার করিয়া যান। এই জন্য কোন এক প্রাচীন গ্রন্থকার বাল্মীকির রচনা দৃষ্টে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন নূতনছন্দসামবতারঃ। আর একটা কথা এই আমরা দুর্গোৎসব প্রস্তাবে বলিয়াছিলাম এখন এই শারদীয় উৎসবে যে মূর্ত্তিপূজা হয় রাম ইহার প্রবর্ত্তক নহেন। এস্থলে মূর্ত্তিটাই মুখ্য কথা। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক আশঙ্কা করিয়াছেন বাল্মীকি যাহা অনুসন্ধানে পান নাই কালিকা পুরাণ তাহা পাইয়াছেন। অর্থাৎ বাল্মীকির সময় মূর্ত্তিপূজা ছিল। আমরা এ কথাতে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারি না। এস্থলে বেদাদি শাস্ত্রের একটু সংক্ষেপ আলোচনা আবশ্যক। হিন্দু জাতির সর্ব্ব প্রথম যে ধর্ম্মভাব বিকাশ পায় বেদে তাহার সম্যক পরিচয় আছে। মনুষ্য এক কালেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানিতে পারে নাই। জগতের যে সমস্ত পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি-সম্পন্ন, দৃষ্টি মাত্র যাহা ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে সেই গুলিই মনুষ্যের উপাস্য হয়। এই জন্য বেদে অগ্নি বায়ু সূর্য্য জল ইত্যাদি জড় শক্তির উপাসনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু মনুষ্য কেবল শক্তিমাত্রকে ধরিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। সে সেই শক্তির আধারকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং বহুসাধনায় তাহা পাইল। ইহার ফল বেদান্ত বা উপনিষদ। এইটী উপাসনা-কাণ্ডের চরম সীমা। কিন্তু কষ্টসাধ্য সাধনায় সকলে সহজে অগ্রসর হইতে পারে না। তখন উপাসনা-কাণ্ডের অবনতি আরম্ভ হইল। ইহার ফল পুরাণ ও তন্ত্র। এস্থলে অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই সকল গ্রন্থেরও প্রতিপাদ্য একমাত্র ব্রহ্ম। কিন্তু গ্রন্থকারেরা সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্মচর্য্যার সৌকর্য্যের নিমিত্ত সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করিয়াছেন। ইহাকেই বলে মূর্ত্তিপূজা। যাঁহারা সূক্ষ্ম ব্রহ্মের ধ্যানধারণায় অসমর্থ পুরাণ তন্ত্রাদি কেবল তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত। রামায়ণ যদিও পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত নয় কিন্তু মহাভারত তাহাই*। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় এ সময়েও ভারতে মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত হয় নাই। সেই বেদোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই গ্রন্থে অখণ্ড ভাবে দীপ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ ইহার পরবর্ত্তী গ্রন্থে মূর্ত্তির বিকাশ। ধর্ম্মপ্রচারকের সুবিজ্ঞ সম্পাদক যে দুর্গোৎসব বাল্মীকির অননুসন্ধানে পরিত্যক্ত [illegible] আশঙ্কা করিয়াছেন তাহার মূল কোথায়? ফলত সে সময়ে মূর্ত্তিপূজার [illegible] আদৌ হয় নাই। হইলে যে দুই [illegible] দল ধর্ম্মপ্রচারার্থ উদাত্ত [illegible] কোন নিদর্শন থাকিত না। [illegible] মহাভারত রচনা। ইহাতেও [illegible]

* রামায়ণ ও মহাভারত এই [illegible]

ক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত আছে। যদি রামায়ণ ও মহাভারতের কালে এই ভারতে মূর্ত্তি-পূজা স্বীকার কর তাহা হইলে বাল্মীকি ও ব্যাসের ন্যায় অদ্বিতীয় কবির ধর্ম্মজগতে অত বড় একটা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিতে কি কিছুমাত্র ঔদাস্য থাকিত। কিছুতেই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। সম্পাদক দুর্গোৎসবকে ব্রহ্মপূজা বলিতে চান বলুন, অন্য কেহ বা ইহাকে শক্তিপূজা বলিতে চান বলুন কিন্তু আমরা কহিয়াছিলাম রাম মূর্ত্তি-পূজা করেন নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে গেলে দুর্গোৎসব স্থান পায় না। এই জন্যই বলিয়াছিলাম রামের সম্বন্ধে ইহা কেবল পৌরাণিক কবিদিগের কল্পনা মাত্র।

এ সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। যে যুগে বাল্মীকি জন্মেন তার পর যুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। মহাভারতে রামের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত আছে। তন্মধ্যেও মূর্ত্তিপূজার উল্লেখ নাই। এখন বলিতে পার ব্যাস মহাভারতে যদিও রামের মূর্ত্তিপূজার বিষয় কিছু বলেন নাই কিন্তু তিনি কালিকা পুরাণে তাহা বলিয়াছেন। এ কথাটী বড় বিসম্বাদী। কিছুতেই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। আরও কালিকা পুরাণ যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচনা এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। ইহা ব্যাস-উপাধিধারী অন্য কোন কবির হইতে পারে। আবার এই কালিকাপুরাণ মহাপুরাণের মধ্যে গণ্য নহে। ইহা একখানি উপপুরাণ মাত্র। ধরিতে গেলে উপপুরাণের প্রামাণিকতাও সামান্য। যাহাই হউক মূর্ত্তিপূজা ব্যাস বাল্মীকির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে যাওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা। মূর্ত্তিপূজা যে কত আধুনিক তাহা যদিও ঠিক নির্ণয় হয় না কিন্তু তাহার সামান্যরূপ আভাস একস্থলে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার পতঞ্জলি একটী পাণিনি-সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একস্থলে একটী উদাহরণ দিয়াছেন। মৌর্য্যৈ র্হিরণ্যার্থিভিরর্চ্চাঃ প্রকল্পিতাঃ। এস্থলে অর্চ্চাশব্দে পূজা নয়, উহা দেবমূর্ত্তিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। উদাহরণটীর অর্থ এই যে মৌর্য্যেরা ধনার্থী হইয়া দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সূত্রপাত করে। ঐতিহাসিক প্রমাণে মৌর্য্যশব্দে চন্দ্রগুপ্তের বংশ বুঝায়। মুরা নাম্নী এক দাসীর গর্ভজাত বলিয়া উহা মৌর্য্য বংশ নামে প্রথিত। দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ যদি এই বংশ দ্বারা হইয়া থাকে তবে তাহা বড় অধিক দিনের কথা নয়। সম্ভবত খৃষ্ট-জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশ ইতিহাসে দেখা দিয়াছে। সেই কাল ধরিয়া বিচার করিলেও এই মূর্ত্তিনির্ম্মাণ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে নয় কলিতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং মূর্ত্তিপূজা যৎপরোনাস্তি আধুনিক। যাঁহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পুরাণাদির আলোচনা করিতে জানেন তাঁহারা এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

ধর্ম্মপ্রচারক নবরাত্রির মেলা লইয়া বড় গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছেন। আমরা বলিয়াছিলাম বঙ্গদেশেই মূর্ত্তিপূজার বাহুল্য পশ্চিমাঞ্চলে যৎস্বল্প। কিন্তু লেখক কাশীর নবরাত্রিতে এক দুর্গাবাড়ির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন এদেশে মূর্ত্তিপূজা যৎস্বল্প নয়। কিন্তু আমাদের নিকট এক কাশীর দৃষ্টান্ত এবিষয়ে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। বঙ্গদেশেও প্রায় প্রতিগ্রামে এক একটী সাধারণ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রায় গৃহে গৃহে মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। পশ্চিমে এরূপ নয়। গৃহে গৃহে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা তথায় আদৌ দৃষ্ট হয় না। তবে যথায় সাধারণ দেবমূর্ত্তি আছে তথায় যা কিছু মূর্ত্তি-পূজা দেখা যায়। ফলত আমরা এখনও বলিতেছি, বঙ্গদেশের সহিত তুলনা করিলে তথায় মূর্ত্তিপূজা যৎস্বল্প। মহাত্মা রাম-

মোহন রায় ধর্ম্ম অনুসন্ধানের নিমিত্ত এই ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। পশ্চিম দেশ সম্বন্ধে আমরা যাহা কহিলাম তিনিও বেদান্তসূত্রের মুখবন্ধে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

আমরা বলিয়া ছিলাম পশ্চিমের অস্থি-মজ্জায় বেদান্তের একেশ্বরবাদ প্রবিষ্ট। কারণ তদ্দেশবাসিরা জলবায়ুর গুণে কষ্টসহিষ্ণু হইয়া আছে। বৈদান্তিক সাধনে কষ্টসহিষ্ণুতা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ সাধন হয় না। কিন্তু বঙ্গদেশে তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। এদেশবাসিরা জল বায়ুর গুণে আমোদপ্রিয়। এজন্য মূর্ত্তিপূজার এদেশেই বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মপ্রচার সম্পাদক আমাদের এই কথায় বিদ্রূপের ভাষায় কিঞ্চিৎ ভূমিকা করিয়া কহিয়াছেন কিছু দিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ বঙ্গীয় গৃহস্থগণ ভক্তিযুক্ত চিত্তে পূজা করিতেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আজকালকার আমোদের তরঙ্গ উথলিয়া না উঠিয়াছিল সে পর্য্যন্ত বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচার বাহুল্য ছিল। এক্ষণ দিন দিন যেমন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের হ্রাস ভক্তির অভাব ও আমোদের বাহুল্য হইতেছে তেমনি দিন দিন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পূজার সংখ্যা কমিয়াই আসিতেছে। যদি আমোদার্থ মূর্ত্তিপূজার বাহুল্য প্রচার হইত তবে আজিকাল অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্গোৎসবাদির প্রচার দেখিতে পাইতাম। এস্থলে ধর্ম্মপ্রচারক আমাদের অভিপ্রায় কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের অভিপ্রায় এই পাশ্চাত্যেরা স্বভাবত কষ্টসহিষ্ণু। বেদান্তের সাধনকষ্ট তাহারা সহজে স্বীকার করিতে পারে। এজন্য বেদান্তধর্ম্ম বহুকাল ধরিয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ ধর্ম্মে আশুতৃপ্তিকর কিছুই নাই। প্রত্যুত শমদমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই ইহার প্রকৃত অধিকারী। এই সাধন বড় সহজ নহে। কিন্তু মূর্ত্তিপূজায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর অনেক পদার্থ আছে। সুসজ্জিত মূর্ত্তিতে নেত্রের তৃপ্তি, ধূপ দীপ পুষ্পাদির সুগন্ধে নাসিকার তৃপ্তি, বাদ্যভাণ্ডে কর্ণের তৃপ্তি এবং দেবীর প্রসাদ ভক্ষণে রসনার তৃপ্তি। এমন কোন বাধ্য বাধকতা নাই যে যজমান সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন না হইলে স্বগৃহে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। বৈদান্তিক ধর্ম্মের কঠোর সাধনকষ্ট। কিন্তু মূর্ত্তিপূজায় তাহা নাই। এই জন্যই বলিয়া ছিলাম বঙ্গদেশীয়েরা দেশের জল বায়ুর গুণে স্বচ্ছন্দে আছে সুতরাং যে ধর্ম্মে আমোদের অংশ অধিক সেই ধর্ম্মই এখানকার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। সম্পাদক জানিবেন যে, যে দেশের যেরূপ প্রকৃতি ধর্ম্ম তাহার অনুরূপ না হইলে তাহা কদাচ টেঁকিতে পারে না। ইহা ফুৎকারে উড়াইবার কথা নয়। ইহা একটা অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু আমরা ইহাও বলিয়া ছিলাম বঙ্গদেশীয়দিগের সাধন-কষ্ট স্বীকার করিয়া মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

অষ্টাদশ ব্যাখ্যান।

অমৃত সোপান, যে জন দেখান, দেখান যে পথ তাঁর।
তাঁহার শরণ, লও অনুক্ষণ, স্মর তাঁরে বার বার॥

যাঁহাতে জীবন, করিছ ধারণ,
কত স্নেহ যাঁর তোমার প্রতি,
সেই প্রেম-দাতা পিতা মাতা প্রভু,
তাঁহার চরণে করহ নতি।
অপরূপ তাঁর স্বরূপ মোহন,
হৃদয়ে হৃদয়ে সদাই রাখ।

তাঁর সুধা নাম জপ মনে মনে,
তাঁহার শরণ লইয়া থাক ॥
অতুলন প্রেম দিয়া অকাতরে,
প্রতি-প্রেম তব যে জন চান।
ভজিবে না তাঁরে ভক্তি প্রেম-ভরে,
করিবে না তাঁরে হৃদয় দান ॥
পেয়ে তাঁর ঠাঁই যে কিছু তোমার,
তাঁরে দাও সব পরাণ ভরি।
তাঁর দত্ত ধন তিনি যদি চান,
ধন্য হও তাহা প্রদান করি ॥
তাঁর কাছে বলি দেও পশু-ভাবে,
উপাড়ি হৃদয় কণ্টক সবে।
তাঁর প্রেম কর হৃদয়ে রোপণ,
সুবাস সুষম কুসুম হবে ॥
ফোটাও যতনে হৃদয়ের প্রেম,
কর গন্ধ দান তাঁহার প্রতি।
ধূপ ধুনা হ'থে তাঁতে অনুরাগ
প্রাণের উচ্ছ্বাস তাঁহাতে মতি ॥
তাঁহার কৃপায় হৃদয়েতে ফোটে,
তাঁহার প্রীতির কুসুম চয়।
সেই সে তপন যাহার কিরণে
হৃদয় কমল প্রফুল্ল হয় ॥
তিনিই ফোটান প্রেম পুষ্প চয়,
তিনিই ধর্ম্মের সহায় হন।
যে চায় তাঁহারে তারিতে সংসারে,
তিনিই তাহারে তুলিয়া ল'ন ॥
পুণ্য ভাব তিনি করেন প্রেরণ,
ইঙ্গিত করেন আপন পানে।
সে ইঙ্গিত বোঝে সাধুর পরাণ,
চলিল সে বিদ্যুত তাহার টানে ॥
হে নর! তোমার পুণ্য আরোহণে,
হইছে পতন শতেক বার।
ভাবিছ দুস্তর সমুদ্র ভীষণ,
কেমনে তাহাতে হইবে পার ॥
আপনার চেষ্টা হতেছে নিষ্ফল,
ডোবে ডোবে তরী এমত হয়।
হওনা নিরাশ, ডাক কর্ণধারে,
রবে না রবে না রবে না ভয় ॥
লইয়া যাবেন তিনি তোমা কূলে,
পুরাবেন তব বিমল কাম।

তাঁহার দ্বারেতে হও হে ভিখারী,
পাইবে তাঁহার অমৃত ধাম ॥
কি ভয় ঈশ্বর ধর্ম্মের সহায়,
তাঁহার চরণ যে জন চায়।
পাপেরে দলিতে স্বরগের বল,
তাঁহার নিকট সে জন পায় ॥
স্বাধীন যদিও করেন আত্মার,
নয়নের আড়ে রাখেন তারে।
পথ-হারা হ'লে, বিপাকে পড়িলে,
তাঁহাকে সহজে ডাকিতে পারে ॥
তিনি দূরে গেলে ফেলিয়া আঁধারে
কি হইত তার গহন বনে।
ডাকিলে উদ্ধার করিবেন বলি
থাকেন নিয়ত তাহার সনে ॥
কি হ'ত পাপীর যদি সে কাঁদিতে
না পারিত তাঁর কাছেতে গিয়া।
শান্তি বারি আর কেবা তাবে দিত,
জুড়াতে তাহার তাপিত হিয়া ॥

ঈশ্বর ধর্ম্মের গুরু বিদ্যমান।
তিনিই আত্মারে সুপথ দেখান ॥
তাঁর সুধা তিনি দান করিবারে।
মধুর আহ্বানে ডাকেন আত্মারে ॥
তাঁব পথে ল'তে করেন কৌশল।
করেন সবল দিয়া নিজ বল ॥
তাঁর উপদেশ শুনিয়া শ্রবণে।
কি সম্বন্ধ তব বুঝ তাঁর সনে ॥
তাঁহার পথেতে হও অগ্রসর।
বিলম্ব না কর হও হে সত্বর ॥

শিশুরে যেমন পিতা চলিতে শিখান।
ছাড়ি দিয়া তার কাছে আপনি দাঁড়ান ॥
চলিতে হইলে তার গভীর স্খলন।
অমনি স্নেহের হস্ত করি প্রসারণ ॥
ধরেন তাহারে গিয়া বাঁচাবার তরে।
না ধরিলে পড়ি শিশু পাছে প্রাণে মরে ॥
সে রূপ পরম পিতা আত্মারে লইয়া।
চলিতে শিখান কিবা যতন করিয়া ॥

করিতে তাঁহারে দেন সংগ্রাম সংসারে।
আপনার বলে সেই যত দূর পারে॥
কিন্তু যদি রণে সেই হয় পরাজিত।
কাতরে তাঁহারে ডাকে—অমনি ত্বরিত॥
আসিয়া অমোঘ বল তারে করি দান।
আপনার হস্ত দিয়া তাহারে বাঁচান॥
কভু দেখা দিয়া মুখ উৎসাহ জনন।
আত্মার ধর্ম্মের ভাব করেন বর্দ্ধন॥
কভু রুদ্র মুখ তাঁর করি প্রদর্শন।
আত্মার দুর্মতি ইচ্ছা করেন দমন॥
কভু নাহি রহে তিনি করিয়া বিশ্রাম।
অনুতাপ অশ্রু দিয়া তাহারে শিখান॥
সাবধান হয়ে সেই তাঁর শিক্ষা লয়।
দিবেন তাহারে মুক্তি নাহিক সংশয়॥
উদাসীন পিতা তিনি নহেন তোমার।
শুন তাঁর কথা তাঁরে স্মর বার বার॥

প্রার্থনা।

তুমি নাথ! মুক্তিদাতা দাও শুভ মতি।
দয়া করি কর নাথ! দীনের সুগতি॥
পুণ্য-ভাব তুমি মনে করহে প্রেরণ।
বিপথেতে যেন নাহি যাই কদাচন॥
থাক সঙ্গে বলে দাও, কি ইচ্ছা তোমার।
সে ইচ্ছা পালন যেন করি অনিবার॥

অষ্টাদশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

উদ্ধৃত।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ।

আর্য্যসমাজ প্রথমে চারিভাগে বিভক্ত ছিল। আজও সেই প্রধান চারি ভাগ আছে সত্য; কিন্তু প্রত্যেক ভাগ আবার বিস্তর করিয়া উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যদি সেই সকল উপবিভাগকে এক একটী শাখা বলিয়া গণনা করা যায়, তাহা হইলে সমাজবৃক্ষের শাখার সংখ্যা করা বড় সহজ কথা নহে—সমস্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে কত ভিন্ন ভিন্ন শাখা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা হয় না। এই সকল বিভাগ অবশ্য সমাজের প্রথম অবস্থায় ছিল না, ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি বর্ণও সমাজের আদিম কালে নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় নাই। আদিম অবস্থায় অবশ্যই সমাজে জাতিভেদ ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। ক্রমে যখন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে একত্রিত করিয়া সমাজ-শরীর সংগঠিত হইল, তখন হইতেই অঙ্গবিশেষের ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য নিরূপিত হইল। জ্ঞানশিক্ষা, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বল বীর্য্য প্রভৃতি যাহাতে যেমন দৃষ্ট হইল, তদনুসারে তাহার কার্য্যও নির্দ্ধারিত হইল। সকল সমাজেই বস্তুত চারি প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চারি ভাগে বিভক্ত না হইলেও সমাজে প্রধানত চারি প্রকার কার্য্যেরই আবশ্যক। যে সমাজে জাতিভেদ অধিক স্পষ্ট নহে, তাহারও কার্য্য সকলকে বিশ্লেষ করিলে চারি শ্রেণীর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর কার্য্য জ্ঞান ও শিক্ষাদান, দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য দেশরক্ষা, তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য আহার সংগ্রহ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্য উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা। ইউরোপীয় সমাজে বিশেষ বিশেষ বংশের উপর বিশেষ কার্য্যের ভার ন্যস্ত না হইলেও, সমগ্র সমাজ-সমষ্টির কার্য্য সকল এই চারি প্রকার বলিতে হইবে। ভারত সমাজে যাহা, ইউরোপীয় সমাজেও তাহাই। ভারতে কেবল বিশেষত্ব এই যে, বিশেষ বিশেষ বংশের উপর বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। কোন বিশেষ কার্য্য বিশেষ বংশের উপর অর্পিত হওয়াতে যে কি সুফল, তাহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন। সন্তান জন্মাবধি পিতার কার্য্য দেখিয়া যত শিখিবে এবং সেই কার্য্যে দক্ষ হইবে, অল্প দিবস মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া তাহাতে নিশ্চয়ই তত পটু হইবে না। পিতার চিন্তাপ্রণালী পর্য্যন্ত যখন সন্তান উত্তরাধিকার করে, তখন পিতার ব্যবসায় সন্তান যেমন শিখিবে, অন্যে কখনই তেমন শিখিবে না। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় সমাজের কার্য্য সকল বংশ-পরম্পরায় উপর অর্পিত হওয়াতে সমাজের উৎকর্ষ ব্যতীত অপকর্ষ সাধিত হয় না। পরন্তু এক প্রকার কার্য্য এক শ্রেণীর লোকেরই অন্তর্নিবিষ্ট থাকা উচিত এবং ইহাতেই সমাজের মঙ্গল। এক প্রকার কার্য্য করিবার অধিকার যদি সকলকেই প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে মহান অনিষ্টের সম্ভাবনা। সকলকে সমান অধিকার প্রদত্ত হইলে, যদি কোন সময়ে সকল লোকেই আহার সংগ্রহে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তৎকালে সাধারণকে শিক্ষা দান বা দেশরক্ষা বা পরিচর্য্যা করে কে?

সমাজ সংগঠনে সমাজ-ভুক্ত সকল লোককে সমান অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। সমান অধিকার পাইলেই কি সকলে সমান হইতে পারে? স্বীয় স্বীয় শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে অবশ্যই পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িবে; সুতরাং সমান অধিকার বিড়ম্বনা ও বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁহারা সাম্য-তন্ত্রীর দ্বারা সমাজ-শরীরকে বাঁধিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, সকল লোকেই যাগ যজ্ঞ করিতে বসিলে দেশরক্ষা, আহার সংগ্রহ ও পরিচর্য্যা করিবার লোক মিলিবে না; সুতরাং এক দিনও যাগ যজ্ঞ চলিবে না। তদ্ভিন্ন সকল লোকেরই স্বাভাবিক শক্তি ও শিক্ষা যে সমান হইবে, তাহা আশা করা যায় না; সুতরাং সকলকে সমান অধিকার দিলেও সকলে

কখনই সম্মান হইতে পারিবে না। তবে যদি স্বাভাবিক শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে সকলের জন্যই সকল দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তাহা হইলে সমাজকে সাম্য-সূত্রে দীক্ষিত করা না হইয়া যোগ্যতা-সূত্রে গ্রথিত করা হয়। কিন্তু যোগ্যতা-সূত্রে সমাজ বাঁধিতে হইলে "যোগ্যতার উন্নতি" (Survival of the Fittest) নিয়মে এক অংশ উন্নত হইবে ও অপরাংশ অবনত এবং অবশেষে বিনষ্ট হইবে। এক অংশ বিনষ্ট হইবে তাহার কারণ এই যে, তাহাকে হীনবল করিতে না পারিলে অন্য অংশ বলবান হইতে পারে না। জীবিত থাকিবার জন্য সংসারে ইতর প্রাণীগণ যে প্রকার প্রতিনিয়ত জীবন-সংগ্রামে নিরত, যোগ্যতা অনুসারে সমাজ সংগঠিত হইলে মনুষ্য মধ্যেও সেই প্রকার জীবন-সংগ্রাম বাঁধিবে এবং একে অন্যকে ক্রমশ হীনবল ও অবশেষে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং বলবান ও উন্নত হইবে। হিন্দু-সমাজ এপ্রকার সংগ্রামের সমাজ নহে। এ প্রকার সংগ্রামের সমাজের মধ্যে ইংরাজ সমাজ অগ্রগণ্য। ইংরাজ সমাজ সংগ্রামের সমাজ বলিয়াই ইংলণ্ডের উন্নত ব্যক্তি অনুন্নত অবস্থা হইতে এতদূর উঠিয়াছে যে, তথা হইতে অনুন্নতকে দেখা যায় না। কিন্তু হিন্দু সমাজের দুই শ্রেণীর দুই জনের মধ্যে কখনই তাদৃশ পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। সুতরাং হিন্দু সমাজকে সাম্যের সমাজ বলিব, না ইংরাজ সমাজকে সাম্যের সমাজ বলিব?

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সাম্যকে লক্ষ্য করিয়া সমাজ গঠন সম্ভব নহে। সাম্য দ্বারা সমাজ বাঁধিতে পারিলে, অর্থাৎ সমাজস্থ সকল লোকের অবস্থা সমান করিতে পারিলে সমাজ বড় সুখের হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে প্রকার গঠন সম্ভব নহে। তবে হিন্দু সমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাম্যনীতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। এই সাম্যের অর্থ এমন নহে যে, প্রত্যেকেই এক প্রকার কার্য্য করিবে ও সকলেই একপ্রকার সুখ-সৌকর্য্যের অধিকারী হইবে। ইহার অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবে, কিন্তু এক শ্রেণী সবল হইয়া অপরকে নিধন করিবে না। সকলেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং পরস্পর এমনই বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে যে, কাহারও অভাবে কাহারও সংসার চলিবে না। এই প্রকার সাম্যকে মূলমন্ত্র করিলে সমাজ যে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ভাবেই হিন্দু সমাজ আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে। আমরা এমন বলি না যে, জাতিভেদ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন একেবারে আবশ্যক হয় নাই। যখন যেমন আবশ্যক হইয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী সমাজ-সংস্কারকেরা তখন তেমনই বিধি প্রচলিত করিয়া রুগ্ন সমাজকে আবার সবল ও সতেজ করিয়া প্রবল প্রতাপের সহিত জীবিত রাখিয়াছেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার অতি প্রাচীন কালেই ন্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবহমান কাল সেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আর হিন্দুসমাজে পূর্ব্বরীতি সতেজ ও সজীব নাই—জাতিভেদ ও জাতিগত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং হিন্দু সমাজ-বন্ধন এক্ষণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। সমাজ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল; যুগে যুগে অবশ্যই ইহার শরীরে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হইবে। বৈদিক সময়ে হিন্দু সমাজের যেমন অবস্থা ছিল, পৌরাণিক সময়ে তেমন ছিল না; পৌরাণিক সময়ে যে প্রকার অবস্থা ছিল তান্ত্রিক সময়ে সে প্রকার ছিল না। রামায়ণে সমাজের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়; বুদ্ধের সময়ের সমাজ চৈতন্যের সময়ে বিদ্যমান ছিল না। হিন্দু রাজত্ব সময়ের অবস্থা মুসলমান সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; মুসলমান রাজত্ব সময়ের অবস্থা ইংরাজ শাসন সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অধিক পশ্চাতে যাইতে হইবে কেন?—রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে সে অবস্থা নাই। জাতিভেদ-প্রথা এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার ফলে বিলক্ষণ শিথিল হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা স্বাধীনতার দোহাই দিতে দিতে সমাজের পক্ষে বড়ই অনিষ্ট করিয়াছে—অসার ও কুশিক্ষা দিয়াছে। জাতিভেদ এক্ষণে হিন্দুসমাজে দোলায়মান—একের বৃত্তি অন্যে অবলম্বন করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে; সমাজে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে।

শিক্ষার পরিবর্ত্তন, ইংরাজী প্রথার অধিষ্ঠানে ও বিদেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভাবে এ প্রকার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে আবার ইংরাজ, মুখে সাম্য ও স্বাধীনতার গান করিতে বড়ই পটু। আমরাও নিতান্ত অনুকরণপ্রিয়; তাই ইংরাজী প্রথার অনুকরণ করিতে গিয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ফলতঃ, ইংরাজী শিক্ষা, রীতি, নীতি, ব্যবসায়, বাণিজ্যাদি যখন হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল, তখন অবশ্যই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে আর পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইংরাজ ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিয়া নিজে অধ্যাপকতা করিতে লাগিলেন—ব্রাহ্মণ উদরান্ন করিয়া খাইতে পায় না—কাজেই তাহাকে সেই সে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইতে হইল। ইংরাজ স্বয়ংই দেশ রক্ষক; সুতরাং যুদ্ধ যাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, তাহাদিগের অনেককে অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইল। ইংরাজ নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন এবং ভূমিকর্ষণেও মনোযোগ দিলেন;—কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আপন পাট তুলিয়া দিয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উদরান্ন করিয়া খাইবার জন্য লালায়িত হইল। নানা প্রকারে পরিচর্য্যা করা যাহাদিগের কার্য্য ছিল, ইংরাজ তাহাদিগের কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলেন; কাজে কাজেই তাহারাও দিগ্বিদিকে অন্নান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহার উপর ইংরাজ বলিলেন—সকলেই সমান, যাহার যে বৃত্তি ইচ্ছা সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে। এই শিক্ষার গুণে, যাহার

ব্যবসায় বা বৃত্তিতে ইংরাজ প্রতিযোগী হন নাই, সেও আপন ব্যবসায়কে নিকৃষ্ট বোধে, তাহা ত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য পথ দেখিতে বাধ্য হইল—ইংরাজ কর্ত্তৃক যাহার বৃত্তি একেবারে বা কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ত বাধ্য হইয়াই পথান্তর দেখিতে হইয়াছে। ইংরাজের শিক্ষায় আমরা কুলিশাম—তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ—ইংরাজ রাজা বলিয়া রাজাজ্ঞা দ্বারা আপনার স্বার্থ রক্ষা করিয়া আমাদিগকে সকল সুবিধায় বঞ্চিত করেন। এই প্রকার নানা কারণে হিন্দু সমাজে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল—হিন্দু-সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইল। মনু পরাশরাদি সমাজসংস্কারকদিগের চিরদিনের ব্যবস্থা অতল অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। তাঁহাদিগের গঠিত সমাজের এরূপ অবস্থা ঘটিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বর্ত্তমান কালে সকলেই স্ব-স্ব প্রধান—কেহ কাহাকেও গুরু বলিয়া মানিতে চাহে না—রাজশাসন ব্যতীত সমাজ-শাসনের আর ক্ষমতা নাই। এ ঘোর দুর্দ্দিনে কে পথ-প্রদর্শক হইবে এবং কে যে পতনোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন—আমরা এ বিপদে কাণ্ডারী দেখি না।

হিন্দু সমাজে যখন বৃত্তিনাশ জনিত বিপর্য্যয় ঘটিল, তখন কাজে কাজেই জাতিভেদ-প্রথা শিথিল হইয়া গেল। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল বংশ বিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া এক্ষণে সাধারণ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় বৃত্তিনাশে হিন্দু-সমাজে কষ্টের আর অবধি নাই। সাধারণত প্রত্যহই লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার উপর লোকসংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে এক জনের উপযুক্ত অন্ন বস্ত্রে বহুজনকে প্রতিপালিত হইতে হইতেছে। জাতি বিশেষে কার্য্য বিশেষ ন্যস্ত থাকাতে যে সুফল, তাহা এক্ষণে দৃষ্ট হয় না। জাতিভেদ-প্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার আর উপায় নাই। যাহারা রক্ষণশীল সমাজ-সংস্কারক, তাঁহারা বিস্তর শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া জাতিভেদ-প্রথা পুনঃ-প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু যুক্তির সহিত কিছুই করিতে পারিতেছেন না: সুতরাং ফলও কিছুই হইতেছে না। আমাদিগের বিবেচনায়, পূর্ব্ব-প্রচলিত রীতি নীতি আর পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে—সমাজ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, পূর্ব্বভাবে এক্ষণে ইহাকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা, ভস্মে ঘৃতাহুতি বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজ সমাজের অনুকরণে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করিলেও মঙ্গল নাই। কি রক্ষণশীল, কি পরিবর্ত্তনশীল, উভয় পক্ষের কোন সমাজ সংস্কারই পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না—আংশিক রক্ষণ ও আংশিক পরিবর্ত্তনশীল সম্প্রদায় যদি কিছু করিতে পারেন তবেই মঙ্গল, নতুবা হিন্দু সমাজ কালের অতল গর্ভে ডুবিল—জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠাঙ্ক ভস্মীভূত হইল।

নব্য ভারত।

দুর্ভিক্ষের দান প্রাপ্তির আয় ব্যয়।

গত ৩১ চৈত্র বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে দান সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং মফস্বলেও সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এই সূত্রে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার আয় ব্যয় নিম্নে দেওয়া গেল।

সর্ব্বশুদ্ধ আয়	৯৭৩৸৶৯
সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয়	৯৪৬৷৶৯
স্থিত	২৭৷৷০

আয়।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ দান পাওয়া যায়।	৯৪১৷৵
দান সংগ্রহের সময় যে সকল পিতলের বাসন পাওয়া গিয়াছিল তাহা বিক্রয়।	১৯৸৶০
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজাধীন দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভা সাহায্য করেন।	১২৷৷৶৯
	৯৭৩৸৶৯

ব্যয়।

দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান, চাউল ক্রয় করিয়া বিতরণ করা হয় ৪১৩৷৮৶ মন	৭৯৯৸৵
পয়সা বিতরণ করা হয়	১৯৸০
দরিদ্রদিগকে বস্ত্র (১৮ থান) ১৮০ খানা বিতরণ করা হয়	৫৮৷৷০
তত্ত্বাবধায়ক ও অবৈতনিক কর্ম্মচারীগণের পাথেয়	২৭৷৷ ৯
সাহায্যকারী কর্ম্মচারীর বেতন	১৭৲
অবৈতনিক কর্ম্মচারীগণের আহারাদি ব্যয়	১২৶৬
ডাকমাশুল ব্যয়	৪৸০
বিবিধ ব্যয়	৭৵
	৯৪৬৷৶৯

আমাদের এই অর্থে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে গত ৩ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১২ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৫২৬৩২ জনকে অন্ন দেওয়া হইয়াছিল। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা। আমরা যে, এত গুলি লোকের এই সঙ্কটের সময় কিছু সাহায্য করিতে পারিয়াছি ইহাতে কেবল তাঁহারই দয়া প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ করিতেছি। তাঁহাদের অর্থ সার্থক হইয়াছে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজাধীন নলহাটি দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভার সভ্যেরা মফস্বলে থাকিয়া আমাদিগের প্রদত্ত অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য ব্যয় করিয়া আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
মাঘ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ

৫১০ সংখ্যা ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাণ-সাগরে।

হে মানব! ডুবে যাও প্রাণের সাগরে,
প্রাণের সাগরে সে ডুবিলে নাহি মরে।
ঐ দেখ, বেলা তার মৃত্তিকার নয়,
ডুবে না তাহাতে ভানু হইতে উদয়।
গগনের সীমান্ত না সীমা তার ছোঁয়
জল তার স্পর্শি না কালের রজ্জু নোয়।
কভু বৃদ্ধি হ্রাস নাই, কভু না তুফান
আপনার প্রতিষ্ঠায় আপনি শয়ান।
কেবল সে ধক্ ধক্—কেবল ধবল
বারি তার বিকশিত অনন্ত মঙ্গল।
সাগরে উঠিছে ক্ষুদ্র বাষ্পের মতন
উঠে তার গর্ভ হতে সকল জীবন।
উঠে স্মৃতি, উঠে জ্ঞান, উঠিছে বিবেক,
উঠিছে ইন্দ্রিয়-শক্তি—চেতনা-উদ্রেক।
অগণিত সৌর-চক্র—অগণিত তারা—
সাগরে উঠে সে বিশ্ব, সাগরেই সারা।
কোথা চাও, কোথা যাও, সাগর ত্যজিয়া
এই যে অমৃতানন্দ তোমারি লাগিয়া।
সহজে আত্মার জাগাইয়া আত্মজ্ঞান
ঢেলে দাও মহাপ্রাণে আপনার প্রাণ।
যে ফল পাইবে তাহে, না পাবে সংসারে,
ডুবে যাও, ডুবে যাও, প্রাণের সাগরে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ পৌষ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বর আমাদের নিরাশার আশা। তিনি যখন আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হ'ন তখন প্রীতি ভক্তির বন্ধনে আমরা তাঁহার চরণে বাঁধা পড়ি, আবার যখন মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তাঁহা হইতে দূরে পড়ি তখনও আশা-বন্ধনে আমরা তাঁহার দিকে আকৃষ্ট

থাকি। সেই আশার আকর্ষণেই আমাদের হৃদয় হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হয়—অসতোমা সদ্‌গময়—অসৎ হইতে আমাকে সৎ স্বরূপে লইয়া যাও, তমসোমা জ্যোতির্গময়—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। আবিরাবীর্ম এধি—আমার নিকট প্রকাশিত হও, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

কোন পাপীর গুরুর নিকটে যদি আমরা আমাদের এই মনোগত প্রার্থনাটি জানাই যে, "অসৎ হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও" তবে তিনি আমাদিগকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে, এই সকল অনিত্য বিষয় দেখিতেছ সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ইহা হইতে স্বতন্ত্র, "নেতি নেতি ইহা নহে ইহা নহে" এই উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন; ইহাতে আমরা এই ফল লাভ করি যে, আমরা অনিত্য জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া লইবার চেষ্টা করি—এবং আত্মাতে পরমাত্মার আবির্ভাবের জন্য আশাপথ উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বদা সজাগ থাকি। কিন্তু পরমাত্মার প্রতি যখন আত্মার প্রার্থনা উত্থিত হয় যে "অসতোমা সদ্‌গময়" তখন "নেতি নেতি—ইহা নহে ইহা নহে" এরূপ বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া সৎস্বরূপ পরমাত্মা আত্মাতে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন—তখন ক্ষুদ্র দেহের অভ্যন্তরে মহান্ সত্যকে পাইয়া আত্মার আর আনন্দ ধরে না,—পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী আকাশে উড্ডয়ন করিতে পাইলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, পরমাত্মার আবির্ভাবে আত্মার আনন্দ সেইরূপ দশদিক্ ছাইয়া পড়ে। তখন আত্মার প্রার্থনা যায় "তমসোমা জ্যোতির্গময়" তখন আত্মা আকাশের কারাগারে—শরীরের পিঞ্জরে—অন্ধকারে আবৃত থাকিতে চাহে না,—অসীম আকাশ যাঁহার গুরু ভার ধারণ করিতে অসমর্থ তাঁহাকে পাইয়া আত্মার আনন্দ জ্যোতি আকাশ ছাড়াইয়া উঠে; তখন আত্মা পরমাত্মার সহবাসের আনন্দকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য এই প্রার্থনা উদ্গীরণ করে "মৃত্যোর্মামৃতং গময়" মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও—তোমার বিচ্ছেদই মৃত্যু—তুমি আমার হৃদয়ে চিরদিন প্রকাশিত থাক "অবিরাবীর্ম এধি।" পরমাত্মার আবির্ভাবে আত্মার আনন্দ জ্যোতি যেমন আকাশ ছাড়াইয়া উঠে, তেমনি তাহা কাল ছাড়াইয়া উঠিয়া প্রশান্ত জ্ঞান-জ্যোতিতে মিলিত হয়—এইরূপ জ্ঞান এবং আনন্দের সম্মিলন অমৃতের প্রস্রবণ হইয়া উঠে। নেতি নেতি করিয়া আত্মাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিলে তাহাকে জল দ্বারা ধৌত করা হয়, কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইলে আত্মাতে অগ্নি প্রবেশ করে;—জল-দ্বারা সহস্র ধৌত করিলে যাহা না হয়—অঙ্গারে অগ্নি প্রবেশ করিলে অঙ্গারের শ্রী ফিরিয়া যায়। হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে দেশ-কালের সমস্ত প্রাচার ভগ্ন করিয়া অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

হে পরমাত্মন্! সংসারের বিভীষিকায় ভয় পাইয়া আমরা তোমার অমোঘ আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—তুমি আমাদের শত সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও—হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। আমরা সকল বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া তোমাকে ডাকিতেছি "আবিরাবীর্ম এধি" আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হও,—শিশুর নিকটে যেমন মাতা খাদ্য-সামগ্রী লইয়া

আসে—সেইরূপ তুমি আমাদের আত্মাতে পবিত্র প্রেম লইয়া আইস—তোমার প্রেমময় সহবাসে আমাদের অনাথ আত্মাকে সনাথ কর;—আমাদের আত্মা অমৃতের জন্য পিপাসু হইয়া তোমাকে বার বার ডাকিতেছে তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও, —এই সংসারের মোহ-প্রাচীর আমাদের নিকট হইতে তোমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—তাহার কবাট উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হও।—তুমি প্রকাশিত হইলে আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়—সকল খেদ চলিয়া যায়—সকল আশা চরিতার্থ হয় এই জন্য আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে ডাকিতেছি আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উদ্ধৃত।

পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কি—ইহাই প্রদর্শন করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহাতে অগত্যা কম্‌তের মতের প্রতিবাদ আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বাবু গত মাসের ভারতীতে যে কয়েকটি সংশয়-সূচক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা আহ্লাদের সহিত তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা বলি—মূল সত্যই ধর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক;—কৃষ্ণকমল বাবু তাহা বলেন না। কৃষ্ণকমল বাবু মিলের মতানুসারে, "বরফ শীতল" এইরূপ তত্ত্ব গুলিকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন্। পরীক্ষাসিদ্ধ স্থূল তত্ত্ব এবং স্বতঃসিদ্ধ মূলতত্ত্ব (Fundamental Principles) এ দুয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে—মিল্ তাহা আপন শাস্ত্রে আদবেই আমল দে'ন নাই। মিল্ চক্ষু মুদিয়া মনে করিতে পারেন—সূর্য্য অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সূর্য্য সত্যই-কিছু-আর আলোক দানে ক্ষান্ত থাকিবে না; মিলের মতে, স্থল-বিশেষে দুই আর দুয়ে পাঁচ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার ঐ কথায় ভুলিয়া কোন জগতের কোন লোকই দুই আর দুয়ে পাঁচ গণনা করিবে না। মূল-তত্ত্ব-সকল যে, কিরূপ অকাট্য, তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই আমরা এখানে ক্ষান্ত হইতেছি;—

যতবার আমরা বরফ হস্তে লইয়াছি ততবারই আমাদের হস্ত কন্ কন্ করিয়াছে, ইহাতেই আমাদের মনোমধ্যে বরফের ভাবের সহিত হাত-কন্কনানির ভাব যোগবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এই তত্ত্ব টি আমাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়াছে যে, বরফ শীতল। কিন্তু যতবার আমরা পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি—একবারও আমরা তাহার নিগূঢ় কারণ ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধি করি নাই, অথচ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, পরিবর্ত্তনমাত্রেরই কারণ আছে; আমরা বীজ-বপন দেখি এবং তাহার কিছুদিন পরে অঙ্কুরের উত্থান দেখি—পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী দুইটি ঘটনা দেখি; কিন্তু বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের কি-যে বাধ্য-বাধকতা সে-টি আমরা আদবেই দেখিতে পাই না—অথচ সেই-টিতেই কারণের কারণত্ব হয়। শুধু যে পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেই কারণ হয় এবং পরবর্ত্তী হইলেই কার্য্য হয়, তাহা নহে;—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার মধ্যে যদি এমন একটা-কিছু থাকে যাহার গুণে পরবর্ত্তী ঘটনা উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়—তবেই আমরা ঐ দুই ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ উপলব্ধি করি; কিন্তু সেই যে "একটা কিছু" যাহার গুণে

কার্য্য উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়, তাহা কি? তাহা কি কেহ বরফের কনক্নানির ন্যায় স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়াছে, তাহার রূপ কেহ দেখিয়াছে, না তাহার ধ্বনি কেহ শুনিয়াছে? বরফের কনকনানি বারবার আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হওয়াতেই এই তত্ত্বটি আমাদের বুদ্ধিতে দখল পাইয়াছে যে, বরফ শীতল; কিন্তু পরিবর্ত্তনের হেতু-মত্তা কোনোও আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় নাই অথচ আমরা বলিতেছি যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেই সহেতুক। এমন হইলেও হইতে পারে যে, সূর্য্যালোকে জল জমিয়া বরফ হইলেও তাহা শীতল হয় না; কিন্তু অসীম জগতের কোন স্থানেই এরূপ হইতে পারে না যে, তরল জল কঠিন হইয়া উঠিল অথচ তাহার কোন কারণ নাই। "বরফ শীতল" ইহার অন্যথা ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু 'পরিবর্ত্তন সহেতুক' ইহার অন্যথা একেবারেই অসম্ভব। এই বৎসরের পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব" এই শিরস্ক প্রবন্ধে উপরি-উক্ত বিষয় জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা হইয়াছে—পাঠকের ইচ্ছা হইলে তিনি তাহা দেখিতে পারেন; এখানে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে, "বরফ শীতল" এই সকল স্থূল তত্ত্ব ছাড়া এমন অনেকগুলি মূলতত্ত্ব আছে—যাহা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ। স্পেন্সার্ অতীব সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ-পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, আপেক্ষিক অপূর্ণ সত্য-সকলের মূলে এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ মূল সত্য বিদ্যমান আছেন ইহা একটি সর্ব্বোচ্চ মূলতত্ত্ব;—কাহারো সাধ্য নাই যে ইহা অমান্য করিতে পারেন। ফল কথা এই যে, সত্যকে ভাগ ভাগ করিয়াও দেখানো যাইতে পারে এবং মোট্ বাঁধিয়াও দেখানো যাইতে পারে;—"বরফ শীতল, অগ্নি উষ্ণ," এ প্রকার সত্য-সকলকে স্থূল সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; "ত্রিভুজের তিন কোণ ঠিক্ দিলে দুই ঋজু কোণ (Right angle) হয়, কোন একটি জড় পিণ্ড একই সময়ে দুই দিকে তাড়িত হইলে কোণাকুণি যায়, জলের মূল উপাদান অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন্" এ প্রকার সত্য-সকল বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; আবার, কি স্থূল সত্য—কি বৈজ্ঞানিক সত্য, উভয় প্রকার সত্যের গোড়াতে যে সকল সত্য নিগূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে-সকল সত্যকে দার্শনিক সত্য বলা যাইতে পারে; ইহার একটি দৃষ্টান্ত—পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে; আবার সমস্ত দার্শনিক সত্যের মূলে যে এক অদ্বিতীয় সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই মূল সত্য,—তাহা এই যে, পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলাধার। এইরূপ, সত্যকে একদিকে যেমন বহু ভাগ ভাগ করিয়া দেখানো যাইতে পারে, আর এক দিকে তেমনি মোট বাঁধিয়া দেখানো যাইতে পারে। সত্যকে ভাগ ভাগ করিয়া তাহার কোন একটি অংশ বিশেষে মনুষ্য-জ্ঞানের সমগ্র চরিতার্থতা হইতে পারে না;—জ্যামিতিক সত্যে যাঁহার মন ডুবিয়া রহিয়াছে—ঐতিহাসিক সত্যের আলোচনায় তাঁহার নিতান্ত অপ-টুতা জন্মিতে পারে; রাসায়নিক সত্যে যাঁহার মন ডুবিয়া আছে, জ্যোতিষিক স-ত্যের আলোচনায় তাঁহারও ঐরূপ। বিশেষ-সত্যের প্রতি বিশেষ-মনুষ্যের বিশেষ আক-র্ষণ থাকিতে পারে—ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু সে আকর্ষণ স্বতন্ত্র, এবং সাধারণতঃ সত্যের প্রতি মনুষ্য-জ্ঞানের যে আকর্ষণ, তাহা স্বতন্ত্র;—আমরা যেখানে বলিয়াছি—সত্যের প্রতি আকর্ষণ মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, সেখানে সত্যের অর্থ এক

দিক্‌ ঘেঁসা কোন অসম্পূর্ণ সত্য নহে কিন্তু মোট সত্য। একদিক্‌-ঘেঁসা কোন সত্যই সর্ব্বাঙ্গীন সত্য নহে; তাহা যদি সর্ব্বাঙ্গীন সত্য হইত, তবে সেই-একটি সত্যেই মনুষ্যের জ্ঞান-পিপাসা সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হইতে পারিত; তাহা হয় না বলিয়াই স্পেন্‌সর সর্ব্বদিক্‌দর্শী মোট সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া অগত্যা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ মূল-সত্য সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলাধার।

কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু বলেন যে, "আমাদিগের বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম বলিয়া এক মূল সত্য নিরূপণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মতে "নিরূপণ" অর্থাৎ 'ঠিকরাণো' অথবা 'একটা ঠিক্‌ ঠিকানা করা' সে কোথা, তাহাতে কিছুই দেখা যায় না। যেহেতু তাঁহারা নিজেই স্থানে স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম 'নেতি নেতি' এই বাক্যে নির্দ্দেশ-যোগ্য। অর্থাৎ যে জিনিসের কোন নাম কর না, সেটা তাহার কিছুই নহে। স্পেন্‌সর সেই কথা বলেন।" স্পেন্‌সর "নেতি নেতি" বলিয়াই ক্ষান্ত আছেন—একথার বিশেষ কোন প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। স্পেন্‌সর্‌ কেবল এই বলেন যে, আমরা ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানিতে পারি না; তেমন, এক গাচি তৃণকেও আমরা স্বরূপতঃ জানিতে পারি না। কিন্তু আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে তৃণের যেরূপ আবির্ভাব হয় তাহা নিরূপণ করা কিছুই কঠিন নহে; তেমনি আমাদের আত্মাতে মূল-সত্যের যেরূপ আবির্ভাব হয় তাহা আমরা নিরূপণ করিব—ইহাতে কাঠিন্য কিছুই নাই। পূর্ব্বতন ঋষিরা ব্রহ্মের আবির্ভাব যেরূপ জানিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন,—কেনই বা তাহা না করিবেন। "ব্রহ্মের আবির্ভাব-দ্বারা আমরা তাঁহার নিরূপণ করিতে পারি" ইহা বলিয়াই স্পেন্‌সর ক্ষান্ত নহেন, আরো তিনি বলেন যে, মূল-সত্য আমাদের মনে তাঁহার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন, সেইরূপ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিবার ভার তিনি আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; স্পেন্‌সরের নিজের লেখনী হইতে নিম্ন-লিখিত কথাটি স্পষ্টাক্ষরে পাচির হইয়াছে;—"And when the Unknown Cause produces in him (অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মনে) a certain belief, he is thereby authorized to profess and act out that belief" পাঠক পাছে মনে করেন যে, স্পেন্‌সরের কথার ল্যাজামুড়া বাদ দিয়া আমরা আপনাদের একটা কথা স্পেন্‌সরের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছি; এই জন্য নিম্নে উহার গোড়ার কথাটা উহার সঙ্গে গাঁথিয়া দিতেছি।

"It is not for nothing that he has in him these sympathies with some principles (যেমন এই এক principle যে, সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলে এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্য বর্ত্তিতেছেন) and repugnance to others. He, with all his capacities, and aspirations, and beliefs, is not an accident, but a product of the time. He must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future: and that his thoughts are as children born to him, which he may not carelessly let die. He like every other man, may properly consider himself as one of the myriad agencies through whom works the Unknown Cause; and when the Unknown Cause produces in him a certain belief, he is thereby authorized to profess and act out that belief." কিন্তু এই যে, "অপরিজ্ঞাত কারণ," ইহা কি স্পেন্‌সরের মতে একেবারেই অজ্ঞেয়—না সকল বস্তুই যেমন স্বরূপতঃ আমাদের নিকট অজ্ঞেয়, তিনিও সেইরূপ?

স্পেন্সরের নিম্নের এই কথাটির প্রতি পাঠক প্রণিধান করুন,—

"The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer; and must eventually be freed from its imperfections. যদি মূল সত্যকে স্পেন্সর একেবারেই অজ্ঞেয় বলিয়া উড়াইয়া দিতেন তবে "consciousness of an Inscrutable Power" না বলিয়া তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন "The unconsciousness of an Inscrutable Power has been growing ever clearer" অতএব ইহা অতীব স্পষ্ট যে, মূল সত্য স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় বটে কিন্তু আমাদের জ্ঞানে (in our consciousness) তাঁহার যেরূপ আবির্ভাব হয় তাহা আমাদের জ্ঞেয়, "জ্ঞেয়" শুধু নয় কিন্তু অবলম্বনীয়; আমরা "authorized to profess and act out that belief" অতএব "ব্রহ্মকে একেবারেই জানা যায় না—নিরূপণ করা যায় না—তাঁহার কোন ঠিক ঠিকানা করা যায় না" এ কথা কম্‌টির হইলেও হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সরের নহে। স্পেন্সরের নিজের কথা মন্থে দাঁড়াইতেছে যে, (১) মূল সত্য আছেন ইহা সুনিশ্চিত; (২) অন্যান্য বস্তুর ন্যায় স্বরূপত তিনি আমাদের অজ্ঞেয়; (৩) মূল সত্যের আবির্ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পায়; (৪) মূল সত্য আমাদের ভিতরে কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন; (৫) সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই পাঁচটি কথার মধ্যে "স্বরূপতঃ তিনি অজ্ঞেয়" এই একটি কথা কেবল কম্‌টের পছন্দ-সই, অবশিষ্ট চারিটি কথা দেখিবামাত্র কম্‌টি অমনি মুখ ফিরাইবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। স্পেন্সরের এই যে একটি কথা—

"The consciousness of an Inscrutable power must eventually be freed from its imperfections (যথা-কালে অপূর্ণতা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে)" ইহা আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি;—দুর্জ্ঞেয় মূল-শক্তির ভাব (The consciousness of an Inscrutable Power) যাহা আমাদের আত্মার ভিতর জাগিতেছে, সেই ভাব-টি অপূর্ণতা হইতে মুক্ত হইলেই অন্ধ শক্তির পরিবর্ত্তে সজ্ঞান শক্তি জাগরূক হইয়া উঠে; কেননা অন্ধতা অপূর্ণতার লক্ষণ—জ্ঞানবত্তা পূর্ণতার লক্ষণ। আবার, যেখানে সজ্ঞান শক্তিমত্তা সেই খানেই তাহার আধার-স্বরূপ আত্মা আপনাতে এবং আপনার শক্তির আবির্ভাবে আপনি আনন্দিত—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য বেদান্ত ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের অভাবাত্মক লক্ষণ "নেতি নেতি"—ভাবাত্মক লক্ষণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আমাদের আত্মারও অভাবাত্মক এবং ভাবাত্মক দুই শ্রেণীর লক্ষণ আছে;—আমরা যখন বলি "আত্মা হস্ত নহে—পদ নহে—চক্ষু নহে—ইত্যাদি" তাহাই নেতি-নেতি; আবার, যখন বলি যে, "আত্মা স্বীয় শরীর-মনের এক অদ্বিতীয় অধিকারী, আত্মা সজ্ঞান-শক্তি-ও-তজ্জনিত-আনন্দের আধার, ইত্যাদি" তখন আমরা আত্মার ভাবাত্মক লক্ষণ নির্দ্দেশ করি; এইরূপ দুই শ্রেণীর লক্ষণের মধ্যে বিরোধের কোন প্রসঙ্গই স্থান পাইতে পারে না। কৃষ্ণকমল বাবু যদি বলেন যে, সকল জ্ঞানের চেতয়িতা এক অদ্বিতীয় মূল জ্ঞানের প্রমাণ কি? তবে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটিতে তাহার সমুচিত উত্তর অনেক-কাল পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

"মানঞ্চ প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাত্মানঃ॥"

প্রমাণকে প্রবোধিত করে যে জ্ঞান (অ-

র্থাৎ মূল জ্ঞান) তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন—সেই সকল মহা-পণ্ডিতেরা কি করেন? না কাষ্ঠকে দগ্ধ করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন।" এই কাগজের এ পিট দেখিবা-মাত্র যেমন প্রমাণ হয় যে ইহার ও-পিট আছে, সেইরূপ অপূর্ণ-জ্ঞান-গম্য অপূর্ণ সত্য (যেমন "বরফ শীতল" এই একটি সত্য) দেখিবা মাত্রই প্রমাণ হয় যে পরিপূর্ণ-জ্ঞান-গম্য পরিপূর্ণ সত্য তাহার মূলে বর্ত্তমান্ আছে,—ইহা জানিবার জন্য দ্বিতীয় কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে, "বরফ শীতল" ইহা যে মূল সত্য নহে কিন্তু স্থূল সত্য—ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে; "বরফ শীতল" এই সত্যটির মূলে অসংখ্য-অসংখ্য সত্য অবস্থিতি করিতেছে; বরফ এক সময়ে সমুদ্রের বাষ্প ছিল; সমুদ্র এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর সহিত বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল; বরফের মূল উপাদানের পরমাণু-সকল সেই বাষ্পরাশির অন্তর্ভূত ছিল; সেই অনির্দ্দেশ্য পরমাণু-রাশি ছাড়া বরফ আর কিছুই নহে; এখন আমরা যে-বরফের পরমাণুকে শীতল দেখিতেছি—সেই পরমাণু তখন উষ্ণ ছিল; যখন বলি যে, বরফ শীতল, তখন তাহার পূর্ব্বতন বাষ্পীয় পরমাণুর সঙ্গে তাহার যে আনুপূর্ব্বিক যোগ চলিয়া আসিতেছে তাহা আমরা আদবেই দেখিতে পাই না; আমরা দেখিতে পাই কেবল একটা আংশিক সত্য—যাহা এককালে ছিল না এবং যাহা ভবিষ্যতে না থাকিলেও না-থাকিতে পারে। সুতরাং "বরফ শীতল" ইহা একটা স্থূল সত্য। আমরা বলি যে, মূল-সত্যের প্রতি আকর্ষণেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং অমরত্ব—স্থূল সত্যে কখনই মনুষ্যের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

আমরা বলি যে, প্রবৃত্তির সম্বন্ধে প্রবৃত্তির নিয়ামক জ্ঞান এক-মাত্র, ও সেই নিয়ামক জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রবৃত্তি নানা; প্রফুল্লকমল বাবু বলেন "আমি ইহা স্বীকার করি যে, ভাল মন্দ বিবেচনা জ্ঞানেরই কার্য্য; কিন্তু জ্ঞান নানা, যেমন প্রবৃত্তিও নানা।" ইহার উত্তরে, কি হিসাবে জ্ঞান এক এবং কি হিসাবে জ্ঞান নানা, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন। জ্ঞান কি হিসাবে এক এবং কি হিসাবে অনেক?

উত্তর। ভগবদগীতা, নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোক-পংক্তিতে, এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

ইহাতে তিন প্রকার বুদ্ধির ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে; (১) বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি (অর্থাৎ যাহা প্রবৃত্তির বশীভূত, (২) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি, এবং (৩) সমাহিত বুদ্ধি অর্থাৎ মূল সত্যে সমাহিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি। এই তিনের মধ্যে ভগবদগীতা কেবল ব্যবসায়াত্মিকা বিষয়-বুদ্ধিকেই "এক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে;—

লিখিবার সময় সকলেই-আমরা চৌত্রিশ অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের কাহারো হাতের লেখা চৌত্রিশ প্রকার নহে—একই প্রকার; আপন আপন হাতের লেখাতে আমরা যেমন একত্ব প্রদান করি—বিষয়-বুদ্ধি সেইরূপ আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্য-সমূহে একত্ব প্রদান করে। ইতিহাস-বেত্তারা নেপোলিয়নের কার্য্যে নেপোলিয়নের বিষয়-বুদ্ধির একত্ব এবং সীজারের কার্য্যে সীজারের বিষয়-বুদ্ধির একত্ব, সুস্পষ্ট প্রতি-

বিস্মিত দেখিতে পা'ন। কাব্য-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, রামায়ণের উত্তর-কাণ্ড বাল্মীকির রচনা নহে, এবং ইহার কারণ দেখা'ন এই যে, সমস্ত গ্রন্থকাণ্ডে বাল্মীকির সরল বুদ্ধির একত্ব যেরূপ মুদ্রাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—উত্তর-কাণ্ডে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। এইরূপ, বিষয়-বুদ্ধি আপনার নানা কার্য্যে একত্ব প্রদান করিয়া সেই একত্বে আপনার একত্ব প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়—দেখিতে পায় যে, যে একত্ব আপনারই দান করা একত্ব সুতরাং তাহা আপনার একত্বেরই প্রমাণ-স্বরূপ, কেননা তাহার আপনার যদি একত্ব না থাকিত তবে অন্য কোন কিছুতে একত্ব দান করা তাহার পক্ষে সম্ভব-সাধ্য হইত না। এইরূপ,—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির কার্য্যেতেই সপ্রমাণ হয় যে তাহা এক; তাই ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।"

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক।

ভগবদ্গীতা ইহাও বলিয়াছেন যে

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে"

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে বিধেয় নহে"; ইহার তাৎপর্য্য কি—নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে:—

এক দিকে যেমন দেখা যায় যে, বিষয়-বুদ্ধি আপনার দান-করা একত্বে আপনার একত্ব দেখিতে পায়, আর-এক দিকে তেমনি দেখা যায় যে, বিষয়-বুদ্ধি যদি মূলে (অর্থাৎ গোড়াতে) এক না হয়, তবে তাহার দান-করা ঐ যে, একত্ব, উহার কোন মূল্যই থাকে না; ব্যাঙ্কে যদি আদবেই নগদ্ টাকা না থাকে, তবে ব্যাঙ্ক্ নোটের কোন মূল্যই থাকে না। স্বীয় কার্য্য-কলাপে বিষয়-বুদ্ধির দান করা যে, একত্ব, তাহা এক জিনিস্; আর, বিষয়-বুদ্ধির মূলের যে, একত্ব, (এক কথায়—আত্মার একত্ব) ইহা আর এক জিনিস্; আত্মার একত্ব আমরা আত্মাতে দান করি নাই কিন্তু আত্মাতে পাইয়াছি; বিষয়-কার্য্যে যেমন আমরা একত্ব দান করি, ঐশ্বরিক কার্য্য-হইতে সেইরূপ আমরা একত্ব গ্রহণ করি; উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, ঐশ্বরিক কার্য্য সূর্য্য, বিষয়-বুদ্ধি চন্দ্র, বিষয়-কার্য্য পৃথিবী, এবং একত্ব আলোক; চন্দ্র পৃথিবীতে আলোক প্রদান করে, কিন্তু সূর্য্য হইতে আলোক গ্রহণ করে;—বিষয়-বুদ্ধি বিষয়-কার্য্যে একত্ব প্রদান করে, কিন্তু ঐশ্বরিক কার্য্য হইতে একত্ব গ্রহণ করে। বিষয়-কার্য্যে একত্ব দান করিবার যে ব্যাপার—তাহাতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির নিজের একত্ব প্রতিবিম্বিত হয়; আর, ঐশ্বরিক কার্য্য-হইতে একত্ব গ্রহণ করিবার যে ব্যাপার, তাহাতে সমাহিত-বুদ্ধির নিজের একত্ব নহে কিন্তু মূল সত্যের একত্ব প্রতিবিম্বিত হয়। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে যে, "আমার একত্ব আছে—তাই আমি একত্ব দান করিতেছি," কিন্তু সমাহিত বুদ্ধি আর এক কথা বলে—এই বলে যে, "একত্ব আমার নহে—একত্ব মূল সত্যের তাঁহা হইতেই আমি একত্ব পাইয়াছি।" এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।" অর্থাৎ সমাধি-ব্যাপারে বিষয়-বুদ্ধি-সুলভ নিজের কর্ত্তৃত্ব খাটে না।

ধর্ম্মবুদ্ধির একত্ব আমাদের নিজ বুদ্ধির একত্ব নহে কিন্তু পরমাত্মার একত্ব; বিষয়-বুদ্ধির একত্বই আমাদের নিজ-বুদ্ধির একত্ব। এখন, জ্ঞান কি হিসাবে এক এবং কি হিসাবে অনেক, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে; (১) ঐশ্বরিক জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে এক; তাঁহা হইতে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াই আমাদের প্রত্যেকজনের আত্মা এক হইয়াছে; (২) বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়-

বুদ্ধি অনেক; (৩) এক ব্যক্তির বিষয়-বুদ্ধি এক, কিন্তু সেই বিষয়-বুদ্ধির ব্যাপার বা ক্রিয়া অনেক, অর্থাৎ তাহা নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়;—এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন ব্যাপারে বিষয়-বুদ্ধির নিজের একই প্রতি-বিম্বিত হয়। ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, আমার অশ্ব-জ্ঞান এবং হস্তি-জ্ঞান একই জ্ঞানের বা একই বুদ্ধির দুই বিভিন্ন ব্যাপার বা ক্রিয়া,—দুই বিভিন্ন বুদ্ধির দুই বিভিন্ন ক্রিয়া নহে।

আমরা বলি জ্ঞান প্রবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ; কৃষ্ণকমল বাবু বলেন "কোন সময়ে প্রবৃত্তি দ্বারা অনিষ্ট হয় বলিয়া জ্ঞানকে প্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলা যেমন ভ্রম, যেমন কোন সময়ে জ্ঞান হইতে অনিষ্ট হয় বলিয়া প্রবৃত্তিকে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলা ভ্রম।" ইহার উত্তর আমরা এই দিই যে, প্রবৃত্তি ভাল হইলেও তাহা অন্ধ এবং মন্দ হইলেও তাহা অন্ধ; আর জ্ঞান ভাল হইলেও তাহা সজাগ—মন্দ হইলেও তাহা সজাগ। ভাল অশ্বও আছে—মন্দ অশ্বও আছে; আবার, ভাল সারথীও আছে—মন্দ সারথীও আছে; কিন্তু অশ্ব কখনও সারথীকে নিয়মিত করে না—সারথীই অশ্বকে নিয়মিত করে; এই জন্য আমরা সারথীকে অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকি। এখন, ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রবৃত্তি অশ্বের সহিত উপমেয়,—সুপ্রবৃত্তি সু-অশ্বের সহিত এবং কুপ্রবৃত্তি কু-অশ্বের সহিত; তেমনি, জ্ঞান বা বুদ্ধি সারথীর সহিত উপমেয়,—সুবুদ্ধি সু-সারথীর সহিত এবং কুবুদ্ধি কু সারথীর সহিত। ধর্ম্ম-বুদ্ধি সু ভিন্ন কু হইতে পারে না; কেবল, বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি উভয়েরই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যে বিষয়-বুদ্ধি ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিরোধী, তাহাই কুবুদ্ধি; আর, যে বিষয়-বুদ্ধি ধর্ম্ম-বুদ্ধির অনুগত, তাহাই সুবুদ্ধি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রবৃত্তির নিয়ামক যে জ্ঞান বা বুদ্ধি, তাহার লক্ষণ কিরূপ?

উত্তর। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছি যে, "অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় সহানুভূতিকেও জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান, অশ্ব-জ্ঞান, হস্তি-জ্ঞান, প্রভৃতি এমন অনেক জ্ঞান আমাদের আছে—প্রবৃত্তি-সংযমের সহিত যাহার কোন সম্পর্কই নাই, এই জন্য উহার অব্যবহিত পরেই আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞান-দ্বারা এইরূপ যে, নিয়মিত করা ইহার দুইটি পদ্ধতি আছে;—(১) বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা, (২) ধর্ম্ম-বুদ্ধি-দ্বারা নিয়মিত করা। বিষয়-বুদ্ধির লক্ষ্য স্বার্থ—ধর্ম্ম-বুদ্ধির লক্ষ্য পরমার্থ।" কুবুদ্ধিও প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে—কুসারথীও অশ্বকে নিয়মিত করিতে পারে—ইহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি, এবং তাহাকে সেরূপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে, ইহাও আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস; এই জন্য আমরা বলিয়াছি যে, প্রবৃত্তিকে বিষয়-বুদ্ধির অধীনে এবং বিষয়-বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-বুদ্ধিও সু ছাড়া কু হইতে পারে না, এবং ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগত বিষয়-বুদ্ধিও সু ছাড়া কু হইতে পারে না; এই জন্য আমাদের কথা অনুসারে স্পষ্টই দাঁড়াইতেছে যে, সুবুদ্ধিকেই প্রবৃত্তির নিয়ামক পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। উপমা-ছলে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্ম-বুদ্ধি সেনাপতি, বিষয়-বুদ্ধি শতপতি (বা কাপ্তেন), প্রবৃত্তি সামান্য সৈনিক। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সৈন্য-দলের নিয়ন্তা হইবার কে উপযুক্ত? তবে তাহার এক উত্তর এই যে, সেনাপতি; আর-এক উত্তর এই যে, সেনাপতির আজ্ঞাধীন শতপতি; এ ভিন্ন, সেনা-

পতির অবাধ্য শক্তপতি সৈন্যদলের নিয়ন্তৃ-পদের যোগ্য হইতে পারে না। কৃষ্ণকমল বাবু বলিতেছেন "জগৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-বিষয়ে সহকারিতা করে যে জ্ঞান, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহাকে জ্ঞান বলেন কি না, জানি না।" ইহার উত্তর এই তাহাকে আমি জ্ঞান বলিব—বুদ্ধি বলিব—কিন্তু তাহার উপর আর একটি কথা এই বলিব যে, যে বুদ্ধি ধর্ম্ম-বুদ্ধির অবাধ্য বিষয়-বুদ্ধি—সেনাপতির অবাধ্য শক্তপতি—তাহা প্রবৃত্তি-রূপ সৈন্যদলের নিয়ামক-পদের অযোগ্য। অনেক সময় ধর্ম্ম-বুদ্ধির অবাধ্য বিষয়-বুদ্ধিকে—অথবা যাহা একই কথা পরমার্থের অবাধ্য স্বার্থকে—প্রবৃত্তির নিয়ামক পদবীতে বলপূর্ব্বক আরূঢ় হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহা হইলে ন্যায়-রাজা তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করেন তাহা অতি পরিষ্কার এবং পরিপাটী; ন্যায় বলেন "তুমি বিষয়-বুদ্ধি—তোমার প্রভু ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে—অমান্য করিয়াছ, ইহার উচিত দণ্ড এই যে তুমি যাহার প্রভু সে তোমাকে অমান্য করিবে, তোমার প্রবৃত্তি-সকল তোমার বশে থাকিবে না।" ন্যায়ের এই বিধান অলঙ্ঘনীয়—তাই ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী বিষয়-বুদ্ধি (এক কথায় কুবুদ্ধি) সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রবৃত্তি-সকলকে বশে রাখিতে পারে না। ধর্ম্মবুদ্ধির অবাধ্য বিষয়বুদ্ধির—দুষ্ট সরস্বতীর—মন্ত্রণা-অনুসারে রাবণ আপনার প্রবৃত্তি-সকলকে দমন করিয়া অনেক কাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে মাত্র ব্রহ্মার বর পাইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন, অমনি তাঁহার প্রবৃত্তি-সমূহ একেবারেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে বিপদ্সাগরে নিমগ্ন করিল। অতএব হয় ধর্ম্মবুদ্ধি স্বয়ং, নয় ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগত বিষয়-বুদ্ধি, এই-দুই বুদ্ধি ভিন্ন আর কোন বুদ্ধিই প্রবৃত্তির নিয়ামক পদের যোগ্য নহে। ইহা আমরা অস্বীকার করি না যে, রথ চালাইতে হইলে সারথীরও যেমন প্রয়োজন—অশ্বেরও তেমনি প্রয়োজন; সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে হইলে জ্ঞানেরও যেমন প্রয়োজন, প্রবৃত্তিরও তেমনি প্রয়োজন; কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথায় সায় দিতে পারি না যে, অশ্ব (অর্থাৎ প্রবৃত্তি) সারথীর (কিনা জ্ঞানের) সমকক্ষ অথবা সারথী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বোধ করি কৃষ্ণকমল বাবু প্রেমকে প্রবৃত্তির মধ্যে ধরিয়াছেন—নহিলে তিনি ওরূপ কথা কখনই বলিতেন না; কিন্তু প্রেম স্বতন্ত্র এবং প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র—ইহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি।

আমাদের শ্বাস দুইরূপ—নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস; আমাদের মনোবৃত্তিও দুইরূপ—নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি; নিশ্বাস যেমন অন্তর্মুখী শ্বাস, নিবৃত্তি সেইরূপ অন্তর্মুখী বৃত্তি; আর, প্রশ্বাস যেমন বহির্মুখী শ্বাস, প্রবৃত্তি সেইরূপ বহির্মুখী বৃত্তি। "নি" উপসর্গ দেখিলেই অনেকে তাহাকে অভাব-বাচক মনে করেন—নিবৃত্তি শুনিবামাত্র বৃত্তি-শূন্যতা মনে করেন—কিন্তু সেটি তাঁহাদের বড়ই ভুল; নিবাস-শব্দেও বাস-শূন্যতা বুঝায় না—প্রবাস শব্দেও প্রকৃষ্টরূপ বাস বুঝায় না; প্রবাস-শব্দে বাড়ির বাহির বুঝায়—নিবাস শব্দে বাড়ির অভ্যন্তর বুঝায়; অতএব নিবৃত্তি অন্তর্মুখী বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি বহির্মুখী বৃত্তি ইহাতে আর ভুল নাই। "নি" উপসর্গ এখানে in-উপসর্গের সহোদর এবং "প্র" উপসর্গ Pro-উপসর্গের সহোদর ইহা দেখিবা-মাত্রই ধরা পড়ে। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি-সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহির্বিষয়ে ব্যাপৃত হয় এই জন্য তাহারা প্রবৃত্তি (অর্থাৎ বহির্মুখী বৃত্তি) শব্দের বাচ্য। বিষয়-বুদ্ধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়-ভোগে ব্যাপৃত হয় না,

পরন্তু "যাবজ্জীবন সুখে অতিবাহন করিব" এই উদ্দেশ্যটির সাধনে ব্যাপৃত হয়। ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধি-অপেক্ষা আরো উচ্চ অঙ্গের বৃত্তি—ইহা নিতান্তই অন্তর্মুখী বুদ্ধি-বৃত্তি; ইহার লক্ষ্য বহির্ব্বিষয়ের দিকেও নহে—বিষয়-জড়িত বিষয়ীর দিকেও নহে; ইহার লক্ষ্য ন্যায়ের দিকে—সর্ব্ব-মূলাধার মূল সত্যের দিকে—পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের দিকে—অন্তরতম পরমাত্মার দিকে; এইরূপ অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি প্রবৃত্তি-শব্দের বাচ্য নহে—নিবৃত্তি-শব্দেরই বাচ্য; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশুদ্ধ প্রেম প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি?

বিশুদ্ধ প্রীতি বিশুদ্ধ বুদ্ধির বামে এক সিংহাসনে বসিয়া আছে—সুতরাং তাহাও নিবৃত্তি-শব্দের বাচ্য। বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে ভাল বাসে—আপনি আপনাকে ভালবাসে—আপনাকে আপনার সম্মুখে আবির্ভূত দেখিলে (অর্থাৎ মনুষ্য পশু পক্ষী তরু লতা গিরি নদী সাগরে প্রতিফলিত দেখিলে) আনন্দিত হয়; এই যে বিশুদ্ধ ভালবাসা ইহাতে বিষয়ের আকর্ষণ নাই—প্রবৃত্তির অধীনতা নাই। বিশুদ্ধ বুদ্ধির একরূপ অমায়িক সৌন্দর্য্য আছে;—তাহা কখনও শিশুর সুকোমল মুখের সরল হাস্য-ছটায় নবোন্মেষিত দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও যুবার প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডলে বিকসিত দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও বৃদ্ধের প্রসন্ন ললাটে সমাহিত দেখিতে পাওয়া যায়;—বিশুদ্ধ বুদ্ধি—আপনারই এই সৌন্দর্য্যের প্রতি—আপনারই প্রতি—আপনি আকর্ষণ অনুভব করেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধির এই যে আকর্ষণ ইহাই বিশুদ্ধ প্রেম—প্রবৃত্তির যে আকর্ষণ তাহা কাম; এই জন্য বিশুদ্ধ প্রেম শাস্ত্রে নিষ্কাম শব্দে উক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি আপনাকে আপনি প্রীতি করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে এবং অন্যেতেও যখন আপনার অন্তরতম বিশুদ্ধ ভাব প্রতিবিম্বিত দেখে তখন অন্যকেও প্রীতি করে; মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করে; আবার যখন আমরা আমাদের আত্মাকে স্বার্থের পঙ্ক-পাতিতা এবং বিষয়-কামনার অধীনতা হইতে পরিশূন্য করি, তখন তাহা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিরালম্ব মূল-সত্যে গিয়া ঠেকে—তখন তাহা অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রেমে আনন্দ হইয়া পড়ে; এবং হিমালয়ের উচ্চশিখর হইতে যেমন ভাগীরথী অবতীর্ণ হন, সেইরূপ সেই প্রেম আত্মার উচ্চতম শিখর হইতে জন-সমাজে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক মঙ্গলে প্লাবিত করে। এইরূপ অন্তর্মুখী বিশুদ্ধ প্রেমকে বিশুদ্ধ বুদ্ধির সমকক্ষ বলিলে তাহাতে বাহ্যতো কোন আপত্তি থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহাকে প্রবৃত্তির সমকক্ষ বলিলে বিশুদ্ধ প্রেমকে নিতান্তই হীন করিয়া ফেলা হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বিষয়াসক্তি প্রবৃত্তির সহধর্ম্মিণী: আপনার প্রতি ভালবাসা (সুতরাং আপনার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা) বিষয়-বুদ্ধির সহধর্ম্মিণী: ন্যায়, মূল-সত্যের প্রতি ভালবাসা (সুতরাং সমস্ত জগতের প্রতি ভালবাসা) ধর্ম্ম বুদ্ধির সহধর্ম্মিণী।

কৃষ্ণকমল বাবু জ্ঞানের সহিত প্রবৃত্তির সমকক্ষতা রক্ষা করিবার মানসে বলিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তি-গুলির কার্য্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দেওয়া, জ্ঞানের কার্য্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় অবধারণ করা।" এ কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা দেখিতেছি যে, প্রবৃত্তি কেবল আপনার চরিতার্থতা লইয়াই ব্যস্ত, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করা তাহার নিতান্তই অধিকার-বহির্ভূত। ক্ষুধাতুর পথ-হারা পথিক যখন কোন ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়, তখন সে ভাবে

না "কল্য আমি কি খাইব;" "এখন—এই মুহূর্ত্তে কিছু খাইতে পাইলে বাঁচি" এই তাহার একমাত্র ভাবনা, এ অবস্থায় কোথায় যাইতে হইবে কি করিতে হইবে সমস্ত উদ্দেশ্যই তাহার [illegible] অন্তর্দ্ধান করে। যখন আমাদের [illegible] কাম-ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে [illegible] হইয়া উঠে তখন আমরা আমাদের [illegible] উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যাই; জ্ঞান আমাদিগকে সেই উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দিয়া সেই সব প্রবৃত্তিকে দমন করিবার বিশেষতা প্রদর্শন করে। বিষয় বুদ্ধি বলে "প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে তোমার স্বার্থ-হানি হইবে," ধর্ম্মবুদ্ধি বলে "ওরূপ করিলে তোমার আত্মার নির্ম্মল শ্রী কলুষিত হইয়া যাইবে—তোমার মনুষ্যত্বে দোষ পৌঁছিবে।" মনুষ্যত্ব যে কি তাহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনো বলিতেছি—মূল সত্যের প্রতি আত্মার আকর্ষণই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—তাহা কুকুরেরও নাই—অশ্বেরও নাই—হস্তীরও নাই। কোন কুক্কুর যদি মূল সত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তবে তাহাকে আমরা বলিব "বাহিরে কুকুর,—ভিতরে মনুষ্য।"

আমরা বলি যে, ধর্ম্ম-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থির সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণকমল বাবু বলেন যে, "ধর্ম্ম-বুদ্ধি শব্দ Conscience এই শব্দের অনুবাদ হয়, তাহা হইলে তাহা স্বভাবসিদ্ধ হউক্ আর না হউক, ইহাও অন্ধ অর্থাৎ অনেক সময়ে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ত্তব্য করে।" ইহার মীমাংসা নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে;—

ধর্ম্মের বুদ্ধি এক পদার্থ এবং ধর্ম্মের অনুরাগ এক পদার্থ, জ্ঞান এক পদার্থ—প্রেম এক পদার্থ। বিষয়-বুদ্ধি যখন পরস্ব-অপহরণকে স্বার্থ-সাধন মনে করিয়া সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি সকলকে নিয়োজিত করে, ধর্ম্মবুদ্ধি তখন তাহাকে সুধীর স্বরে বারণ করে, ধর্ম্মবুদ্ধি বলে "তুমি করিতে যাইতেছ এক—করিতেছ আর; করিতে যাইতেছ স্বার্থ-সাধন—করিতেছ অনর্থ-সাধন! সমস্ত জগৎ ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত—সেই ন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি হস্ত উত্তোলন করিতেছ!—সাবধান! জগৎ-মন্দিরে দেবতা জাগিতেছেন—হৃদয় মন্দিরে দেবতা জাগিতেছেন—তিনি নিনিদ্র!" কৃষ্ণকমল বাবু হয় তো বলিবেন যে, ধর্ম্ম-বুদ্ধির এই যে কথা—এ এক প্রকার ভয়-দেখানে কথা,—ধাত্রী যেমন শিশুকে জুজুর ভয় দেখাইয়া চাপল্য হইতে নিরস্ত করে—ইহাও সেইরূপ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে;—ন্যায়কে কেবল যে আমরা ভয় করি তাহা নহে, কিন্তু ন্যায়কে আমরা আন্তরিক ভাল বাসি; আমাদের কোন প্রিয় পাত্রের প্রতি কেহ হস্ত উত্তোলন করিলে যেমন আমাদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, ন্যায়ের বিরুদ্ধে কেহ হস্ত উত্তোলন করিলেও আমাদের মনের ভাব ঠিক্ সেইরূপ হয়। কোন পতি যদি দৈবাৎ ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইয়া আপনার প্রিয়তমা পত্নীর সমক্ষে মুখ দেখাইতে ভয় ও সঙ্কোচ করে, তবে ভালবাসা সে ভয়ের ভিত্তিমূল—ইহা সুস্পষ্ট; সেইরূপ,—আমরা যখন স্বার্থের পরামর্শ শুনিয়া ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করি, তখন আমরা আপনারা আপনাদের অন্তরাত্মার নিকটে মুখ দেখাইতে ভীত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হই, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, ন্যায়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক টান আছে। সেই যে ন্যায়, তাহা ধর্ম্মবুদ্ধির প্রদর্শিত; এবং ন্যায়ের প্রতি সেই যে আন্তরিক টান তাহা conscience নামক ধর্ম্মানুরাগী চিত্তবৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-বুদ্ধি ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব সকলের (অর্থাৎ Moral principles) ইহা-

দের) আলয়, conscience ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত সুখ দুঃখের আলয়; এ জন্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে conscience বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের সৌন্দর্য্যানুরাগ যেমন পুষ্পের প্রতি স্বভাবতই অনুরক্ত এবং কুজ্ঝটির প্রতি স্বভাবতই বিরক্ত; Conscience, সেইরূপ ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও তাহার কার্য্যের প্রতি স্বভাবতই অনুরক্ত, এবং অধর্ম্ম-বুদ্ধি ও তাহার কার্য্যের প্রতি স্বভাবতই বিরক্ত। তবে সংসর্গ ও সংস্কারের প্রভাবে Conscience এর স্বভাব কিয়ৎ কালের জন্য বিগড়াইয়া যাইলেও যাইতে পারে।

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের শিরোভূষণ কান্ট বুদ্ধি-বৃত্তি (Intellect) ব্যতীত আর একটি আভ্যন্তরিক বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি তাহার নাম দিয়াছেন "Internal sense" অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়; এই অন্তরিন্দ্রিয়কে কবিরা বলেন হৃদয়, দার্শনিকেরা বলেন চিত্ত। চিত্ত সুখ দুঃখের আলয়। বহির্বস্তুর ক্রিয়া দ্বারা যে মন আমাদের বহিরিন্দ্রিয়—এবং তাহার সঙ্গে আমাদের চিত্ত উপরক্ত (affected) হয়, সেইরূপ আবার আমাদের বুদ্ধি ক্রিয়া-দ্বারাও আমাদের চিত্ত উপরক্ত হয়,—বিষয়-বুদ্ধি-দ্বারাও উপরক্ত হয়—ধর্ম্ম-বুদ্ধি-দ্বারাও উপরক্ত হয়। ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিরোধে চলিয়াও যখন বিষয়-বুদ্ধি কোন অভীষ্ট বস্তু লাভ করে, তখন "অমুককে কেমন জব্দ করিয়াছি—কেমন ঠকাইয়াছি—আমি কেমন বুদ্ধিমান্" এই বলিয়া চিত্তে একরূপ বিষাক্ত আসুরিক আনন্দ উপস্থিত হয়; আবার, যখন ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধিকে আপনার অধীনে চালাইয়া কোন ইষ্ট লাভ করে, তখন "আমি একটা কাজের মত কাজ করিয়াছি" এই বলিয়া চিত্তে একরূপ অমৃতময় দিব্য আনন্দ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আসুরিক আনন্দ-দ্বারা আমাদের চিত্ত কলুষিত হয়, এবং শেষোক্ত দিব্য আনন্দ-দ্বারা আমাদের চিত্ত সুপ্রসন্ন হয়। আমাদের চিত্ত যদি কখনও কোন পাত্রকে বিষকে অমৃত—অধর্ম্মকে ধর্ম্ম—মনে করে, তবে তজ্জন্য আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি অপরাধী নহে। ইন্দ্রিয়ও আমাদের চিত্তের উপর কার্য্য করে—বিষয়-বুদ্ধিও আমাদের চিত্তের উপর কার্য্য করে—ধর্ম্ম-বুদ্ধিও আমাদের চিত্তের উপর কার্য্য করে; তাহার মধ্যে আমাদের চিত্ত যদি কুসংস্কারের বা কুসঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্তির দিকেই অথবা বিষয়-বুদ্ধির দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়, তবে তাহাতে মনুষ্যের অপূর্ণতাই প্রকাশ পায়—ধর্ম্ম-বুদ্ধির অপরাধ প্রকাশ পায় না। জাহাজের নাবিক যদি নির্দ্দেশ-পত্র (chart) অবজ্ঞা করিয়া আপনার অভিরুচি মতে জাহাজ চালায়, তবে সে দোষ কিছু আর নির্দ্দেশ-পত্রের নহে—সে দোষ নাবিকের। ফল কথা এই যে আমাদের সম্মুখে—গম্য স্থানে যাইবার একটি মাত্র সরল পথ আছে এবং অনেক বক্র পথ আছে—কোনোটা বা অধিক বক্র—কোনোটা বা অল্প বক্র; সেই যে একটি-মাত্র সরল পথ তাহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধির অভিপ্রেত পথ। কখনও কাহারো প্রতি শাঠ্য করিবে না, ইহাই সরল পথ; শঠে শাঠ্য করিবে—ইহা তাহা অপেক্ষা বক্র পথ; দেশের উপকারের জন্য শাঠ্য করিবে—ইহা আরো বক্র পথ; আপনার লাভের জন্য শাঠ্য করিবে—ইহা ততোধিক বক্র পথ; কৌতুক দেখিবার জন্য শাঠ্য করিবে—ইহা ততোধিক;—ধর্ম্ম-বুদ্ধি কেবল ঐ প্রথম পথটি অবলম্বন করিতে বলে, অবশিষ্ট সকল-পথই অগ্রাহ্য করে। আবার, ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথা না শুনিয়া কেহ যদি বক্র পথ অবলম্বন করে, তখনও ধর্ম্ম-বুদ্ধি তাহাকে সরল পথে

ফিরাইয়া আনিবার জন্য অপেক্ষাকৃত বক্র-বক্র পথ অবলম্বন করিতে বলে। এখনকার সেরূপ সমাজ তাহাকে ধর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রদর্শিত ঠিক্ সরল পথটি অবলম্বন করা লোকের পক্ষে দুরূহ; এ সময় কোন লোক যদি বক্র পথ অবলম্বন করিয়া [illegible] তাহা নিন্দনীয় হয় না। [illegible] শঠে শাঠ্যং করিয়া [illegible]—লোকে বলে "বেশ ঠিক করিয়াছে—যেমন [illegible] তেমনি হই-য়াছে—[illegible]" কিন্তু লোকে যাহাই বলুক না কেন—ধর্ম্ম-বুদ্ধির মুখে এক ভিন্ন দুই কথা নাই। ধর্ম্ম-বুদ্ধি ঠিক সরল পথটি অবলম্বন করিতে বলে—ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে। সেই সরল পথটি অবলম্বন করিতে হইলে এক-দিকে ন্যায়বান ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে স্থির রাখা আবশ্যক, আর-এক দিকে বিষয়-বুদ্ধিকে সেই ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে চালনা করা আবশ্যক। অত্যাচারী রাজা যখন প্রজা পীড়ন করিতেছে, তখন আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি এক দিকে এই বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা করে যে, "উপরে ঈশ্বর আছেন," আর এক দিকে সেই রাজার অত্যাচার নিবারণার্থে বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে বলে; কিন্তু আমরা যদি সেই রাজাকে অন্যায় রূপে হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করি, তবে ধর্ম্ম-বুদ্ধি আমাদিগকে বলে

"ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ"

"পাপাচারীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না—সর্ব্বদাই সাধু থাকিবে।" যিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের উপদিষ্ট সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলেন এরূপ লোক পৃথিবীতে অতি দুর্লভ; বিষয়-বুদ্ধির ক্ষেত্রে যেমন নেপোলিয়ন দুর্লভ, ধর্ম্ম-বুদ্ধির ক্ষেত্রেও সেইরূপ অজেয় ধর্ম্ম-বীর দুর্লভ;—কিন্তু তাহা বলিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রদর্শিত মূল-তত্ত্ব-সকলের এক চুলও এদিক্-ওদিক্ হইতে পারে না।

ধর্ম্ম-বুদ্ধির নিতান্ত অবাধ্য হইলে কেহ যে, অমনি অম্লান পার পাইয়া যাইবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। আমাদের কোন-একটি প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইলে যেমন আমাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সেইরূপ আমাদের কাহারো স্বার্থ উচ্ছৃঙ্খল হইলে ন্যায়ে আঘাত লাগে; এবং সেই আঘাতের প্রতিঘাত স্বরূপে পরিণামে দাঁড়ায় এই যে, স্বার্থ যেমন আপনার প্রভু ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, সেই দৃষ্টান্ত-অনুসারে স্বার্থের অধীনস্থ প্রবৃত্তি-সকল ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়া স্বার্থকে ঘোর বিপদে ফেলে। ন্যায়ের প্রতিঘাতেই রোম-নগর অপহৃত ধন-ভারে ধরাশায়ী হইয়াছিল—স্পেন্ এবং পোর্টুগাল্ আমেরিকার রুধিরাক্ত স্বর্ণ ভারে অধঃপতিত হইয়াছে—আর কাহার ভাগ্যে কি আছে ভবিষ্যতের ইতিহাসই তাহা বলিতে পারে। স্বার্থের দেবতা—আমার আমি, তোমার তুমি, প্রতিজনেরই বিভিন্ন; কিন্তু ন্যায়ের দেবতা আমারও যিনি—তোমারও তিনি—সকলেরই এক।

"একো দেবঃ সর্ব্ব-ভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা"

"এক দেবতা সর্ব্ব-ভূতে নিগূঢ়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা।" আমি না থাকিলে যেমন আমার প্রবৃত্তি-সমূহকে আট্কাইয়া রাখিবার বাঁধ থাকে না, এক কথায়—স্বার্থ থাকে না, সেইরূপ—ন্যায়ের জাগ্রত দেবতা মূল-সত্তা না থাকিলে নানা ব্যক্তির নানা স্বার্থকে আট্কাইয়া রাখিবার বাঁধ থাকে না, এক কথায়—পরমার্থ থাকে না—ধর্ম্ম থাকে না; উপনিষদে তাই আছে

"স সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"

লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে তিনি বিধরণ

সেতু অর্থাৎ আট্‌কাইয়া রাখিবার বাঁধ। তবেই হইল যে, মূল-সত্যকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম হইতেই পারে না। অতএব, আমি নাই অথচ স্বার্থ সাধন করিতে হইবে—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা নাই অথচ পরমার্থ সাধন করিতে হইবে—এ কথা শুনিয়া যদি কাহারো মনে হয় "মাথা-নাই-তার-মাথা-ব্যথা" তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মের মূল কথা তিনটি ;—(১) সামান্য লৌহকে যেমন প্রকরণ বিশেষ দ্বারা শোধিত করিয়া চিক্কণ লৌহ (ইস্পাৎ) করিয়া তোলা হয় সেইরূপ বিষয়-বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা শোধিত করিয়া শুভ বুদ্ধি করিয়া তোলা কর্ত্তব্য ; ইহাই পারমার্থিক ধর্ম্ম-সাধন ; (২) সেই শুভ বুদ্ধি অনুসারে বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য ; ইহাই সাংসারিক ধর্ম্ম সাধন ; (৩) পারমার্থিক ধর্ম্ম এবং সাংসারিক ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে যথোচিত সম রাখিয়া গেলেই ধর্ম্ম সাধন সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পন্ন হয় ;—ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ।

ভারতী।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপু সংযম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

লোভ।

সংসার-ধর্ম্ম-নির্ব্বাহ জন্য যে সকল পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য, তাহা পাইবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে একটী প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মানুষ সে প্রবৃত্তি নিয়মিত করিতে না পারিয়া, তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম-সিদ্ধ ব্যবহার করিতে না পারিয়া তাহাকে লোভে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। লোভ আমাদিগের উক্ত প্রবৃত্তির বিকৃত ভাব, উহার ব্যভিচারের ফল। সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য, পৃথিবীতে আত্মার মন্দির শরীরকে রক্ষার জন্য আমাদিগের যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা আহরণার্থ ঈশ্বর যে বাসনা দিয়াছেন, ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া আমরা তাহা পালন করিব, ঈশ্বরের ইহাই উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া আমরা আমাদিগের ঐ বাসনা চরিতার্থ করিবার অধিকারী। কিন্তু আমরা সেই বাসনাকে অন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া তাহাকে লোভে পরিণত করিয়া ফেলি। এই লোভ রিপু সাংসারিক সুখ সম্পত্তি লাভের জন্য আমাদিগকে ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রলুব্ধ করে। ধর্ম্মানুসারে সাংসারিক সুখ সম্পত্তি লাভের প্রবৃত্তি ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম-নিয়মের লঙ্ঘনকারী যে পাপজনক লোভ রিপু তাহা ঈশ্বর-প্রদত্ত নহে। অতএব লোভ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ধর্ম্মানুসারে সাংসারিক সুখ সম্পত্তি লাভ করিবার যে ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রবৃত্তি তাহা আমাদিগের মঙ্গলেরই কারণ, কিন্তু সেই প্রবৃত্তির বিকৃত ভাব এই যে লোভ রিপু তাহা আমাদিগের শরীর, মন ও আত্মার অনিষ্টকারী। যে ব্যক্তি লোভের বশীভূত সে সুখ স্বচ্ছন্দতার নিদানভূত যে অর্থ তাহা লাভ জন্য নানা পাপ-কার্য্যে রত হয়। লোভী ব্যক্তি অর্থ লাভ জন্য বিবেকের বাণী অগ্রাহ্য করে, কর্ত্তব্য-বোধকে জলাঞ্জলি দেয়; স্নেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি কোমল উচ্চ প্রবৃত্তির মস্তকে পদাঘাত করে, এবং এইরূপে নরহত্যা, চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি নানা ঘোর পাপে নিমগ্ন হয়। বলিতে গেলে এমন পাপ নাই, এমন অধর্ম্ম কার্য্য

নাই যাহা লোভ-পরবশ ব্যক্তি ধনতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য না করিতে পারে। এই জন্য লোভী ব্যক্তির আত্মার সর্ব্বনাশ হয়—সে ঘোর আধ্যাত্মিক দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তির মন সর্ব্বদা ধন লাভের প্রতি নিবিষ্ট থাকাতে, অর্থ লাভ তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়াতে, তাহার কখনই মানসিক বৃত্তি নিচয়ের উন্নতি সাধন জন্য উপযুক্ত মত উদ্যম ও চেষ্টা পায় না এবং তজ্জন্য আবশ্যক মত সময়ও ব্যয় করিতে পারে না, সুতরাং সে কখনই সম্যক্ মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সম্যক্ মনের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক লোভী ব্যক্তির মন অতি হীন ও নীচ হইয়া পড়ে। লোভী ব্যক্তি ধনলাভের জন্য অপরের ব্যক্তির অন্যায় তোষামোদে প্রবৃত্ত হইয়া এবং সতত স্বীয় স্বাধীনতা ও আত্ম সম্মান পরের পদে বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় মনের হীনতা ও নীচতার পরিচয় দেয়। ধনের ন্যায় হীন ও অসার পদার্থ যাহার চিন্তার প্রধান বিষয়, আনন্দের প্রধান কারণ, এবং আদরের প্রধান বস্তু হয়, তাহার মন কতদূর হীন ও নীচ হইয়া পড়ে সহজেই তাহা বুঝা যায়। লোভ-রিপু পরবশতা জন্য মানুষের আত্মা ও মনই যে কেবল এইরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, তাহার শরীরও অস্বাস্থ্য ও অবনতির ভাগী হয়। আমাদিগের আত্মা ও মনকে যাহা এরূপ বিকৃত ও অবনত করিতে পারে তাহা আমাদিগের শরীরের অবনতি না করিয়া থাকিতে পারে না। আত্মা ও মনের সম্বন্ধে যাহা অনিষ্টকারী, শরীরের সম্বন্ধেও তাহা অনিষ্টকারী হইয়া থাকে, ইহা মানুষের অভিজ্ঞতা ও শারীরতত্ত্ববিদ্দিগের অনুসন্ধান এক-বাক্যে প্রচার করিতেছে। উপরে আমরা আত্মা ও মনের উপর লোভ রিপুর যেরূপ কু-প্রভাব দেখাইয়াছি, শরীরের উপরও তাহার কু-প্রভাব তদনুযায়ী। শরীরের উপর লোভ রিপুর ফল সম্বন্ধে একজন শারীরতত্ত্ববিদ্ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—Avarice lessens the healthful vigour of the heart, and reduces the energy of all the important functions of the economy under its noxious influence the cheek turns pale, the skins becomes prematurely wrinkled, and the whole frame appears to contract to meet as it were, the littleness of its avaricious soul* ইহার মর্ম্ম এই; "লোভ হৃৎপিণ্ডে স্বাস্থ্যপূর্ণ বল এবং শরীরের সমুদায় প্রধান প্রধান যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয়। এই রিপুর অনিষ্টকারী প্রভাবে গণ্ডদেশ বিবর্ণ হইয়া যায়, শরীরের চর্ম্ম অকালে লোল হইয়া যায়, এবং ঐ ব্যক্তির লোভী আত্মার ক্ষুদ্রতার সমকক্ষ হইবার জন্য দেহ খানিও যেন দিনে দিনে সঙ্কুচিত হইতে থাকে।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান উপদেশ এই যে সাংসারিক সুখ সম্পত্তি ধর্ম্মানুসারে লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে যে প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন সর্ব্বদা তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেক। সেই প্রবৃত্তির ধর্ম্ম-বহিভূর্ত, অন্যায় ও অপরিমিত ব্যবহার করিয়া তাহাকে কখনও বিকৃত করিয়া লোভ রিপুতে পরিণত করিবেক না; যদি তুমি তাহা কর তাহা হইলে তোমাকে শরীর মন আত্মার দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া নানা যন্ত্রণা পাইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;—

"লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ।"

অর্থাৎ "লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক।" লোভী ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না। লোভী ব্যক্তির হৃদয়ে সর্ব্বদা নানা দ্রব্যের প্রতি লোভের উদয় হয়, কিন্তু মানুষের শক্তি খর্ব্বতা প্রযুক্ত ও নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ সে কখনই তাহার লোভ-

* Dr William Sweetser's mental hygiene P. 52

নীয় সকল বস্তু লাভ করিতে পারে না, সুতরাং তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা অসুখ ও অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে। অপরিতৃপ্ত বাসনার যন্ত্রণা এবং লোভ-রিপু-পরবশতার জন্য তাহাকে যে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির ভাগী হইতে হয় তাহার জন্য কষ্টে মানবজীবন তাহার নিকট কেবল দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হয়। লোভ পরিবর্জ্জন সুখের একটী প্রধান কারণ এই জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলিয়াছেন ;

"লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন—

"লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।"

অর্থাৎ "লোভ অনন্ত ব্যাধি।" লোভ আত্মার একটী বিষম ব্যাধি। ব্যাধির দ্বারা যেমন শরীর অপবিত্র ও বলহীন হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি লোভের বশ হইয়া নরহত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি নানা পাপে নিমগ্ন হয়, তাহার আত্মা তেমনি অপবিত্র ও বলহীন হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। এই লোভরূপ ব্যাধি হইতে আত্মার অশেষ অকল্যাণ উপস্থিত হইতে পারে, আত্মার অনন্ত দুঃখের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন ;

"লোভোব্যাধিরনন্তকঃ।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন—

"বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনোযস্তেন লোকত্রয়ং জিতং।"

"যিনি পরস্ত্রীতে বিরত যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ যিনি দম্ভমাৎসর্য্য-বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।" যে ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য ও সুখসম্পত্তি দেখিয়া তাহার প্রতি লোভাসক্ত হয়, সে সেই লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য সকল প্রকার পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার মহা অনর্থ সাধন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যে পরের ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভাসক্ত হয় না, সে আপনার নানা অনর্থের পথ রুদ্ধ করিয়া লাভবান হইয়াছে। পরদ্রব্যের প্রতি লোভাসক্ত হইলে মানুষ স্বীয় শরীর মন আত্মার বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু সেই আসক্তি দমন করিলে তাহার সে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং যে ব্যক্তি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ সে পরদ্রব্যে স্পৃহাবিত ব্যক্তির সহিত তুলনায় যে ইষ্ট লাভ করে তাহা ত্রিলোকের উপর জয়লাভ করার সমতুল্য। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন—

"বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু
দম্ভমাৎসর্য্যহীনোযস্তেন লোকত্রয়ং জিতং।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন ;—

"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্।
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥"

"মানসিক, বাচনিক এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন এবং ঈশ্বরেতে ও পরকালেতে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক দুষ্কর্ম্ম।" চিন্তা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি পাপ চিন্তা করে, সে পাপকার্য্যে প্রায়ই রত হয়। পাপের আলোচনা প্রায়ই পাপ-কার্য্যে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি মনে মনে পরদ্রব্য লাভের আলোচনা করে তাহার প্রতিক্ষণেই ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পরদ্রব্য লাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে পরদ্রব্য লাভের আলোচনাকে অশুভ-ফলপ্রদ মানসিক কুকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম যিনি তিনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া, ধর্ম্মের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য, আত্মার মন্দির শরীরকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য যে সকল পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন করিবেন এবং তাহার

যথোচিত ব্যবহার করিবেন। তিনি কখন ধর্ম্মানুসারে সাংসারিক সুখসম্পত্তি লাভের ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রবৃত্তিকে বিকৃত করিয়া তাহাকে লোভে পরিণত করিবেন না এবং লোভের বশীভূত হইয়া নানা পাপ-কার্য্যে রত হইয়া আপনার শরীর মন আত্মার অগতি সাধন করিবেন না। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া, লোভের অধীন হয়েন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মনামের অবমাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃত রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের

ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

উনবিংশ ব্যাখ্যান।

পরম ঈশ্বরে, যে দেখে অন্তরে, সেই সে তাঁহারে পায়।
তাঁর কার্য্য করে, তাঁর বাক্য ধরে, জানি তাঁর অভিপ্রায়।

নিখিল ভুবনে, অযুত তপন,
অযুত তারকা ভাসে।
কতই চন্দ্রমা, নয়ন-রঞ্জন,
বিতরিয়া সুধা হাসে॥
গগনে গগনে, শত চন্দ্র রবি,
ধূমকেতু গ্রহ চয়।
তাঁহার মহিমা, অসীম অপার,
তার স্বরে এই কয়॥
নদী কল্লোলিনী, ভূধর [illegible],
পুষ্প রাজি মনোহরা।
তরুণ অরুণ, চাঁদের কিরণ,
কত শোভা ধরে ধরা॥
নদীর লহরী, পাখির কাকলী,
নিশির শিশির মাঝে।
তাঁরি সুমঙ্গল অপরূপ লীলা,
তাঁর দয়া সুবিরাজে॥
মনোহর সাজে, সজ্জিত কেমন,
রচনা গভীর তাঁর॥

তাঁহার প্রেমের মঙ্গল [illegible],
ঘোষিতেছে অনিবার॥
হে মানব! [illegible], হৃদরে তোমার
সে-প্রেম তপন করে।
তাঁহার প্রীতির পবিত্র কুসুম
ফুটিতেছে হর্ষ-ভরে॥
সাধক তাঁহারে, পিতা মাতা প্রভু,
হৃদয়ের ধন জানে।
হৃদয় আসনে, রাখিয়া তাঁহারে,
চলে সে তাঁহার টানে॥
হৃদয়ের স্বামী, অনাথের নাথ,
যে তাঁর শরণ চায়।
স্বরগের বল, স্বরগের মতি,
তাঁহার নিকট পায়॥
হৃদয়ের রোগ, মোহের কালিমা,
হরেন করুণা করি।
যে ডাকয়ে তাঁরে, সংসার সঙ্কটে,
দেন তারে পদ-তরী॥
কঠিন কপাট, হৃদয়ের খোল,
ডাক তাঁরে হৃদাসনে।
হৃদয়-ঈশ্বর, বসাও তাঁহারে,
প্রিয় তাঁর নিকেতনে॥
যে জীবন হয়, তাঁহ'তে বঞ্চিত,
সে জীবন বৃথা হয়।
এক ক্ষণো যদি, রাখ তাঁরে হৃদি,
সেইক্ষণ সুধাময়॥
ফুরাল ফুরাল জীবনের খেলা,
ভ্রম কেন অকারণ?
যাঁহারে পাইলে, জনম সফল
লও তাঁর শ্রীচরণ?
অসীম আকাশে, কত রবি শশী
কত গ্রহ কত তারা।
তাঁহার অঙ্কিত রেখায় কেমন
সুশৃঙ্খলে চলে তারা॥
তুমিও সেরূপ, হইয়া সংযত,
চল এবে তাঁর পথে।
[illegible], লয়ে নিজ [illegible]
[illegible] তাঁরে [illegible]॥
[illegible] এ শরীর মন
[illegible]

তাঁর কাযে দাও দেহ মন সঁপিয়া,
জনম সফল হবে॥
তাঁর কায বলে, যদি দীনে অন্ন
এক মুষ্টি কর দান।
সে দান ঈশ্বর, করেন গ্রহণ,
হেন কার্য্য তিনি চান॥
বলো মান তরে, কর বহু দান,
কি লাভ তোমার তাঁতে।
বাড়ে অহং মতি, ছাড় ছাড় তাহা,
ঈশ্বর নহেন যাঁতে॥
সুবিমল চিতে, তাঁরে ডাকি ঘন,
তাঁর কাযে দাও প্রাণ।
বলিয়া দিবেন, যেবা কার্য্য তাঁর,
থাকি হৃদি বর্ত্তমান॥

ক্রমশঃ।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১। শকাব্দা ১৮০২।

২৯ আশ্বিন—প্রত্যহ আমার আলয়ে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। অদ্য চারিটার সময় বাহিরের লোকের সঙ্গে উক্ত উপাসনা করি। আমি উপাসনা করি, কা বাবু প্রার্থনা করেন এবং দ্বা, বাবু গান করেন। আমি বলিলাম যত প্রকার রোগ আছে অর্থাৎ সামাজিক রোগ, রাজনৈতিক রোগ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রোগ ইহাদিগের প্রত্যেকের ঔষধ আছে। সকল রোগের পরম ভিষক পরমেশ্বর। তিনি ভিষকের ভিষক। তিনি বৈদ্যনাথ—তিনি প্রকৃত বৈদ্যনাথ। এই বৈদ্যনাথ-তীর্থে সেই প্রকৃত বৈদ্যনাথের উপাসনা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। উপাসনার পর শ্রীযুক্ত রাজকুমার পাণ্ডা উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে বৈদ্যনাথের পূজায় যে প্রকার পেঁড়া ব্যবহৃত হয় সেই প্রকার পেঁড়া স্বহস্তে বণ্টন করিলেন। ইনি ব্যবসায়ী পাণ্ডাদিগের মধ্যে একটু উদার।

২ কার্ত্তিক—অদ্য প্রাতঃকালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে বৈদ্যনাথের মন্দির দেখিতে যাই। তথায় রাজেন্দ্র বাবু প্রত্যেক দেবমন্দিরের প্রাচীরস্থ সমস্ত চিত্রফলকের প্রতিকৃতি কাগজের উপর তুলিয়া লয়েন। এই সকল প্রতিকৃতি পাঠক তাঁহার প্রণীত পুরাবৃত্তের উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত-পুস্তিকায় দেখিতে পাইবেন। ঐ পুস্তিকা প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় অনেক সংবাদে পূর্ণ।

৩ কার্ত্তিক—অদ্য কা, বাবুর সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি বলি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ মহৎ স্বভাবের একটি লক্ষণ।

৫ কার্ত্তিক—অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীতীরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। কা, বাবু ও আমি আমরা উভয়ে প্রার্থনা করি, দ্বা বাবু গান করেন। আমি উন্নত-মস্তক বৃক্ষরাজির ন্যায় ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে, গিরির ন্যায় স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য বিশিষ্ট হইতে এবং স্রোতস্বতী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে সেইরূপ তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে আত্মার যে বল আবশ্যক তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। কা, বাবু সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক বৎসরের পর দেবগৃহে আসিয়া সেই সকল বন্ধুর সহিত পুনরায় সম্মিলিত হইয়া একপ উপাসনা করিতে ঈশ্বর তাঁহাকে সমর্থ করিলেন তজ্জন্য সেই মঙ্গলময় পুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

১০ কার্ত্তিক—অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ "সমর্পণ" দ্বয় পাঠ করি। বয়সী সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সারমর্ম্ম এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন, "An angry God, a bleeding saviour and a gaping hell" "কোপন স্বভাব ঈশ্বর, শোণিতাক্ত কলেবর পরিত্রাতা ও গিলিবার জন্য হাঁ করা নরক।"

১১ কার্ত্তিক—অদ্য ভাদ্রমাসের আর্য্যদর্শন পাঠ করি। এই সংখ্যক আর্য্যদর্শনে "সন্ন্যাসী" শিরস্ক প্রস্তাবে "সন্ন্যাসী" শব্দের একটি নূতন মনোহর অর্থ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের ধর্ম্মের, সমাজের অথবা রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যে পর্যান্ত না ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক এইরূপ সন্ন্যাসী উদিত হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। এই কথা অতি যথার্থ।

১২ কার্ত্তিক—অদ্য বিখ্যাত বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের দ্বারা ইংরাজীতে লিখিত ৺রামকমল সেনের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনবৃত্ত অতীব কৌতূহলজনক। ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। এই পুস্তকের শেষে লেখক বলিয়াছেন যে ভক্তি ধর্ম্মসাধনের নিম্নের অঙ্গ, সাধনের উচ্চতম অঙ্গ সমাধি। ভক্তির অবস্থা উদ্বেল অবস্থা, সমাধি শান্তির অবস্থা। শান্তির অবস্থা উদ্বেল অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার মতে সমাধি ভক্তিরও উচ্চতম অবস্থা, শান্তিরও উচ্চতম অবস্থা। বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুতৎপর হইয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরে সর্ব্বদা চিত্তার্পিত থাকাই প্রকৃত সমাধি। তাহা ভক্তি ও গাঢ় প্রেম ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্তু সমা-

থির অবস্থা শান্ত অবস্থা লেখকের এই বাক্য অতি যথার্থ। প্রীতি ও ভক্তি উচ্চতম অবস্থাতে শান্তভাব ধারণ করে। নদী যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে তখন তাহার আর কল্লোল থাকে না।

১৬ কাৰ্ত্তিক—অদ্য শেষ সংখ্যক "সাধারণী" পাঠ করি। তাহাতে প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ ও মেলেরিয়া বিষয়ক প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট। তাহা পড়িয়া চক্ষে জল আইল। মেলেরিয়াতে বাঙ্গালা দেশ উৎসন্ন হইতেছে। যদি ইংলণ্ডে এরূপ হইত হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। গবর্ণমেণ্ট কেবল কমিশন বসাইয়া নিশ্চিন্ত। সকল বিষয়েতেই একটা কমিশন বসান। তাঁহারা মনে করেন কমিশন বসাইলেই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। কমিশন বসিল, রিপোর্ট করিল, সে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। আর কি চাও?

১৭ কাৰ্ত্তিক—অদ্য শেষ সংখ্যক Sunday Mirror পাঠ করি। ইহাতে কোন পারসী কাব্য হইতে উদ্ধৃত একটি বাক্য অতীব সুন্দর বোধ হইল। "আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের পথে লোককে আহ্বান করিলাম কিন্তু আমার কথা কেহ শুনিল না। আমি তৎপরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আলয়ে চলিয়া গেলাম। কিন্তু তথায় দেখিলাম আমি যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে অনেকে আমা অপেক্ষা উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন।"

এই ভারতবর্ষে কত কবি কত দার্শনিক কত জ্ঞানী কত ধার্ম্মিক জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের বাক্য ও কার্য্য আজও লোকের আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের নামে লোকের হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হয়। দশ জন বন্ধুবান্ধব একত্র হইলে তাঁহাদের সৎকথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যদিও তাঁহারা বহুদিন হইল পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন কিন্তু সুনামে অদ্যাপি জীবিত। সেই সমস্ত মহাত্মা যেরূপ পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কালস্রোতের উপর নয় পাষাণে অঙ্কিত। কিন্তু মনে বড় ক্ষোভ হয় যে আমরা তাঁহাদের সেই সমস্ত পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। মনুষ্যের ইহাই স্বভাব যে যাহার উপর ভক্তি বা প্রেম হয় তাহাকে দেখিবার জন্য একটা অদম্য লালসা উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষে ভবিষ্যতের জন্য প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার একটা প্রথা ছিল না। ইহা আধুনিক প্রথা। বিলাতে শীর্ষস্থানীয় লোকের মর্য্যাদা রাখিতে হয় এদেশের লোক যদিও তাহা অন্যরূপে দেখিয়া থাকে কিন্তু সেই সমস্ত লোকের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা করা কিছু মন্দ প্রথা নয়। ইহা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটা সম্বন্ধ রক্ষার সদুপায়। আমরা যখন যে কোন মহাত্মার সদ্গুণের আলোচনা করি প্রতিমূর্ত্তিতে তাহার বাহ্য লক্ষণ কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত দেখিতে পাইলে মনে বড় আনন্দ উপস্থিত হয়। প্রতিমূর্ত্তি রক্ষার ইহা একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ ভক্তির পাত্রের কিরূপ মূর্ত্তি ছিল তাহার প্রতিরূপ স্বচক্ষে দেখায় একটা বড় আত্মসন্তোষ হয়। যাই হউক বর্ত্তমানের এই রুচি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

সম্প্রতি আমরা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানি লিথোগ্রাফ ছবি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রণেতা ভারত চিত্রালয়ের বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র। যে মহাত্মার ছবি প্রস্তুত হইয়াছে তিনি অদ্যাপি জীবিত। এদেশের প্রায় ষোল আনা লোকই তাঁহাকে দেখিয়াছেন। ছবি খানি ঠিক হইয়াছে কি না তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমরা বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্রের এই চেষ্টায় বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তিনি যে মহাত্মার ছবি প্রস্তুত করিয়াছেন ভবিষ্যতে ইঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের বাস্তবিকই একটা অদম্য লালসা উপস্থিত হইবে। অতুলকৃষ্ণ বাবু তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় করিয়া রাখিলেন। ইহাতে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।

বিজ্ঞাপন।

সকল হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ যে ব্রহ্মোপাসনা তাহা যাহাতে এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় এই উদ্দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহৎ অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সমাজের কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে। কিন্তু এরূপ বৃহৎ কার্য্য ব্যয়-সাপেক্ষ। এ জন্য এদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক যথা সাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে আগামী বৎসরের জন্য ধনসংস্থান আবশ্যক। এই সম্বন্ধে যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা দিবেন আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিব।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি মহাত্মা রামমোহন রায়ের পুত্রবধূ মৃত বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের পত্নী শ্রীমতী ভবময়ী দেবী ২২ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
ফাল্গুন ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ

৫১১ সংখ্যা
১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫ মাঘ।

মাঘের একাদশ দিবসীয় মহোৎসবের সঙ্গে আমারদের আত্মার এমনই নিগূঢ় যোগ যে, সেই উৎসব-আনন্দ ভোগে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত অদ্য হইতেই আমরা আমারদের আত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছি। লোকে সামান্য বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদনের জন্য পূর্ব্ব হইতে কত আয়োজন সঙ্কল্প করে, আমরা কি গুরুতর মহত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি-কল্পে উদাসীন থাকিতে পারি? বিনা আয়োজনে সংসারে কোন কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুনিষ্পন্ন হয় না। বিনা সঙ্কল্পে কোন ব্যক্তিই এই মর্ত্ত্যলোকে কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমরা যে মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছি তাহাতে বাহ্য ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। বাহ্য বিষয়ের আয়োজন এক, আর আধ্যাত্মিক আয়োজন অন্য প্রকার। বাহ্য বস্তু সংগ্রহ বাহ্য-ধন-রত্নের উপরেই নির্ভর করে, আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য আত্ম-[illegible] আত্ম-সংস্কার, আত্ম-সংকল্প নিতান্ত আবশ্যক। তাহারও বাধা বিঘ্ন, আকর্ষণ প্রলোভন চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি। সে সমস্ত উল্লঙ্ঘন অতিক্রম করিয়া দেব-পথে অটলভাবে গমন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পৃথিবী আমারদের পাদদ্বয় আপনার কেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া রাখিয়াছে, পার্থিব বস্তু সমুদয় অহর্নিশ আমারদের ইন্দ্রিয়গণকে নানা প্রকারে আকর্ষণ করিতেছে, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সুখ-সামগ্রী সকল দিনরাত্রি আমারদিগের চিত্তকে নানা প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছে; এ সমস্ত আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অতীত বুদ্ধি-মন-অগম্য বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া কি সহজ ব্যাপার? সামান্য নদনদীর প্রতি-স্রোতে শরীর সঞ্চালনা করাই যখন মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য, তখন সংসার ও বিষয়-সুখের প্রতিকূলে আত্মাকে ব্রহ্ম-সংস্থিত করিবার জন্য অগ্রসর করা কত না কঠিন ব্যাপার। দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত কার সাধ্য যে এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে। অতএব আইস সকলে অদ্য হইতেই সংকল্প করি, যে আমরা আমারদের আত্মাকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া সেই ব্রহ্ম-যজ্ঞে উপনীত করিব। সেই এক অদ্বিতীয়

ব্রহ্মেরপূজার জন্য দ্বিধাভাব পরিত্যাগ করিয়া তন্মনা একাগ্রমনা হইয়া থাকিব।

আমরা দৃঢ়তা-রহিত ও সংকল্পশূন্য হইয়া কার্য্য করি বলিয়া আমারদের আশানুরূপ ফল লাভ হয় না, আমরা সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। কিসের জন্য সংকল্পের প্রয়োজন, তাহা একবার বিশদ রূপে আত্মাকে বুঝাইয়া দেও, সে আপনার স্বার্থ পরমার্থ, আপনার শান্তি কল্যাণ একবার সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলে আপনা হইতেই দৃঢ়ব্রত হইবে। আত্মা পৃথিবীর নহে, সে পার্থিব উপাদানেও নির্ম্মিত নহে; যদিও সে শিক্ষা সাধনের জন্য অনিত্য বিষয়রাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে, কিছুকালের জন্য এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-পূর্ণ পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু সে স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত, সে অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী, ভূমণ্ডল তাহার গম্য পথের পান্থ-নিবাস মাত্র। এই মৃত্যুময় সংসারে থাকিয়া যাঁহার সঙ্গে যোগেতেই তাহার অমরত্ব লাভ হয়, রোগ-শোক-পাপ-তাপ-বিলাপ-ক্রন্দন-পূর্ণ অধোলোকে এই ম্রিয়মাণ মুহ্যমান আত্মা, যাঁর দর্শন লাভ করিতে পারিলে সে নব-জীবন নব-উৎসাহ নূতন বলবীর্য্য লাভ করিয়া বীতশোক হয়, সেই মহা মহোৎসবে সেই সৌন্দর্য্যের আকর, শোভার ভাণ্ডার, অমৃত স্বরূপ ঈশ্বরের পূজার জন্য প্রস্তুত হইবার আবশ্যক। সেই পরব্রহ্মের দর্শন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত আয়োজন করাই প্রয়োজন, এই সুসংবাদ একবার তাহার অন্তরতম প্রদেশে প্রেরণ কর, তাহা হইলে সে আপনা হইতেই প্রেমোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। শোণিত শিরায়, শরীর প্রাণে, যে রূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার তাহা অপেক্ষাও অনন্ত গুণে গাঢ়তর নিগূঢ়তর ঘনিষ্ঠ যোগ। একবার তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দাও, যে বিষয়-কুজ্ঝটিকার মধ্যে যে জ্ঞান-প্রেম-সূর্য্যের অভ্যুদয় উজ্জ্বলতর রূপে দেখিতে পাই না, জনসমাজের হীনাবস্থা নিবন্ধন সকল স্থানে যে প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্বরূপের ভজন-সাধন সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, মাঘের পবিত্র একাদশ দিবসে তাঁহারই পূজার্চ্চনা হইবে। মেঘাম্বু নিপতনের উপক্রম দেখিয়া একটি চাতক উচ্চরবে চীৎকার করিলে যেমন চতুর্দ্দিক হইতে পিপাসু চাতক দল ঊর্দ্ধমুখে ডাকিতে থাকে, তেমনি সেই জ্ঞানপ্রেমামৃত বর্ষণের সংবাদ একবার একটি আত্মা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আহ্বান করিলে, শত সহস্র আত্মা সেই মহা মহোৎসবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিবে। বন্দীকে কারামুক্ত হইবার সম্বাদ, বিদেশীকে স্বদেশ-গমনবার্ত্তা প্রদান করিলে সে কি আর সুস্থির থাকিতে পারে, সে আপনা হইতেই সম্বল সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্তমনা যুক্তাত্মা হইয়া থাকাই আত্মার স্বভাব। অনন্তের মঙ্গল গীত গান করাই অন্তর-রসনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যেখানে অনন্তের মহিমা কীর্ত্তিত হয়, যে ঘটনাতে ঈশ্বরের স্নেহ প্রেম-চ্ছটা উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হয়, যে কার্য্যে তাঁহার মঙ্গল লক্ষ্য সংসিদ্ধ হয়, মানব আত্মা তাহার প্রতি সহজে ধাবিত না হইয়া থাকিতে পারে না। সে সদ্ভাবে স্বাধীন ভাবে তাহাতে যোগ দিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। তাহাতেই তাহার ধর্ম্মবল ধর্ম্মসাহস বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ, তাহাতেই তাহার প্রকৃত উৎসব। কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যেতেই যেমন আত্মসংকল্প, আত্ম-চেষ্টা, আত্মপ্রভাব নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনি দেবপ্রসাদেরও একান্ত আবশ্যক।

ভূমির যতই কেন দেবদত্ত উর্ব্বরা শক্তি, বীজের যতই কেন অঙ্কুরোৎপাদিকা ক্ষমতা থাকুক না, উপর হইতে জল আলোক বর্ষিত না হইলে কোন ক্রমেই সুফল লাভ হয় না। তেমনি অমর আত্মার ঈশ্বরদত্ত আত্মপ্রভাব থাকিলেও তাঁহার করুণামৃত প্রাপ্ত না হইলে, আমরা কোন কার্য্যেই জয়লাভ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হই না। সেই জন্য এই শুভ দিনে শুভক্ষণে বোধন উদ্বোধন দ্বারা আত্মাকে উদ্বোধিত করিতে সম্মিলিত হইয়াছি। এই সময়ে আইস আমরা সকলে মিলে তাঁহার প্রসাদ—তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি।

হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা করুণাময় ঈশ্বর! যাহাতে তোমার প্রসাদে আমরা তোমার উৎসব আনন্দভোগী হইতে পারি, তুমি আমারদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এরূপ ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর। আমরা চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে অবস্থান করিতেছি, তোমার করুণা ভিন্ন কখনই আমরা আমারদের চিত্তকে সুস্থির ও অটল রাখিতে পারি না। তোমার বলে আমাদিগকে বলাধান কর, তুমি আমারদের আত্মাকে প্রেমানন্দে উৎসাহিত করিয়া তোমার সন্নিহিত হইবার সম্বল সংগতি প্রদান কর, বিনীতভাবে তোমার সন্নিধানে এই শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসম্মিলন।

গত ৯ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। ঐ দিন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কয়জন বেদির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উদ্বোধন ও প্রার্থনা করেন। তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সম্মিলন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

আমরা নানা ঘটনার মধ্য দিয়া অদ্য এই শুভ সম্মিলনের উৎসবে উপনীত হইয়াছি। নানা বিষয়ের নানা স্রোতে আমাদের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, আজিও তাহা স্থির হইতে পারে নাই। এই জন্য আজিকের মত এইরূপ সম্মিলন আমাদের পক্ষে পরম উপকারী। নানা দিক্ দিয়া নানা অশান্ত নদী যেমন সাগর-বক্ষে আসিয়া প্রশান্তি লাভ করে, সেইরূপ প্রশান্তি লাভ করিবার জন্য আমরা সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গল ছায়ায় অদ্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে আজ করুণার্দ্র স্বরে বলিতেছেন

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

"সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর ইনি অমৃত লাভের সেতু।" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সারগর্ভ কথায় আমরা কর্ণপাত না করিয়া নানা প্রকার অলীক এবং অসার কথায় কাণ দিয়াছি, তাই আমরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভগবদ্গীতার এই কথাটি মনে পড়ে

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সহস্র ব্যক্তির

মধ্যে এক ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের জন্য যত্ন করেন, এবং সেইরূপ যত্নশীল সাধু ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি যদি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎরূপে জানেন। আমরা এত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, ঈশ্বরের জন্য যত্ন করিবার অবকাশ আমাদের অতি অল্প। বিবাদ বিসম্বাদের গোলমাল কোলাহলে আমরা ব্রহ্মবাদীর এই অমূল্য কথাটি একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি যে,

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

'পরমাত্মাকেই কেবল জ্ঞান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর ইনি অমৃতলাভের সেতু।" যিনি অমৃত লাভের একমাত্র সেতু—যিনি সাক্ষাৎ অমৃতের উৎস—তিনি যে কত যত্নের সামগ্রী, এ ভাবটি আমাদের মনে এখনো স্থান করিয়া বসে নাই,—আমরা মনে করি যে, ঈশ্বরেতে ক্রমাগত লাগিয়া থাকিলে আমরা একেবারেই কাজের বাহির হইয়া পড়িব;—তাহাই যদি সত্য হয় তবে শরীর কোন সময়ে বলিতে পারে যে, আমি প্রাণের সঙ্গে ক্রমাগত যুক্ত থাকিলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব; অমৃতের সহিত ক্রমাগত যুক্ত থাকিলে আমরা মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব—এ প্রকার কিরূপ কথা? ঐ অলীক কল্পনার কি অধিক মূল্য যে, উহাতে ভুলিয়া আমরা সাক্ষাৎ অমৃতের উৎসকে অযত্নে হারাইয়া ফেলিব? যেমন একটি রত্ন-ভাণ্ডার লাভ করিতে পারিলেই তাহার অভ্যন্তরস্থিত শত কোটি মণিমুক্তা লাভ করা যায়, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জানিলেই তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি বিশদরূপে জানিতে পারা যায়, আর পরমাত্মাতে আমাদের প্রীতি নিবিষ্ট হইলেই সেই সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে আমাদের মন আপনা হইতেই ধাবিত হয়। এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জানিলেই আমরা এই তত্ত্বটি জানিতে পাই যে, আমাদের সকলের আত্মা তাঁহা হইতে আসিয়াছে এবং তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে,—তখন সকলের প্রতিই আমাদের প্রেম বিস্তৃত হয় ও সকল কর্ত্তব্য-সাধনেই আমাদের বুদ্ধি ব্যাপৃত হয়। বাহিরের কোন স্থান অন্বেষণ করিলে আমরা এই অমৃতের সেতুকে পাইব না—কেবল আত্মার অভ্যন্তরেই আমরা তাঁহার অন্বেষণ পাইতে পারি।

আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে দুইটি প্রদেশ আছে—একটি বহিঃস্থিত আর একটি অন্তরস্থিত। বহিঃপ্রদেশটিতে সাংসারিক ভাবনা-চিন্তা অষ্টপ্রহর তরঙ্গিত হইতেছে; প্রত্যেক তরঙ্গেরই দুই দুই পার্শ্ব, এক পার্শ্বে সুখ আর এক পার্শ্বে দুঃখ—একপার্শ্বে দিবা আর এক পার্শ্বে রজনী, এক পার্শ্বে কর্ম্ম আর এক পার্শ্বে ভোগ। আত্মার এই বহিঃপ্রদেশটিকে দর্শনকারেরা বিজ্ঞানময় এবং মনোময় কোষ বলিয়া উল্লেখ করেন—এই বহিঃপ্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ, সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু আত্মার অন্তরতম প্রদেশটিকে শারীরিক অথবা মানসিক কোন অভাবই স্পর্শ করিতে পারে না, এখানে ভাবনা চিন্তা নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, জরা মৃত্যু নাই—এ স্থানটি অতি নিভৃত স্থান, অতি নিরাপদ স্থান। যিনি প্রেমের সাক্ষাৎ আকর তিনি প্রেম-পিপাসুদিগের জন্য এই স্থান সুখের আলয় করিয়া রাখিয়াছেন,—এই স্থানেই সেই দিব্য আনন্দের উৎস—অমৃতের উৎস—সঙ্গোপিত রহিয়াছে যাহা সাক্ষাৎ প্রাণ-স্বরূপ;—সে উৎসের কণামাত্র প্রসাদ পাইলে রোগ-শোক শান্তিতে পরিণত হয়, জরা যৌবনে পরিণত হয়—মৃত্যু অমৃতে পরিণত হয়,—আত্মার এই অন্তরতম স্থানটিই

পরমাত্মার আবির্ভাবের স্থান—দার্শনিকেরা ইহাকেই আনন্দময় কোষ বলেন। এই নিভৃত স্থানটিতে পরমাত্মা তাঁহার সমস্ত প্রেম ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন, এখানকার যাহা কিছু সমস্তই সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে আসিতেছে—জীবন্ত আত্মা আসিতেছে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান আসিতেছে—সুধাময় প্রেম আসিতেছে; পৃথিবী হইতে কোন পাথেয় সঙ্গে করিয়া এখানে আনিবার প্রয়োজন নাই, এখানে আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং মুক্ত হস্তে প্রেমামৃত বিতরণ করিতেছেন। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন "ইনিই অমৃত-লাভের সেতু।" কিন্তু হায় আমরা সেই অমৃতের সেতুকে ছাড়িয়া নানা দিকে ধাবিত হইয়াছি, তাই আজ আমাদের এই দুদ্দশা।

যেরূপ কোলাহলময় সমুদ্র-মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহা উত্তীর্ণ হইতে হইলে আমাদের একখানি দৃঢ় তরণী চাই—সেই তরণীর একজন দৃঢ় কর্ণধার চাই—এবং সেই কর্ণধারের প্রতি আমাদের দৃঢ় নির্ভর চাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই দৃঢ় তরণী, মঙ্গলময় পরমাত্মা সেই কর্ণধার; তাঁহার প্রতি আমাদের দৃঢ় নির্ভরের কেবল অপেক্ষা। আমাদের নির্ভরের মাত্রা পূর্ণ হইলে—কোন গুপ্ত শৈলে আমাদের ভয় নাই—কোন ঘূর্ণা আবর্ত্তে আমাদের ভয় নাই—কোন ঝঞ্ঝাবণ মেঘে আমাদের ভয় নাই—আমাদের কাণ্ডারী অমৃতের সেতু—তিনি আমাদিগকে অমৃতধামে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন ইহা নিঃসংশয়। আমাদের সমস্ত আশা ভরসা সেই কাণ্ডারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল যদি আমরা ধৈর্য্য ধারণা পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকি—এবং সেই হিতানুষ্ঠান ভিন্ন আর কোন পার্থিব লাভালাভের প্রতি আমাদের লক্ষ্য না থাকে—তবে অচিরাৎ ব্রহ্মানন্দের প্রস্রবণ আমাদের আত্মাতে খুলিয়া যাইবে—তখন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সুখসাধ্য হইয়া উঠিবে, তখন পরস্পরের সহিত বিবাদ কলহ আমাদের মন হইতে একেবারেই উন্মূলিত হইয়া যাইবে।

এইরূপ যিনি আমাদের অমৃত-লাভের সেতু তাঁহার উপর নির্ভর করা কি কঠিন কার্য্য। একদিকে তাহা যেমন কঠিন, আর একদিকে তাহা তেমনি সহজ। বিষয়ের মায়া নব নব বেশে আমাদের মনকে বশ করিয়া এমনি অবশ করিয়া ফেলে যে, আমরা সেই রাক্ষসীর হস্ত এড়াইয়া ঈশ্বরের ক্রোড়ে একপদ অগ্রসর হইতে গেলে চারিদিকে বিভীষিকা মুখ ব্যাদান করিয়া উঠে, এই কারণেই ঈশ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করা সুকঠিন। কিন্তু আর-একদিকে দেখা যায় যে, নানা প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা অপেক্ষা এক অদ্বিতীয় প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা সহজ, দুর্ব্বল প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা অপেক্ষা সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা সহজ, নির্দয় প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা অপেক্ষা করুণাময় প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা সহজ, নির্ব্বোধ প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করা সহজ, অজ্ঞাত-কুলশীল পরমনুষ্যের প্রেম-সৌহার্দ্দে নির্ভর করা অপেক্ষা আত্মার অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃদের প্রেমে নির্ভর করা সহজ,—এতগুলি কারণে পরমাত্মার আশ্রয়ে নির্ভর করা সহজ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, আমাদের অবিচলিত আশ্রয় নেতা ও সুহৃৎ আমাদের নিকট হইতে তিল-মাত্রও দূরে নহেন—তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা। আমরা শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া যত্ন করিলে পরমাত্মা কখনই আমাদিগকে দর্শন-দানে বঞ্চিত করি-

বেন না,—তখন, চক্ষুতে যেমন আমরা সূর্য্যের আবির্ভাব দেখিতে পাই—আত্মাতে সেইরূপ পরমাত্মার আবির্ভাব দেখিতে পাইব। ঘুমন্ত চক্ষুতে যেমন সূর্য্যের উদয় প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন আত্মাতে পরমাত্মার সত্তা প্রতিভাত হয় না। মোহ-কুজ্ঝটিকা হইতে আমাদের আত্মা যখন মুক্ত হইবে—তখন শান্তীর জ্ঞানের সমুদ্র ও প্রেমের আনন্দ উৎস পরমাত্মা সেই আত্মাতে আবির্ভূত হইবেন,—তখন ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যও আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না—টলাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিন ক্ষমতাশীল জাতির ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা যেমন বিষয়ী লোকের চরম সম্বল, সেইরূপ ব্রাহ্মদিগেরও তাঁহারাই একমাত্র গতি মুক্তির নিদান হইবেন; ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্রাহ্মদিগের অধিক প্রার্থনীয় হইবে,—তাঁহাদের তুষ্টিরুষ্টির উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মরণ বাঁচন নির্ভর করিবে। হায় আমাদের কি দারুণ দুর্দ্দশা। আমরা অল্প একটু লোভের কুহকে চিরজীবনের সম্বল হারাইয়া ফেলিয়া বসিতেছি; সংসারের একটু চক্ষু রাঙানিতে ঈশ্বরের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া মায়া-রাক্ষসীর অঞ্চল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভর অতি যৎসামান্য। আমাদের রোগ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি—আপনাতেও দেখিতে পাইতেছি—অন্যেতেও দেখিতে পাইতেছি, এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাহা বদ্ধমূল হইতে না-হইতে তাহার প্রতীকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় নিযুক্ত হই।

প্রথমতঃ আমাদের রোগের প্রতীকার আমাদের নিজের নিজের হস্তে। আত্মাতে জ্ঞানময় মঙ্গলময় পরমাত্মার আবির্ভাব হইলে আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হইবে এই আশায় ভর করিয়া আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—আমরা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করি, মনকে বিষয়-কামনা ও প্রভুত্ব-কামনা হইতে শূন্য করিয়া হিত সাধন কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। মনের এইরূপ অনাসক্ত শূন্য অবস্থা কাল-ক্রমে যথোচিত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে—মন-আসন যথোচিত পরিষ্কৃত হইলে—করুণাময় পরমাত্মা নিশ্চয়ই অলক্ষিত-পদ-সঞ্চারে সাধকের শূন্য হৃদয়কে সুধাময় প্রেম আলিঙ্গনে পূর্ণ করিবেন। যখন সাধক পার্থিব সুখে অনাসক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবে—এবং আত্মার নিভৃত নিলয়ে পরমাত্মার প্রেমামৃত পান করিয়া অপার শান্তিতে নিমগ্ন হইবে, তখন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মঙ্গল নিয়মের অনুশাসনে সমস্ত জগৎ সেই সাধককে সুখে রাখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবে, তরুলতা প্রস্তর পাষাণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মধুর সম্ভাষণ করিবে।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ,
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি
ন কামকামী।

আপূর্য্যমাণ অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেমন নদী সকল প্রধাবিত হয়, সেইরূপ আপনা হইতে সমস্ত কাম্যবস্তু আসিয়া যাহাকে আলিঙ্গন করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হ'ন, যিনি কাম্য বস্তুর পশ্চাৎ লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান তিনি নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রোগের প্রতীকার পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা যদি সমস্ত বিবাদ-কলহ বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের আত্মার শান্তি-সাধনে এবং উন্নতি-সাধনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে পরমাত্মা স্বয়ং শান্তি এবং আরোগ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া বাস করেন। তাহা হইলে আমাদের

সম্মিলন যথার্থই আনন্দের সম্মিলন হইয়া উঠে—কল্যাণের সম্মিলন হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ; রোগ-প্রতীকারের প্রধান উপায়—সরল-ভাবে ঈশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করা। সরল হৃদয়ের প্রার্থনা নিশ্চয়ই পরমাত্মার আবির্ভাবের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে; কেবল এই এক বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন সে প্রার্থনার সঙ্গে বিষয়-কামনা কিম্বা প্রভুত্ব-কামনা মিশ্রিত না থাকে,—তাহা হইলে তেমন মহোপকারী ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। সে রূপ নিষ্কাম প্রার্থনা ঈশ্বরের করুণাকে এমনি ঘনিষ্ঠ রূপে আকর্ষণ করে যে, প্রার্থনাটি নিজেই ঈশ্বরের করুণা রূপে পরিণত হয়,—তখন সাধকের প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের করুণা এ দুয়ের মধ্য হইতে ভেদ-ব্যবধান একেবারেই চলিয়া যায়।

হে পরমাত্মন্ তোমার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি অনাবৃত করিয়া আমাদের সম্মিলনকে তোমার সাম্মিলনের দ্বার কর, তুমি যেমন সেতু স্বরূপ হইয়া সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছ, সেইরূপ আমাদের সকলকে তোমার প্রেম-নিকেতনে ধারণ করিয়া রাখ—যেন আমাদের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দশদিকে প্রধাবিত না হয়। তোমার আশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল—তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের সকলকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর—আমাদের তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-সুধা বর্ষণ কর; তাহা হইলে আমাদের শুষ্ক হৃদয় বিকসিত হইবে—নির্জীব আত্মা সজীব হইবে—এক দিনের এই সম্মিলন আমাদিগকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে—তোমার চরণের আশ্রয়ে আমরা সকল দুঃখ শোক ভুলিয়া ইহ জীবনেই অমৃত-নিকেতন লাভ করিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গান।

রাগিনী বাহার। তাল যৎ।

জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম জ্বলন্ত পাবন!
তুমি দেবদেব মহাদেব সত্য সনাতন।
জড় জীব একতানে, নানা ভাবে নানা স্থানে,
তোমার মঙ্গল নাম করিছে কীর্ত্তন।
গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি, সর্ব্বগত গূঢ় শক্তি,
মহাতেজ আদি জ্যোতি কারণ-কারণ;
আমার জীবন স্বামী, এই তো সম্মুখে তুমি,
দেহি নাথ দীন জনে অভয় চরণ।

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

মা জগত জননী। বিশ্বজনবন্দিনী, বিচিত্র গুণধারিণী চৈতন্যরূপিণী।
লয়ে প্রেমকোলে সকল সন্তানে,
করিছ পালন স্নেহ-দুগ্ধ দানে,
স্মরণে তোমায় উথলে হৃদয়
ওগো হৃদয়বাসিনী।
হয়ে কল্পতরু কর বিতরণ,
অন্ন জল জ্ঞান প্রেম পুণ্য ধন,
দীন ভক্ত জনে দেও দরশন ভক্তচিত্তহারিণী;
রূপের ছটায় বিজলী চমকে,
করে ঝলমল জ্বলে চারি দিকে,
কোটি সূর্য্য প্রভা অনুপম শোভা
প্রতাপে কম্পিত ধরণী।

শেষ।

ঝিঁঝিট। একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্,
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক্ সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।

এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখো-নারে ব্যবধান।

সংসারের ধুলা ধুয়ে ফেলে এস মুখে লয়ে এস হাসি,

হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই প্রেম ফুল রাশি রাশি।

নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,

অনাথ জনের মুখপানে আহা চাহিলে না মুখ তুলে।

কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত ব্যথিলে পরের প্রাণ।

তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান।

তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপ-নারে ভুলিবে না।

হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না।

লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,

পিতার অসীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী।

কীর্ত্তন।

বল শান্তি শান্তি শান্তি হরি।
শান্তিপ্রদ হরিপদ হিয়ামাঝে ধরি।
হরি যার বন্ধু তার কেহ নাই অরি;
দেখে সর্ব্ব ঘটে চিদানন্দের লহরী।
ঘুচে গেল ভেদাভেদ, মিটিল মনের খেদ,
পোহাইল দুখের শর্ব্বরী; কেহ নয় পর
তবে কেন মনে করি;
হৃদয় ভিতরে স্বর্গ দেখ প্রাণভরি।

(যোগনয়নেরে)

সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১১ মাঘ প্রাতঃকাল।

সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে সমাজগৃহ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। অনেকে স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং অনেকে দাঁড়াইতে না পাইয়া দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন। আমরা সমাজ গৃহে এরূপ লোক-সমাগম কখন দেখি নাই এবং ব্রহ্মোৎসবে এমন উৎসাহও কখন দেখি নাই।

অনন্তর যথাসময়ে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বেদির অভিমুখে নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ ক-রিলেন।

এক দিন আমি কোন গৃহস্থের গৃহে গিয়াছিলাম। গৃহপতি বেস্ সুসম্পন্ন। গৃহ এখনকার নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত।

কিন্তু গৃহপতি দুই এক কথার প্রসঙ্গ করিয়া আমায় কহিলেন আমি আপনাকে আমার বড় যত্নের দুই একটা বস্তু দেখাইব। এই বলিয়া তিনি একখানি জীর্ণ হস্তলিপি ও একটা নস্যের শম্বূক বাহির করিয়া কহিলেন আমার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ অমুক একজন দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এই তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত গৌতম সূত্র আর এই তাঁহার ব্যবহৃত নস্যের শম্বূক। এই দুইটী বড় আমার যত্নের ধন। আমি বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্য পাইলেও ইহার বিনিময়ে লইতে পারি না।

এই ব্যাপারে বুঝিলাম প্রাচীনতার প্রতি অনুরাগ মনুষ্যের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যার পূর্ব্ব পুরুষের কিছু অবশেষ থাকে সে তাহার যত্ন না করিয়া থাকিতে পারে না। ফলত যাহা ব্যাপক মাত্রায় কাল অধিকার করিয়া আছে তাহা বাস্তবিকই একটা গৌরবের বস্তু। এ দেশে তো অনেক গ্রন্থ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু তৎনধ্যে বেদের এত গৌরব কেন? ইহার অবান্তর কারণ যাই থাক্ কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বলিব প্রাচীনতা। ফলত প্রাচীন বস্তুর গৌরব করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা একটা মমত্বের কথা মাত্র বটে কিন্তু ইহাতে ঔচিত্য কি আছে? আমরা বলি ইহাতে যথেষ্ট ঔচিত্য আছে। সচরাচর এমন অনেক কার্য্য দৃষ্ট হয় যাহার মধ্যে কতকগুলির কারণ অব্যক্ত এবং কতকগুলির ব্যক্ত। কিন্তু প্রাচীনতার প্রতি অনুরাগ একটী ব্যক্ত-কারণ। মনুষ্য-জন্মের যাহা লক্ষ্য এই অনুরাগ দ্বারা তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হয়।

প্রথম হৃদয়। মনে কর যখন পূর্ব্বজ্ঞানের কোন একটা সঞ্চিত ভাণ্ডার নাই সেই সময় মনুষ্য এই অচিন্ত্য রচনা বিশ্বকে দেখিয়া অন্তস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসে যে সকল ফুল ফুটাইয়া গিয়াছে যুগযুগান্তের কত রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরও সেই পুষ্পের সেই কান্তি সেই গন্ধ আমরা যেন নূতনের ন্যায় ভোগ করিতেছি। তাঁহাদের সেই গভীর উচ্ছ্বাসে নিজের উচ্ছ্বাস মিশাইতেছি এবং সেই গাঢ় আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছি।

দ্বিতীয় ইতিহাস। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগকে ইতিহাস বলা যায়। মনে কর সেই আদি কালের দুরন্ত শীত বাতাতপের মধ্যে প্রচণ্ড হিংস্র-জন্তুতে পরিবৃত হইয়া লোকে নিরলঙ্কার সরল কথায় যে সকল সত্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে আজ এই জ্ঞান বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে প্রকৃতির সকল প্রকার কঠোরতা হইতে সুরক্ষিত নির্বিঘ্ন সময়ে সেই সমস্ত সত্যই আমাদের উপজীব্য হইতেছে। ফলত স্মরণাতীত অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এমন সুন্দর ও গাঢ় যোগ আর কিছুতেই নাই।

তৃতীয় সমাজ। অনেকের সংস্কার এই যে, বর্ত্তমান মনুষ্যের সমষ্টিই মনুষ্য-সমাজ। কিন্তু এইটী বড় ভুল। মনুষ্যের নানারূপ চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে যে একটা ভাব বা প্রকৃতি বদ্ধমূল হয় তাহার সহিত যে মনুষ্য-সমষ্টি মুখ্য অর্থে তাহাই মনুষ্য-সমাজ। সমাজের এই প্রাণটী ছাড়া কি সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজই সমাজপদের বাচ্য হইতে পারে না। মনে কর মনুষ্য বলিলে আমরা কি বুঝি। আমরা কি মনুষ্য বলিতে একটা মুখ চক্ষু নাসিকা বিশিষ্ট জীবমাত্রকে বুঝি? না তাহার সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ দয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে মনুষ্য বলিয়া বুঝি? যদি তাই মনুষ্য হয় তবে মনুষ্য-সমাজের পক্ষে এই মূল নিয়মের ব্যভিচার কেন? নানারূপ চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে সমুত্থিত ভাবের বা প্রকৃতির সহিত যে মনুষ্য-

সমষ্টি প্রকৃত পক্ষে তাহাই মনুষ্য-সমাজ। এখন দেখা উচিত এই যে চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতজ প্রকৃতি ইহার মূল কি সমকালে বদ্ধ না অতীতের গভীরে প্রসারিত? অবশ্য ইহা সকলেই জানেন যে বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই পূর্ব্বপরম্পরাগত জ্ঞান। আমরা কেবল সেই গুলিকে ব্যবহারে আনি। সামাজিক আইন বা প্রথাই বল এই সূত্রে তাহা দাঁড়াইয়া রয়েছে। সুতরাং যখন মনুষ্য-সমাজ বলিতে মনুষ্য-সমষ্টির সহিত সেই সামাজিক প্রকৃতি লক্ষিত হয় তখন ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের মূল সেই আদি কালের মনুষ্য-সমাজ। সেই স্থান হইতে চিন্তার তরঙ্গ অনিরুদ্ধ স্রোতে বর্ত্তমানে আসিয়া মিলিতেছে। এখন ভাবিয়া দেখ মনুষ্য-সমাজ বলিলে তাহার গভীরতা ও প্রসার কত দূর। ইহা একটা অপার অতলস্পর্শ সমুদ্র। কিন্তু সমুদ্রের কতকগুলি জলীয় পরমাণুমাত্রকে যেমন সমুদ্র বলা যায় না, প্রত্যুত সমুদ্রের দিগন্তস্পর্শী বিশাল বক্ষে সমস্ত জলীয় পরমাণুর ঘাত প্রতিঘাতে যে আকারটী দাঁড়ায় তাহাই সমুদ্র; মনুষ্য-সমাজও তদ্রূপ, অতীতের সুদূর সম্প্রসারণ ইহার পূর্ব্বতীর এবং বর্ত্তমান ইহার উত্তর তীর। কালের এই প্রকাণ্ড বক্ষে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া যে বিস্তীর্ণ আকার দাঁড় করাইয়াছে মনুষ্য-সমাজ বুঝিতে তাহাই বুঝাইবে। বল দেখি মূল সত্যকে ছাড়িলে সৃষ্টির অর্থ বুঝা যায় কি? সমাজও একটা প্রকাণ্ড সৃষ্টি সুতরাং অতীতের মনুষ্য সমাজকে ছাড়িলে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ কিরূপে বুঝিবে!

চতুর্থ জীবন। মনুষ্যের দুই প্রকার জীবন। একটী দৈহিক অপরটী আধ্যাত্মিক। দৈহিক জীবন কিছু পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং কতক দিন পরেই শেষ হইবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের মূল সেই অতীতে। মনে কর ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা নানা রূপ কঠোরতা সহ্য করিয়া যে অমূল্য ধন রাখিয়া গিয়াছেন যদি কোনরূপ বিপ্লব তাহা অপহরণ করিত তবে না জানি আমাদের কি দুর্দ্দশাই ঘটিত। অতীতের মূল হইতে নিরন্তর রস আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই আমরা অল্পায়াসে এই আধ্যাত্মিক জীবনকে ফলবৎ দেখিতেছি।

এখন বুঝ প্রাচীনতার প্রতি অনুরাগ সঙ্গত-কারণ কি না। যার অতীতটী উজ্জ্বল তার মনে সম্ভবতই এই অনুরাগ প্রবল। এই তো আজ এই স্থানে বহু সংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া বলুন দেখি আমি জাতীয় হৃদয় জাতীয় ইতিহাস জাতীয় সমাজ ও জাতীয় জীবন চাহি না। যদি না চাও তখন জিজ্ঞাসা করিব মমতা নামে যে একটা কথা আছে তাহার ক্ষেত্র কোথায়? যার মমতা নাই সে অসম্পূর্ণ মনুষ্য। সুতরাং মমতা যখন অপরিহার্য্য তখন প্রাচীনতার চিরকালই গৌরব থাকিবে।

সত্য দেশ কালে বদ্ধ নয়। এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বিশ্বজনীন ব্যাপক সত্যের একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বহুসাধনায় এমন সকল সত্য সংগৃহীত হইয়াছে যে তাহার প্রভা কোন কালেই মলিন হইবার নহে। কালের হস্ত তাহার নিকট পরাস্ত। এই প্রাচীনতার বিরোধী সময়ে এই একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই সমস্ত সত্যের যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসিতেছেন। বলিতে কি এখন প্রবল পাশ্চাত্যের বন্যা এদেশের অনেক বহু মূল্য বস্তু কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে কিন্তু এই আদি ব্রাহ্মসমাজ দুর্দ্ধর্ষ বীরের ন্যায় অটল পদে দণ্ডায়মান। এখনও পাশ্চাত্য কুজ্ঝটিকা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া এত-

দেশীয় অনেককে অন্ধকার পথে লইয়া যাইতেছে কিন্তু এই আদি ব্রাহ্মসমাজ হিমালয়ের ন্যায় ধীর ও স্থির। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রাচীনতম ঋষিদিগের হৃদয়জাত যে অগ্নির ভস্মাবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া পুনর্ব্বার জ্বালাইয়া দেন সেই অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নয়।

এই আদি ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য সনাতন সত্যধর্ম্ম প্রচার। ইহা আবহমান কাল সেই ব্রত নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া আসিতেছে এবং আশা করি ভাবী জীবনেও তাহা করিবে। কিন্তু এই ভারতের অতীত ইতিহাস পাঠে দেখা যায় আদি যুগে যাহা ছিল মধ্যযুগে তাহার সম্যক নাই। কাল ও অবস্থার প্রভাব তাহার বক্ষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যেন তাহা মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া নয়। একটা বৃক্ষের শাখা কাটিলে যেমন অপর এক শাখা তাহার স্থানে উত্থিত হইয়া গুণে ও সৌন্দর্য্যে স্থাণুর অনুরূপ হয় ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনও সেইরূপ। দেশাবচ্ছিন্ন ভাবের সহিত কোন অংশেই তাহার বৈসাদৃশ্য ঘটে নাই। এই আদি ব্রাহ্মসমাজ যদিও প্রাচীনতার পক্ষপাতী কিন্তু সময় যদি কোন পরিবর্ত্তন চান তবে তাহা প্রাচীন রীতি ক্রমে দেশাবচ্ছিন্ন ভাবের সহিত সর্ব্বাঙ্গীণ সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াই সাধিত হইবে এবং হইতেছে। যাই হউক প্রাচীনতার প্রতি পক্ষপাত আছে বলিয়াই আজ শত শত কৃতবিদ্য হিন্দু পরিবারের ইহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। যদি এই পুণ্যভূমি ভারত-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা কোনও কল্যাণ সাধিত হয় তবে তাহা এই আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা হইবে কারণ ইহার ধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম।

আজ আমি যাহা পাঠ করিব ইহা একটি প্রাচীন উপদেশ। যদিও ইহা ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে, যখন এই গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেই সময়ে, এই ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার জন্ম যে কোন্ কালে তাহার কিছুই নির্ণয় হয় না। ইহা একটী প্রাচীনতম উপদেশ। ঋষিরা যখন প্রকৃতির ভয়মোহকর দৃশ্যে আত্মাবলুপ্ত হইয়াছিলেন ইহা সে সময়ের নহে। কিন্তু যখন তাঁহারা এই প্রকৃতির অভ্যন্তরে সত্যাত্মা রূপে পুরুষকে পাইয়া উৎসাহ স্বরে কহিয়াছিলেন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" ইহা সেই সময়ের। অতি প্রাচীন কালে লোকের জড়মোহ ভেদ করিবার নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি, কিন্তু ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে লোকের মূর্ত্তিমোহ ভেদ করিবার নিমিত্ত ইহার অবতারণা। লক্ষ্য উভয়ত্রই এক, বিভিন্নতা এই যে প্রাচীন কালে একমাত্র ব্রহ্মবাদিনী ইহার শ্রোতা ছিলেন কিন্তু আজ পরম সৌভাগ্য যে এইস্থানে বহুসংখ্য ব্রহ্মবাদিনী ইহা শুনিবেন। আমি তাহা অতি উৎসাহের সহিত পড়িতেছি তোমরা সকলেই শুন।

ইহার পর পরলোকগত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের একটী উপদেশ পঠিত হইয়াছিল। পাঠকের কৌতূহল থাকিলে তাহা ১৭৭১ শকের একখানি মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া লইতে পারেন।

সঙ্গীত।

রাগিণী টোড়ি। তাল ঢিমা তেতালা।

শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর
অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করিব নির্ব্বাণ,
ভুলিব সংসার—
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাব।

রাগিণী যোগিয়া। তাল কাওয়ালি।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।

বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ গানে।
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর,
ভোল দুখ তাঁর প্রেমমধু পানে।

মিশ্র ললিত। একতালা।

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু
আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল
চরণ-দরশ আশে।
খুলিল দ্বার তিমির ভার
দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্ব জগত
ধাইল নিজ বাসে।
বিমল-কিরণ প্রেম আঁখি
সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায়
সকল জগত হাসে।
কানন সব ফুল্ল আজি
সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ-হৃদয় মত্ত মধুপ
প্রেম-কুসুম-বাসে।
উজ্জ্বল যত ভকত হৃদয়
মোহ তিমির নাশে।
দাও নাথ প্রেম-অমৃত
বঞ্চিত তব দাসে।

অনন্তর উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাখ্যান পাঠ করেন। অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুর গম্ভীর স্বরে এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

তরণী ভগ্ন-প্রায়—সমুদ্র অপার—অন্ধকার রজনী—বিদ্যুতের উন্মেষে তরঙ্গভঙ্গ শঙ্কায়মান হইয়া দেখা দিতেছে—কোথায় কোন্ গুপ্ত শৈল তাহার কিছুই ঠিকানা নাই—এ সময়ে যদি কর্ণধার কেহ না থাকে তবে নৌকার কি বিষম দুর্ব্বিপাক! আমাদের দেশের এইরূপ ভয়ানক দুর্ব্বিপাক উপস্থিত—ঈশ্বর আমাদের কাণ্ডারী না হইলে আর আমাদের গতি নাই। আমরা মোহান্ধকারে আবৃত হইয়া হৃদয়-তরণীর কর্ণধারকে দেখিতেছি না ভয়ে শোকে মোহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছি—যাহাকে সম্মুখে পাইতেছি তাহাকেই কর্ণধার নিযুক্ত করিতেছি—বিপদ এড়াইতে গিয়া বিপদ্‌কে দ্বিগুণ করিয়া তুলিতেছি,—দেখিতেছি না যে করুণাময় কর্ণধার হাল্ ধরিয়া আছেন, কেহ তাঁহাকে না দেখুক তিনি সকলকে দেখিতেছেন—তিনি সকলের উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন! একদিকে বিঘ্ন-বিপত্তিময় সংসার-সাগর আর এক দিকে পরমাত্মার অপার করুণা, সংসার-সাগরের গর্জ্জন আস্ফালন মিথ্যা—পরমেশ্বরের করুণাই সত্য। মাতা বালককে বিপত্তি হইতে রক্ষার জন্য ভয় দেখান কিন্তু বালক যখন কাঁদিয়া উঠে তখন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া কত না সান্ত্বনা করেন; সেইরূপ আমরা যখন পাপ-হ্রদে পড়িয়া ঈশ্বরের রুদ্র মুখ দেখি এবং ভয়ে শোকে তাপে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে থাকি তখন পতিত-পাবন পরমেশ্বর তাঁহার অমৃতময় প্রসন্ন মুখ দেখাইয়া আমাদের মৃত শরীরের জীবন সঞ্চার করেন। আমাদের দেশে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ যখন এত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে নাই—লোকের হৃদয়-তরী যখন এত ভগ্ন হয় নাই—যখন লোকে সুখ-শয্যায় শয়ান ছিল—তখন হইতে আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য ... কর্ণধার ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ অমোঘ আশ্রয়তরী আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ সকলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের উপরে ঝুলিতেছে; সম্পদের সময়েও এমন দিন না রবে—বিপদের সময়ে

এমন দিন না রবে ;—এখন আর আমাদের সে দিন নাই, এখন সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সুখ-শয্যা টলমলায়মান, এক এক মেঘের উত্থানে সান্ত্বনার দিক্ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে—এক এক বিদ্যুতের উন্মেষে বিপদের রসাতল মুখ ব্যাদান করিয়া উঠিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-ভেলা অবলম্বন করিবার এই মুখ্য সময়। এখন আর এ কথা বলিবার সময় নাই যে, "আজিকের রাত্রি নিদ্রা যাই, কাল প্রত্যূষে উঠিয়া ভেলা অবলম্বন করিব।" করুণাময় কর্ণধার ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ ভেলা লইয়া উপস্থিত, যে-ভেলা কাল-তরঙ্গের অধীর তাড়না হেলায় অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অমৃত সাগরে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে—সেই ভেলা লইয়া উপস্থিত—এখনি আইস আমরা তাহা অবলম্বন করি—এখনি আমরা নিরাপদ কূলে উপনীত হইব!

ব্রাহ্মধর্ম্ম-ভেলার উপকরণ সকল বড় প্রাচীন কাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। যে উপকরণের গুণে মিসর দেশীয় পাষাণস্তূপ চিরস্থায়ী হইয়া ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারীক'রীর প্রতি প্রবীণোচিত হাস্য করিতেছে—সে উপকরণই বা কত দৃঢ়। যে উপকরণের গুণে হিমালয় আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া এক কালে পৃথিবীর সমস্ত জলস্থল-শূন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—তাহাই বা কত দৃঢ়! এখন যে উপকরণের কথা বলিতেছি তাহা কালের কোন ধারই ধারে না—তাহা সত্য সত্যই অনন্ত-কাল চিরস্থায়ী। যাহা আত্মার ভিত্তি মূল—যাহা সমস্ত আকাশের—সমস্ত কালের—সমস্ত জগতের ভিত্তিমূল—তাহার ন্যায় দৃঢ় উপকরণ অস্থায়ী বিষয়-রাজ্যের কুত্রাপি মিলিতে পারে না,—ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ ভেলা সেই বিশ্ব-বিজয়ী কাল-বিজয়ী উপকরণে গঠিত—সেই ভেলা আশ্রয় করিয়া আইস আমরা এই আপদ-সাগরে নিরাপদ হই। আমাদের হৃদয় তরণী ভগ্ন-প্রায়—সংসার সমুদ্র অপার—বিদ্যা বিদ্যুতের উন্মেষে তরঙ্গ-ভঙ্গ শব্দায়মান হইয়া দেখা দিতেছে—কোথায় কোন্ রিপুর গুপ্ত শৈল তাহার কিছুই ঠিকানা নাই—এইবেলা আইস আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম তরির কর্ণধারকে করুণাময় পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তরিয়া যাই।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।

হে পরমাত্মন্ আমরা অদ্য তোমার বিশ্ববিজয়ী করুণার ভিখারী হইয়া এখানে সমাগত হইয়াছি—তোমার প্রসন্ন মুখ দেখা দিয়া আমাদের হৃদয়-বেদনা অপহরণ কর। যখন আমাদের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—আপনার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন এই ক্রন্দন-ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হয় "গভীর বেদনা অস্থির প্রাণ করহে আমারে শান্তি দান!" তোমার প্রেমামৃত—তোমার করুণামৃত আমাদের তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-পীয়ূষ। এককালে আমরা সকলকে ছাড়িয়া যাইব—সকলে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে—তখন যেমন তোমার করুণা আমাদের একমাত্র বল—এক মাত্র সম্বল—একমাত্র ভরসা, এখনো তেমনি তোমার প্রেমামৃতই আমাদের একমাত্র শান্তি-বারি; সংসার-সাগরের ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আমাদের হৃদয়-তরণী ভগ্ন করিয়া দিতেছে, তোমার করুণাই আমাদের একমাত্র বল-ভরসা। তাই আমরা তোমাকে ডাকিতেছি "আবিরাবীর্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"

আমাদের নিকট প্রকাশিত হও—তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই সময়োপযোগী সারবৎ উপদেশের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

দেওশাক। ঝাঁপতাল।

আশ্চর্য্য দেখি এক যোগী হৃদিগুহায়,
নিখিল জগত এক আনন্দ ঘেরা।
অতি ধীর গম্ভীর আপনে আপনি স্থির
না সেথায় দিন ভায় না নিশীথ তারা।
নাহি বাক্য সেথা যায়, ভাবনা ভাবে মিসায়,
দেশ-কাল করি দূর প্রেমরসে ভরপুর
মগন ভকত চিত আপন-হারা।

রাগিণী কুকভ—তাল খামার।

আর গো কত ঘুরি হইবে সারা
বনে বনে পথে পথে দ্বারে দ্বারে।
কে আছে নিজধামে দেখরে ফিরিয়ে,
প্রাণে প্রাণ পাইবে হেরিয়ে॥

রাগিণী ধুন। তাল ঠুংরি।

অন্ধ জনে দেহ আলো
মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত-সিন্ধু
কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম
প্রেম সলিলধারে
সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।
যে তোমারে ডাকে না হে
তারে তুমি ডাক ডাক।
তোমা হতে দূরে যে যায়
তারে তুমি রাখ' রাখ'।
তৃষিত যে জন ফিরে
তব সুধাসাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ নীরে
সুধা করাও হে পান।
তোমারে পেয়েছিনু যে
কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে
আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়,
সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়
হেরিনি প্রেম বয়ান,—
দরশন দাও হে দাও হে দাও
কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঝাঁপতাল।

হেরি তব বিমল মুখভাতি—
দূর হল গহন দুখ-রাতি।
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে
দিনু হৃদয় কমল দল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতি কণ লাগি,
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,
তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে
উঠিল ফুটি কত কুসুম পাঁতি
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।
ধ্বনিত বন বিহগ কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল,
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি গান করি কাননে,
উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।

রাগিণী রামকিরি—তাল ঝাঁপতাল।

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ হে তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে
তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন।
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন।

রাগিণী মিশ্র বেলাওল। তাল ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন

কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন।

রাগিণী খট্‌—তাল ঝাঁপতাল।

পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে।
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার পারে।
মধুর শীতল ছায়, শোক তাপ দূরে যায়,
করুণা কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে।

আসা ভৈরবী। তাল ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা
চলরে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখি কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে
সবারে কররে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে
জীবন কররে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে
চলরে সবারে শুনাই—
বলরে ডেকে বল "পিতার ঘরে চল
সেথায় শোক তাপ নাই।"

খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে কএকটী গীত স্বয়ং গাহিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত-সুধায় মুগ্ধ হন নাই প্রাতঃকালীন উপাসনায় এরূপ লোক বিরল। ঐ দিন অনেকেরই এই প্রাচীন কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস হইয়াছিল অনঙ্গ কলংহি সাম।

এই ১১ মাঘ সায়ংকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে ব্রহ্মোৎসব হয়। লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার হইয়াছিল। বহিঃপ্রদেশের তোরণ ও প্রাঙ্গণে বৈদ্যুতিক আলোক এবং সভাস্থলের চতুর্দ্দিকে গ্যাসের আলোক। সর্ব্বত্র পুষ্পপত্রের নানা রূপ রচনা গৃহের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। নিমন্ত্রিতের মধ্যে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত লোক অনেকেই ছিলেন। এইরূপ লোকসমাগম একটা বিশেষ উৎসাহের কারণ হইয়াছিল। শতাব্দ অতিক্রম করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে কিন্তু ইহার মধ্যে এক-মাত্র ব্রহ্মের নামে যে এত লোক সমবেত হন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। কিন্তু কএক বৎসরের পরীক্ষায় দেখা গেল শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুবিস্তীর্ণ গৃহেও উৎসব-দর্শনার্থীদিগের স্থান সঙ্কুলন হয় না। যাই হউক এই সংবাদ ব্রাহ্মদিগের বিশেষ আনন্দের হইবে সন্দেহ নাই।

যথা সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন কল্যাণ। তাল চৌতাল।

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত ধ্বনি
তাঁহার কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্য পথে হল বাহির।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
তাপ হরণ স্নেহ-কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে।

ফিরিছে যাত্রা পথে পথে,
ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখি জনে তুমি নেবে তুলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে।

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায়।
জগত পুরবাসী সবে কোথায় ধায়।
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান।
কোন সুধা করে পান।
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়।

অনন্তর আচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে উদ্বোধন করিলেন।

পিতা মাতার আশ্রয়-বঞ্চিত শিশু বহু কষ্টের পর মাতার আগমনে যেরূপ তৃপ্ত হয়; সখা-বিরহ কাতর ব্যক্তি বন্ধু-সমাগমে যেরূপ উল্লসিত হয়; চিরপ্রবাসী গৃহে প্রত্যাগমন নিমিত্ত যে প্রকার উৎসুক হয় ব্রাহ্মেরা এই উৎসব আগমন প্রতীক্ষায় সেইরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ এবং এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তদপেক্ষা সহস্র গুণে বিমলতর আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলের একমাত্র লক্ষ্য এবং মাতার স্নেহের এবং সখার প্রেমের আদি কারণ, যিনি আমাদের অন্তরাত্মা হইতেও প্রিয়তম এবং একমাত্র যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় স্থিতি করিতেছে অদ্য তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের প্রত্যাশায় আমরা সকলে সমাগত হইয়াছি।

এক্ষণে সংসারের পাপ-পঙ্কিল চিন্তা দূর করিয়া বিষয় প্রলোভনকে একবারে তুচ্ছ করিয়া আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতার পূজার নিমিত্ত আমরা প্রস্তুত হই। তাঁহার উপাসনার দ্বারা নূতন বল প্রাপ্ত না হইলে দুরূহ জীবন-পথে নিরুদ্বেগে শঙ্কাশূন্য হইয়া যাত্রা করিতে কখনই সক্ষম হইব না। অতএব আইস আমরা চতুর্দ্দিকের কোলাহলের প্রতি বধির হইয়া একাগ্র মনে সুদৃঢ় চিত্তে সেই দেবাদিদেব জগৎপাতার চরণে আত্ম সমর্পণ করি এবং আমাদের সমুদয় প্রীতি সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া কেবল তাঁহাতেই বদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হই।

পরে উপাসনা সমাপ্ত হইলে ভক্তি-ভাজন বাগ্মী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া একটী উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ অতিশয় সারগর্ভ ও মধুর হইয়াছিল। সারবত্তা ও বাক্য-সৌষ্ঠব রক্ষা করিয়া বাগ্মী অকাতরে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বলিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ ভাবে তাহা শুনিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। আমরা উপদেশটী প্রাপ্ত হইলে বারান্তরে প্রকাশ করিব। এই উপদেশের পর আচার্য্য শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয় বেদী হইতে এই উপদেশ পাঠ করেন।

শিবং সুন্দরং।

এই অখিল জগতের যিনি পিতা মাতা, তিনি শিবং সুন্দরং। তিনি শোভার আকর প্রেমের সাগর। সেই প্রেমানন্দ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" সেই প্রেম হইতেই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পর্ব্বত সমুদ্র নদী হ্রদ বৃক্ষ লতা ফল ফুল পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁর সেই অতুল সৌন্দর্য্যের ছায়া এই সকলের উপর পতিত হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য হইতেই প্রেমের উদ্দীপন হয়। ঈশ্বরের প্রেম কিন্তু অন্য কাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া উৎপন্ন হয় নাই, তিনি আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি পরিপূর্ণ এবং আপনার প্রেমে আপনি বিভোর হইয়া আছেন। তিনি মনুষ্যকে তাঁর এই শোভার ভাণ্ডার সংসারে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার হৃদয়ে প্রেম দিলেন। যদি প্রেম না থাকিত তবে কে এ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া সুখী হইত।

যিনি সেই প্রেমকে অবিকৃত রাখিয়াছেন, ও সাধন-বলে বৃদ্ধি করিয়াছেন, তিনি কি প্রাকৃতিক কি আধ্যাত্মিক উভয়বিধ শোভা অনুভব করিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন।

আত্মার স্বাভাবিক গতিই শোভার দিকে, মোহ যদি সেই গতি রোধ না করে। কেবল মাত্র বাহিরের শোভা দেখিয়া ইহা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহা আরো কিছু চায়—আরও কিছু অনুসন্ধান করে। সকল শোভা ভেদ করিয়া সে সেই শোভার আকর-স্থানে যাইতে স্পৃহান্বিত হয়। সেই অকৃত অমৃতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ ব্যতীত কিছুতেই তাঁহার প্রেম চরিতার্থ হয় না। তিনিই তাহার পরম গতি—তিনিই তাহার পরম লোক। সেই লোকে বাস করিতেই তাহার বিশেষ আনন্দ। মধুকর যেমন পুষ্পে বসিয়া অনন্যমনে তাহার মধুপান করে, আত্মা তেমনি পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধা পান করিতে ভালবাসে। সেই কি সন্ন্যাসী সেই কি যোগী যিনি গৃহত্যাগী হইয়া কেবল মাত্র ব্যায়াম-তুল্য যোগ-যাগ অভ্যাস করেন? না—কখনই নহে। তিনিই যোগী তিনিই প্রেমিক, যিনি এই প্রেমের সাহায্যে সেই শোভার আকর প্রেমময় পরমেশ্বরে উপনীত হইয়া নিঃসংশয়ে আপনাকে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন "এষাস্য পরমা গতিঃ—এষোস্য পরমো লোকঃ—এষাস্য পরমা সম্পৎ"। তিনিই প্রকৃত প্রেমিক যিনি তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা জানিয়া প্রিয়রূপে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করেন। অনুগত পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদেশ সকল—কঠোর আদেশ সকল পালন করিয়া তাঁহার প্রসাদ অনুভব করেন এবং [illegible]রাগের সহিত তাঁহার প্রেম-মুখ নি[illegible]রেন।

আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাহার জন্য কি না করিতে পারি? সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমী—যিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, তাঁহার প্রেম-মুখ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য—আরও স্ফুটতর রূপে দেখিবার জন্য কি না করিতে পারেন? সেই প্রসন্ন মুখ—সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করিবার জন্য তিনি সদাই পিপাসু। তাঁহার ধ্যান তাঁর নিকট যেমন মধুর এমন আর কিছুই নহে। যদিও তিনি আপনাকে অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে অন্বেষণ করেন। সে অন্বেষণেই তাঁর কত আনন্দ। প্রিয় জনের অন্বেষণে কি পথের ক্লেশ অনুভব হয়?

সাধক যখন এই প্রকারে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহার জন্য তদ্গত-প্রাণ হইয়া উঠেন, সে এক সময়! তখন কোথা হইতে অনুকূল বায়ু—কৃপা-পবন বহিতে থাকে। সেই কৃপা-পবনই অতি সহজে তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় পরমেশ্বরের চরণতলে আনিয়া দেয়। তিনি তখন প্রেমের ভরে ভক্তির আবেশে তাঁহাতে ডুবিয়া যান। সেই সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হয়েন। তখন আর তিনি আপনার নহেন, সম্যক রূপে তাঁর। তাঁহার অন্তরে তখন কি প্রেমের গান নিনাদিত হয়, তাহা এ জগতে অপ্রকাশ থাকে, তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া কি তাঁহাকে নিবেদন করেন, তাহা যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র তিনিই শুনিতে পান। সেই প্রেমদাতাও তখন কি মোহন রবে তাঁহার সাধককে আহ্বান করেন—কি অপার স্নেহের সহিত তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, কি অপ্রতিম সৌন্দর্য্য দ্বারা তাঁহাকে উদাস করিয়া তুলেন, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। সে অন্তরের ব্যাপার অন্তরেই থাকে, এবং চির দিনই অন্তরে থাকিবে। কি সুখের

সম্মিলন। তাঁহার স্পর্শসুখ কি গভীর—কি অবক্তব্য!!

কোথা প্রেমময় এ সময়ে—দুঃখী অকিঞ্চন যে এখন তোমাকেই চাহিতেছে, তোমাকেই যাচিতেছে। তোমার সৌন্দর্য্য আমাকে কি এক অপ্রতিহত প্রভাবে আকর্ষণ করিতেছে। আমি তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। খুলে দাও তোমার অমৃত নিকেতনের দ্বার। আমি তথায় প্রবেশ করিয়া চরিতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ঐ দিন শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল। আমরা তথাকারও একটী উৎকৃষ্ট উপদেশ পত্রস্থ করিলাম।

সম্বৎসর পরে আজ আমরা সকলে দুঃখ তাপ ভুলিয়া সেই পরম পিতার আনন্দময় ক্রোড়ে সমবেত হইয়াছি, এখানে মৃত্যু শোকের মধ্যে তাঁহার করুণা, দুঃখরোদনের মধ্যে তাঁহার আনন্দময় মূর্ত্তি, সংসারের সহস্র বিপদান্ধকারের মধ্যে তাঁহার জ্যোতি বিভাসিত দেখিতেছি; আর আমাদের কষ্ট নিরাশা নাই, দুঃখ ক্লেশ নাই, দ্বেষহিংসা, মান অভিমান নাই। অরুণ-কিরণে মুদিত শতদল যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সেই মহান প্রেমের প্রেম-রশ্মিতে আজ শত সহস্র দুঃখ-শোক-পীড়িত হৃদয়, স্নেহ, প্রেম, আনন্দে—নবীন ভাবে এক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহাকে দেখি নাই, যাহাকে পর বলিয়া জানিতাম, আজ দেখিতেছি সে আমার আপনার, আপনার বোন্ বলিয়া আজ তাহাকে হৃদয় আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। আজ আনন্দময়ী বিশ্বজননীর কোলে বসিয়া বিশ্বসংসারের সৌন্দর্য্য শোভা দেখিতেছি।

চন্দ্র সূর্য্য তারা নক্ষত্র লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে থাকিয়াও একটি বন্ধন-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ আত্মার সহিত আত্মার যে বন্ধন তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমরা সকলে সেই মহান আত্মার অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। পিতা মাতার স্নেহে, স্বামী স্ত্রীর প্রেমে, ভাই ভগিনীর ভালবাসায়, মনুষ্যের প্রীতিতে, সকলের মধ্যেই এক সেই আকর্ষণ শক্তি বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর লক্ষ্য যেমন সূর্য্যের দিকে, আমাদের লক্ষ্য তেমনি সেই মহান প্রেমের দিকে, এ লক্ষ্য-হীন হইয়া সংসারের সহস্র সুখে আমাদের তৃপ্তি নাই। এ লক্ষ্য পথে আজ আমরা যাত্রী, তাই আমাদের হৃদয় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজ আমাদের এত আনন্দ।

কিন্তু আজিকার এই আনন্দ কি কেবল একদিনের জন্য? আজিকার এই পবিত্রভাব কি অল্প ক্ষণের মধ্যেই সংসারের মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। আজিকার এই প্রেম ভাব মুহূর্ত্তে লয় পাইয়া আবার দ্বেষহিংসা স্বার্থপরতা লইয়াই কি জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিব? তাহা হইলে আমাদের লক্ষ্য সাধন হইল কই? যদি যথার্থই আমরা লক্ষ্য সাধন করিতে চাই, তাঁহাকে জানিতে ব্যগ্র হই, তবে এক মুহূর্ত্তের জন্য নয়, একদিনের জন্য নয়, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতিদিন, সমস্ত জীবন দ্বেষ হিংসা স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মপর ভুলিয়া ভালবাসিতে হইবে, তবে এক মুহূর্ত্তের জন্য নয়, এক দিনের জন্য নয়, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতিদিন, সমস্ত জীবন সংসারের মোহ তাপ হইতে আত্মাকে দূরে রাখিতে হইবে।

উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা, কিম্বা

শরীরকে মাত্র কষ্ট দেওয়াই সংসারের মোহ ত্যাগ নহে।

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্।

যাঁহারা মন বাক্য কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন—সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন—যাঁহারা শরীর শোষণ করেন—তাঁহারা তপস্যা করেন না।

যিনি সংসারের মোহ ত্যাগ করিবেন—তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর হইবেন না, জনক রাজার ন্যায় তাঁহার শরীর মন সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার আধ্যাত্মিক বৃত্তি উচ্চ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে; শারীরিক বিষয়ে পৃথিবীতে থাকিয়াও তিনি আধ্যাত্মিক উচ্চ জগতে বিরাজিত থাকিবেন।

কায়মনোবাক্যে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করাই যথার্থ মোহ ত্যাগ।

হস্ত পদ দ্বারা আমরা যাহা করি তাহাই যে কর্ম্ম এমন নহে, আমাদের মন দিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও যখন যে চিন্তাটী চলিয়া যায় তাহাও এক একটি কর্ম্ম। এই কর্ম্মের উপরেই আমাদের সুখ দুঃখ উন্নতি অধোগতি নির্ভর করিতেছে।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ।

মানসিক বাচনিক এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে, আর মনুষ্যদিগের উত্তম-মধ্যম অধম তিন প্রকার গতি কর্ম্ম দ্বারা হয়।

আমরা ক্ষণকালের জন্যও মিথ্যা দ্বেষ হিংসায় জড়িত হইয়া যখন যা মন্দ কর্ম্ম সঞ্চয় করি, তাহা আর ফেরে না, তাহার ফলভোগ করিতেই হয়, আর সৎকর্ম্ম দ্বারা [illegible] দণ্ডের অপর দিক [illegible] করিতে পারিলে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। ভাল কার্য্যের ভাল ফল, মন্দ কার্য্যের মন্দ ফল ভোগ করিবার অদম্য নিয়ম বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত, ইহাতে নিয়ন্তারি করুণা আমরা দেখিতে পাইতেছি। মন্দ কর্ম্ম করিয়া যদি আমরা তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি না দেখিতাম তাহা হইলে আমাদের সংশোধিত হইবার আর উপায় ছিল না। প্রকৃত পক্ষে সুখ দুঃখ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের উন্নতি, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ-সাধন। হর্ষশোকে বিপদ সম্পদে দুঃখ-আনন্দে যাহাতেই আমাদের এ উদ্দেশ্য সাধন হয় তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়—তাহাই আমাদের যথার্থ মঙ্গল।

আমাদের আত্মা দর্পণের মত, দর্পণ নির্ম্মল না হইলে তাহাতে যেমন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট ফুটে না—আত্মা নির্ম্মল না করিতে পারিলে আমরা সেই মহান্ আত্মার আলোক প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই না। সুতরাং যদি আমরা সেই শুদ্ধ সত্যের নিকট পৌঁছিতে চাই তবে বিশুদ্ধ হইবার পরিশ্রমে কাতর হইলে চলিবে না। এক দিনে আমাদের এ শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না, আমরা মানুষ, অপূর্ণ, দুর্ব্বল, কিন্তু যদি প্রবৃত্তির অধীন হইব না বলিয়া ক্রমাগত তাহাকে বশে আনিতে চেষ্টা করি—তবে অবশ্যই তাহার উপর জয়লাভ করিতে পারিব। সাহস করিলে কার্য্য আরম্ভ করা কঠিন নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছার প্রয়োজন। যদি ধৈর্য্য সহকারে ক্রমাগত আমরা বিশুদ্ধ হইবার ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রধান বিপদ—প্রবৃত্তি অবশ্যই ক্রমে দমন হইবে। আর একবার প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হইলে, তখন মনে হইবে এ কার্য্য কেন এত কঠিন ভাবিয়া ছিলাম।

ভাবিয়া দেখিলে এই পৃথিবী কতদিনের জন্য? আজ যাহাকে দেখিতেছি, কিছুদিন পরে আর তাহাকে দেখিতে পাই না, আজ আমি আছি কাল হয়ত থাকিব না, দেখিতে দেখিতে পলে পলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া আসিতেছে, কাল চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে জীবনের কাজ কতটুকু করিয়া রাখিতেছি। যদি প্রতিক্ষণে জীবনের এই অনিত্যতা ভাবিয়া দেখি, আশু সুখের জন্য কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি আসিলে যদি ভাবিয়া দেখি সেই সুখ কতক্ষণের জন্য, তাহা হইলে সহজেই সে কাজ হইতে ফিরিতে বল পাই।

বাস্তবিক পক্ষে অপবিত্রতায় অধর্ম্মে সুখ কোথায়? এ সুখ বাহিরে দেখিতে সুন্দর—কিন্তু ভিতরে বিষময়, যদি যথার্থ সুখ শান্তি পাইতে হয়—ত ধর্ম্মে, পবিত্রতায়, পুণ্যকর্ম্মে। ধর্ম্মের পবিত্র পরমানন্দ—মৃত্যু কাল দুঃখ যন্ত্রণা বিনাশ করিতে পারে না; তাহা সর্ব্বজয়ী হইয়া বিরাজ করে, তাহা মৃত্যু শোক-তাপের অতীত সেই অমর শুদ্ধ সত্য নিরঞ্জনের নিকট আমাদের পৌঁছিয়া দেয়।

তাই বলিতেছি—ভগিনীগণ আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্ত আমাদিগকে পবিত্র শান্তিনিকেতনে লইয়া আসিয়াছে, বিবাদ কলহ ভুলিয়া যে মুহূর্ত্তে সকল ভাই বোনে একসঙ্গে মায়ের স্নেহের কোলে বসিয়া মায়ের প্রেমের উৎস-মধ্যে ডুবিয়া পড়িয়াছি সে মুহূর্ত্ত যেন আমরা চলিয়া যাইতে না দিই। আজিকার এই স্মৃতি আজিকার এই প্রেম যেন চিরদিনের আনন্দ চিরদিনের আলোক হইয়া আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার জীবনের পথ দেখাইয়া চলে। এস বোনে বোনে মিলিয়া এক প্রাণে এক তানে আমাদের মায়ের কাছে আজ এই ভিক্ষা চাহিয়া লই।

মা জগৎজননি, বড় আশা করিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি মা, তুমি তোমার দীন হীন অবোধ অজ্ঞান সন্তান দিগকে কোলে তুলিয়া লইয়া জ্ঞান শিক্ষা দাও। আমরা নিতান্ত শিশু মা, আমরা এখনো কি জ্ঞান কি অজ্ঞান সব বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কি ভাল কি মন্দ সব বাছিয়া লইতে জানি না, যতটুকু বা জানি যতটুকু বা বুঝি—তাহাও কাজে করিয়া উঠিতে পারি না—আমরা তোমার এমনি দুর্ব্বল—এমনি অন্ধ সন্তান। এ অন্ধ সন্তানেরা মায়ের কাছে থাকিয়াও যে মাকে দেখিতে পাইতেছে না, ভাই বোনে একত্র থাকিয়াও যে কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, আপনার লোককে দেখিবার জন্য যখন প্রাণ আকুল ব্যাকুল করিয়া উঠিতেছে—যখন আপনার লোককে আপনার করিতে মর্ম্মান্তিক বাসনা হইতেছে, তখনো যে দেখিবার ক্ষমতা নাই মা, এ দুঃখ তুমি না ঘুচাইলে কে ঘুচাইবে? প্রাণের এ আকাঙ্ক্ষা তুমি না পুরাইলে কে পুরাইবে জননি? তুমি মাতা আমাদের এ মোহান্ধকার ঘুচাইয়া সত্যের আলোকে হৃদয় উজ্জ্বল কর, আজ তোমার প্রেম-কণাদানে আমাদের যে নবজীবন দিয়াছ যে দিব্য চক্ষু ফুটাইয়াছ, চিরজীবন আমাদের হৃদয়ে তাহা জ্বলন্ত রাখিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবারণ কর—তোমার স্নেহদুগ্ধে আমাদিগকে সবল কর, তোমার অমৃত ক্রোড়ে আমাদের স্থান দিয়া পাপ তাপ অজ্ঞান অন্ধকার হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ—আমরা আজ তোমার চরণতলে নিপতিত হইয়া সকলে মিলিয়া করযোড়ে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

স্থানাভাবে এবারে উৎসবের [illegible] সঙ্গীত পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইল না।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
চৈত্র ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ

৫১২ সংখ্যা

১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

জলধি।

যে দিকে তাকাই দেখিতে না পাই
কোথা সীমানা?
ভাসিয়া ভাসিয়া যেতেছি চলিয়া
নাহি ঠিকানা।
দিক্ কি বিদিক্ নাহি হয় ঠিক্
পাথার ধূধূ,
শুধাইতে বাণী নাহি অন্য প্রাণী
নীরব শুধু।
অনন্ত আকাশ কেবল বিকাশ
কিছু না হেরি,
ইন্দ্রিয় আকুল নাহি পেয়ে কূল
উঠিছে ভরি।
"কোথায় কোথায়" পরাণ শুধায়,
প্রাণের মাঝে,
নিরাশার হাসি— প্রতিধ্বনি আসি
হৃদয়ে বাজে।
আতঙ্কে এ তনু হয়ে পরমাণু
ছুটিতে চায়,
চরণ স্মরিয়া মরণ ভরিয়া
ডাকিনু তাঁয়।
মহাশূন্য চিরি বিদ্যুৎ বিস্ফুরি
আঁধার ঘোরে
কে সুধা ঢালিল? প্রাণ সঞ্চারিল
বলিল মোরে—
মহা পারাবার শাসন যাঁহার
বহন করে
পারাবার মাঝে সে সিন্ধু বিরাজে
ভয় কি? ওরে!

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩ ফাল্গুন রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরমাত্মার উপাসনার জন্য আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। সংসারের সমস্ত ভাবনা চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আইস আমরা জ্ঞানময় প্রেমময় পরমাত্মার প্রতি মনকে সমাহিত করি। আমাদের সম্মুখে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, কোন পূজার সামগ্রীর আয়োজন নাই, বাহিরের কোন ঘটা আড়ম্বর নাই, কিসে আমাদের মন আকৃষ্ট হইবে? আমাদের যিনি দেবতা তাঁহার নাম নাই— কি বলিয়া আমরা তাঁহাকে ডাকিব? তাঁহার রূপ নাই, কিরূপে আমরা তাঁহাকে দেখিব? তাঁহার উপমা নাই, কি প্রকারে আমরা তাঁ-

হাকে ধ্যান করিব? ইহার উত্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন

"শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মনোবাত্মানং পশ্যতি ;

শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া সাধক আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন।"

আমাদের মন এক হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে থাকে, কোন বিষয়েই স্থির থাকিতে চায় না; যে কোন বিষয়ে মনকে বাঁধিয়া রাখ না, তাহার কিয়ৎকাল পরেই মন তথা হইতে বাহিরে যাইবার পথ অন্বেষণ করিবে; এক স্থান হইতে বাহিরে বিচরণ করিবার সংস্কার আমাদের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের উপাস্য দেবতাকে আমরা বাহিরে দেখিতে না পাইলে আমরা মনে করি যে অন্তরে দেখা দেখাই নহে। আমাদের মনের এইরূপ বহির্মুখী সংস্কার অনেক দিনের সংস্কার তাহার পরিবর্ত্তন এক দিনে হইতে পারে না; দীর্ঘ কাল ধরিয়া সাধন করিলে তবেই অল্পে অল্পে তাহাতে আমরা কৃত-কার্য্য হইতে পারি! আমাদের মনে যেমন বহির্মুখী সংস্কার প্রবল, যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির মনে অন্তর্মুখী সংস্কার সেইরূপ প্রবল হইয়া উঠে তবে তাঁহার মন আর উদাসীনের ন্যায় মাতৃহীন পিতৃহীনের ন্যায়, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় না; পরমাত্মার প্রেমে তাঁহার মন এমনি বাঁধা পড়িয়া যায় যে সেখান হইতে কেহই তাঁহার সে মনকে উঠাইয়া আনিতে পারে না; কার্য্য-কালে মন পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া কার্য্য করে, বিরাম-কালে মন পরমাত্মার ক্রোড়ে শান্তি-সুখে নিমগ্ন হয়। প্রেম কি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানেন যে, মনের প্রেম যেখানে নিবদ্ধ হয় সেখান হইতে মনকে আর কোথাও ফিরানো দুষ্কর। মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছে এ অবস্থায় দৈব-যোগে যদি তাহাকে অজ্ঞাতসারে প্রেম আসিয়া অধিকার করে তবে তাহার বিক্ষেপ একেবারেই স্থগিত হইয়া যায়,—একই প্রেমের বস্তু তাহার তপ জপ ও ধ্যান হইয়া উঠে। এ ঘটনাটি আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? এই শিক্ষা দিতেছে, যে, বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সংস্কার মনের একমাত্র সংস্কার নহে,—নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হইয়া মন একমাত্র বস্তুতেও নিমগ্ন হইতে পারে,—ইহাতে অসম্ভব বা অলৌকিক কিছুই নাই; প্রেমী ব্যক্তির মন একমাত্র প্রেমের বস্তুতে দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকে ইহা পরীক্ষার কথা। গৃহস্থ ব্যক্তির প্রেম স্ত্রী পুত্র পরিবারে বদ্ধ থাকে—ইহাই প্রেমের প্রথম সোপান; এই প্রেম যদি ঈশ্বর-প্রেমের সহিত সংযুক্ত হয় তবেই ইহা অতি পবিত্র প্রেম হইয়া উঠে। উদাসীন ব্যক্তির মনে প্রেমের ভাব দুর্ঘট; অগ্রে প্রেমের ভাব মনে অধিকার না পাইলে ঈশ্বর-প্রেম কোথা হইতে আসিবে? গৃহস্থ ব্যক্তি শৈশব কাল হইতে স্নেহ প্রেমের অধিকারে বাস করিতেছে—গৃহস্থ ব্যক্তিই সহজে ঈশ্বর-প্রেমের স্বর্গদ্বারে উপনীত হইতে পারে। এই জন্য ঈশ্বর-প্রেম সাধনের জন্য গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রম বলিয়া সকল শাস্ত্রে গীত হইয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণী কিয়ৎদূর খনন করিয়া যদি ক্ষান্ত হওয়া যায় তাহা হইলে প্রত্যেক বর্ষা ঋতুতে চতুষ্পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা বিগলিত হইয়া তাহাকে অল্প কালের মধ্যেই পঙ্কপূর্ণ করিয়া তোলে; এই জন্য যে পর্য্যন্ত না পাতালের জল নাগাল পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত গভীরে খনন করা কর্ত্তব্য; গার্হস্থ্য প্রেমের গভীরতা এবং পবিত্রতা সাধন ক-

রিয়া তাহাকে ঈশ্বর-প্রেমের সহিত সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য। গৃহ এইরূপ সংযোগ সাধনের পরম উপযোগী বলিয়াই তাহা আশ্রম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গৃহ এত যে পবিত্র আশ্রম—কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম হইতে বিচ্যুত হইলে আর তাহা আশ্রম থাকে না—তাহা কঠোর কারাগার হইয়া উঠে, ভীষণ অরণ্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শুধু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম সেটা কথার কথা; ঈশ্বর-ভ্রষ্ট মনুষ্য-প্রেম কাহারো অবলম্বন ব্যতীত এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে পারে না—ইহা জানা কথা। পৃথিবী হইতে কখন বিচ্যুত হইয়া উঠিতে পারে না—সত্য-ভূমি হইতে অপার প্রেম জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ঈশ্বর ভ্রষ্ট গৃহে সম্পদ বিপদকে সঙ্গে করিয়া আনে, প্রেম বিবাদ-কলহ সঙ্গে করিয়া আনে, দর্প-আস্ফালন পতনকে সঙ্গে করিয়া আনে, লক্ষ্মী শনিকে সঙ্গে করিয়া আনে। ঈশ্বর যে গৃহের উপাস্য দেবতা সেই গৃহই প্রেমের পবিত্র আশ্রম। মূল হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ যেমন শাখাপত্র ফল-ফুলে শোভিত হয়, সে গৃহ সেইরূপ, ঈশ্বরের স্বর্গীয় অমৃত আকর্ষণ করিয়া জ্ঞান প্রেম কল্যাণে শোভিত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেক।

দিবসের প্রারম্ভে শান্ত দান্ত হইয়া পরমাত্মাতে মনকে সমাহিত করা গৃহস্থ ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য। বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মাতে সমাহিত করা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কঠিন ঠেকিতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি ক্রমে যত বর্দ্ধিত হইবে ততই তাহা আনন্দের প্রস্রবণ হইয়া উঠিবে। সেই এক অদ্বিতীয় অনুপম পরমাত্মাকে আমরা অন্তরে পাইলে সকলকেই আমরা অন্তরে পাই—কেননা সকলেই পরমাত্মার অন্তর্ভূত। তখন বাহিরের যাহা কিছু সমস্তই অন্তরের হইয়া উঠে; ভ্রাতা তখন অন্তরের ভ্রাতা হয়, স্ত্রী পুত্র অন্তরের স্ত্রী-পুত্র হয়, পিতামাতা অন্তরের পিতামাতা হ'ন,—মূলকে অন্তরে পাইলে আমরা সকলকেই অন্তরে পাই।

জীব একদিকে দেখা যায় যে, সাংসারিক শোক-তাপের তীব্রতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান যেমন পরম মহৌষধ এমন আর কিছুই নহে। দুঃখ-শোকের অধিকাংশই আমাদের মনের বদ্ধমূল সংস্কারের উপর নির্ভর করে, সেসকল সংস্কার [illegible] ন্যায় আমরা আপনারাই নির্ম্মাণ করি এবং আপনারাই তাহাতে জড়াইয়া পড়ি। দেশাচার-মূলক কুসংস্কারকেই আমরা সচরাচর কুসংস্কার বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি; কিন্তু তদ্ব্যতীত আরো অনেক কুসংস্কার আমাদের আছে;—আমাদের যে-টা মনের ইচ্ছা তাহা সত্য না হইলেও তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি—ইহাই বহু কুসংস্কারের মূল। যাঁহারা অনেক কাল সম্পদের উচ্চ শিখরে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সে সম্পদের জন্য তাঁহাদিগকে কোন আয়াস পাইতে হয় না, তথাপি এই এক ইচ্ছা-মাত্র তাঁহাদের মনকে অধিকার করিয়া রহে যে, এ সম্পদ্ চিরস্থায়ী হউক, এবং শুদ্ধ সেই ইচ্ছার বলে তাঁহারা মনে করেন যে, ধন জন যৌবন সকলই চিরস্থায়ী; এইরূপ কুসংস্কার কোন কোন মূঢ় ব্যক্তির চক্ষে এরূপ ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে যে, সে যখন অপব্যয় দ্বারা স্বীয় সম্পত্তি বিনাশ করিতে থাকে—তখনও মনে করে যে, সে তাহার সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার নহে। আমাদের যাহা বহুকালের সংস্কার তাহাই আমাদের ইচ্ছা হইয়া দাঁড়ায়, এবং সেই ইচ্ছাই আমাদের সত্যাসত্য ও সুখ

দুঃখের একমাত্র প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে প্রকার অমূলক সংস্কার আমরা আপনারাই আপনাদের স্কন্ধে আরোপ করি—সুতরাং তাহা কৃত্রিম। বাহিরের বিষয়-সকল আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে কিন্তু আমরা তাহাদিগকে ছাড়িতেছি না,—একবার আমরা বিশ্বাস করিয়াছি যে তাহারাই চিরস্থায়ী, এই জন্য তাহারা চলিয়া গেলেও, আমরা এটা মনে করিতে পারি না যে, তাহারা চিরস্থায়ী নয়। পরমাত্মাতে আত্মাকে সমাহিত করিতে পারিলে এই সকল কুসংস্কার শিথিল হইয়া পড়ে—সুতরাং সেই কুসংস্কার-মূলক দুঃখ-শোকও শিথিল হইয়া পড়ে,—এবং তাহার স্থানে সত্য-জ্ঞান-মূলক অটল ব্রহ্মানন্দ উদ্বোধিত হয়।

হে পরমাত্মন্! আমাদের পতনশীল দুর্ব্বল হৃদয়কে তোমার প্রেমামৃত সিঞ্চনে সজীব কর, অন্ধকারকে আমাদের সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেও, একবার তোমার রশ্মি-কণায় আমাদের আকুল নয়ন সার্থক হউক্; আমাদের হৃদয় হইতে প্রেম উত্থিত হইয়া তোমার মাধুর্য্যে বিলীন হইতে চায়, তোমার মুখের আলোকে তুমি তাহাকে পথ প্রদর্শন কর—এ দীন হৃদয় তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় গিয়া শীতল হইবে! সংসারের মৃগতৃষ্ণিকার পাছু পাছু কতদিন অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিবে! তোমার এক বিন্দু প্রেম-কণিকা নিখিলের জীবন—সেই অমৃত-বিন্দুতে তরুলতা মঞ্জরিত হয়—তাহাতেই পশু পক্ষী চেতন পায়—তাহাতেই মনুষ্যের আত্মা অমরত্ব লাভ করে। সেই অমৃত-বিন্দু হৃদয়ে পাইয়া হৃদয়ের সমস্ত বেদনা দূর করিব এই জন্য আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি—তুমি আমাদিগকে শান্তিদান করিয়া চিরদিনের মত কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাংখ্য-সূত্রের ব্যাখ্যা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

অষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধি আট প্রকার। কি কি? তাহা বলিতেছি।

তত্ত্ব আলোচনার দ্বারা চব্বিশ তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে তাদৃশী সিদ্ধি প্রথমা ও প্রধান বলিয়া গণ্য। এই প্রথমা সিদ্ধির নাম "পরা" (১)। শ্রবণ মাত্রেই যদি বস্তুতত্ত্ব বোধ হয় তবে তাহা দ্বিতীয়া সিদ্ধি বলিয়া গণ্য। এই দ্বিতীয়া সিদ্ধির নাম "সুপারা" (২)। অধ্যয়ন সমকালে জ্ঞান জন্মিলে তাহা তৃতীয়া এবং তাহার শাস্ত্রীয় নাম "প্রমোদা" (৩)। সাধনার দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখ নিবারণ করিয়া জ্ঞান জন্মাইতে পারিলে তাহা চতুর্থী সিদ্ধি বলিয়া গণ্য। এই চতুর্থী সিদ্ধির অন্য নাম "রম্যা" (৪)। পরিচর্য্যার দ্বারা অথবা ধনদানাদি দ্বারা জ্ঞানীর পরিতোষ জন্মাইয়া জ্ঞান লাভ করিলে তাহাও সিদ্ধি নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চমী সিদ্ধির পারিভাষিক নাম "প্রমোদমানা" (৫)। জ্ঞানীর সংসর্গে থাকিয়া জ্ঞান লাভ করিলে তাহা "রম্যফলা" নামক ষষ্ঠী সিদ্ধি। গুরু যদি পরিচর্য্যার দ্বারা অথবা দানের দ্বারা পরিতুষ্ট হন, হইয়া জ্ঞানচক্ষু বিতরণ করেন; তাহা হইলে সেই সপ্তমী সিদ্ধির নাম "মুদিতা" (৭)। এতদ্ভিন্ন অষ্টমী সিদ্ধি আছে, তাহা যোগ-প্রভব এবং শাস্ত্রীয় নাম উত্তমা। এই প্রকারে সাংখ্যবাদীদিগের আট্ প্রকার সিদ্ধির ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

দশ মূলিকার্থাঃ ॥ ১৫ ॥

সাংখ্য শাস্ত্রের মূল অর্থ অর্থাৎ প্রধান অভিধেয় দশ। যথা;—

আস্তিত্ব (১), একত্ব (২), অর্থবত্ত্ব (৩), পরত্ব (৪), অন্যত্ব (৫), অকর্তৃত্ব (৬), যোগ-

বিয়োগবত্ব (৭-৮), পুরুষবহুত্ব (৯) ও দেহ স্থিতি বা শেষ বৃত্তি (১০)।

১ অস্তিত্ব।—জগতের কারণ আছে; তাহা অব্যক্ত; এবং পুরুষ আছেন; তিনি ভোক্তা। এইরূপে কারণের অস্তিত্ব ও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

২. একত্ব—জগতের মূল কারণ এক; তাহার শাস্ত্রীয় নাম "প্রধান" ও "প্রকৃতি", ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম সকল তাহারই অঙ্গসমুদ্ভূত; সুতরাং মূল কারণ এক; এবম্প্রকারে কারণের একত্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।

৩ অর্থবত্ত্ব।—যাহা মূল কারণ তাহা সুখ-দুঃখ-মোহরূপা; সুতরাং তাহার অর্থবত্ত্ব সাকল্য বা প্রয়োজনবত্ত্ব আছে।

৪ পরত্ব।— ... ...

৫ অন্যত্ব।—জগৎকারণ প্রধান পুরুষ হইতে ভিন্ন, ইহা ত্রিগুণত্বাদি হেতুর দ্বারা অনুমিত হয়। অর্থাৎ প্রধান ত্রিগুণ; কিন্তু পুরুষ নির্গুণ; এবং ক্রমেই প্রধানের ভিন্নতা সিদ্ধি হয়।

৬ অকর্তৃত্ব।—পুরুষ চৈতন্যমাত্র স্বভাব সুতরাং পুরুষ কিছু করেন না; প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন; এইরূপ যুক্তিতে পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

৭ যোগবত্ত্ব।—প্রকৃতি পুরুষকে আত্মরূপ দেখান, ভোগ জন্মান, এবং পুরুষের জন্যই তাহার প্রবৃত্তি বা পরিনাম হয়; এজন্য তাঁহাতে যোগবত্ত্ব আছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতির সহিত পুরুষের উল্লিখিত প্রকার সম্বন্ধ আছে।

৮ বিয়োগবত্ত্ব।—বিবেক জ্ঞানে প্রকৃতি পুরুষ দর্শন হইলে শরীর নাশের পরক্ষণেই প্রকৃতি-বিয়োগ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রকৃতি-সম্বন্ধ থাকে না।

৯ পুরুষ বহুত্ব।—পুরুষ এক নহে, বহু। যত শরীর তত পুরুষ; ইহা জন্মমরণাদির সুব্যবস্থা দেখিয়া অনুভব করা যায়।

১০ শেষ বৃত্তি।—প্রকৃতি সাক্ষাৎকার হইবা মাত্রেই আত্মাতে প্রকৃতি-সম্বন্ধ ছেদ হয় সত্য; কিন্তু চক্রগতির ন্যায় কিঞ্চিৎ কাল তাহার অনুবর্ত্তন থাকে; সেই জন্যই জীবদ্দশায় প্রকৃতিমুক্তি হয় না; বিদেহ না হওয়া পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাভাস থাকে।

এই দশ প্রকার মূল অর্থ (মুখ্য অভিধেয়) সাংখ্য সপ্ততি গ্রন্থে বিবৃত আছে। পঞ্চাশৎ প্রকার বুদ্ধি ও এই দশ প্রকার বিজ্ঞেয়, ষষ্ঠি প্রকার পদার্থের ব্যাখ্যা বা উপদেশ থাকায় সাংখ্য শাস্ত্রকে লোকে ষষ্ঠিতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করে।

অনুগ্রহঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

অনুগ্রহের নাম সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি।

অনুগ্রহ কি? কাহার প্রতি কাহার অনুগ্রহ? বলিতেছি, শুনুন।

ব্রাহ্মণ শকুকের (?) পদ্মস্ ব্রহ্মা; তিনি তন্মাত্রের প্রতি ধ্যানরূপ অনুগ্রহ করেন। করিলে তাহা হইতেই সৃষ্টি হয়।

চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গঃ ॥ ১৭ ॥

ভূতসৃষ্টি অর্থাৎ জীব সৃষ্টি চৌদ্দ প্রকার। অভিপ্রায় এই যে, সমুদায়ে চৌদ্দ প্রকার জীব শরীর বিদ্যমান আছে। যথা;—

দৈব, পৈশাচ, রাক্ষস, যাক্ষ, গান্ধর্ব্ব, ঐন্দ্র, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম,—এই আট প্রকার দেবযোনি এবং পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর,—এই পাঁচ প্রকার তির্য্যক্‌যোনি এবং এক প্রকার মনুষ্যযোনি, সমুদায়ে চৌদ্দ প্রকার ভৌতিক সৃষ্টি; ইহা অবধারণ করিবে।

ত্রিবিধোবন্ধঃ ॥ ১৮ ॥

বন্ধন তিন প্রকার। কি কি? তাহা বলিতেছি।

প্রাকৃত বন্ধন, বৈকারিক বন্ধন, এবং দক্ষিণা বন্ধন। আট প্রকার প্রকৃতির কোনও

একটিতে আত্মাভিমান থাকিলে তজ্জনিত বন্ধনকে প্রাকৃত-বন্ধন নাম দেওয়া যায়। বিকার সমূহের দ্বারা (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা) স্বস্বরূপপ্রচ্যুত থাকায় অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকায় তজ্জনিত বন্ধনের নাম বৈকারিক বন্ধন। অভিমান পূর্ব্বক দক্ষিণা-দানসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিজনিত বন্ধন দক্ষিণা-বন্ধন। যোগীরা পূর্ব্বোক্ত বন্ধনে বদ্ধ হন, যথা পশুপতি ও পঞ্চরাত্রি পুরুষ প্রায়ই বৈকারিক বন্ধনে বদ্ধ থাকেন এবং কাম্যক যজ্ঞকারী ও কর্ম্মী পুরুষেরা প্রায় নিকৃষ্টতম দক্ষিণা বন্ধনে বদ্ধ হন। যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা এই ত্রিবিধ বন্ধন ছেদনের জন্য সদোদ্যুক্ত থাকেন এবং বিবেকাভ্যাস দ্বারা ক্রমে বন্ধন ছেদনের জ্ঞান অসি (বিবেক জ্ঞান) নিকটস্থ করেন।

ত্রিবিধো মোক্ষঃ ॥ ১৯ ॥

মোক্ষও তিন প্রকার।

প্রথম জ্ঞানের উদ্রেক, ২য় ইন্দ্রিয়ের রাগশান্তি বা বিষয়-বৈমুখ্য, এবং তৃতীয় কর্ম্মক্ষয়। জ্ঞানোদ্রেক হইলে আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াসক্তি নাশ হইলে পাপ পুণ্য উৎপন্ন হয় না, ক্রমে পাপ পুণ্যের অভাবে প্রকৃতি পরিত্যাগ রূপ মোক্ষ হয়।

ত্রিবিধং প্রমাণম্ ॥ ২০ ॥

প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ (১); অনুমান (২), এবং আপ্তবাক্য (৩)। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে অব্যভিচরিত জ্ঞান জন্মায়, তাহা প্রত্যক্ষ, হেতু দর্শনের পর যে তৎসম্বন্ধ বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা অনুমান এবং অপৌরুষেয় শাস্ত্র বাক্য সকল আপ্ত। এই তিন প্রকার প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় বস্তু জানা যায়, প্রত্যেকে সত্য পদার্থ সিদ্ধ হয়।

ত্রিবিধং দুঃখম্ ॥ ২১ ॥

দুঃখও তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক (১), আধিদৈবিক (২), এবং আধিভৌতিক (৩)। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার;— শারীর ও মানস। শরীরের বাতাদি ধাতু অসমান হইলে তাহা হইতে যে রোগ-নামক ব্যথা জন্মে সেই ব্যথাকেই আমরা শারীর দুঃখ বলি। ক্রোধাদি মনোবৃত্তির প্রাবল্যে মনোমধ্যে যে তাপ রূপ দুঃখ জন্মে সে দুঃখ মানস নামে অভিহিত হয়। যে দুঃখ মনুষ্যাদি প্রাণীর দ্বারা উৎপন্ন হয় সে দুঃখ আধিভৌতিক এবং শীতোষ্ণ বর্ষাদি-সমুদ্ভব দুঃখ সকল আধিদৈবিক।

নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি।

নব্য বঙ্গ কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই,—যে বঙ্গ আমাদের চক্ষের সামনে দেদীপ্যমান তাহাই নব্য বঙ্গ। এ বঙ্গের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? নব্য বঙ্গ অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়ে নাই,—বায়ুর অলক্ষিত সঞ্চারে দুগ্ধে যেমন ক্রমে ক্রমে সর পড়ে, সেইরূপ কালের চাপল্য-বিহীন আলস্য-বিহীন হস্তের অলক্ষিত সঞ্চালনে পুরাতন বঙ্গ হইতে নূতন বঙ্গ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। নব্য বঙ্গের অঙ্গ-সাধনে তিন বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কার্য্য-কারিতা নয়ন-গোচর হয়; অন্তঃপুরের হিন্দু আচার ব্যবহারে স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের কার্য্য-কারিতা, বৈঠকখানার বাবুগিরিতে মুসলমানদিগের কার্য্য-কারিতা, এবং সভাস্থলের বক্তৃতায় ও সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধে ইংরাজি বিদ্যালয়ের কার্য্য-কারিতা স্পষ্টাক্ষরে লক্ষিত হয়। হিন্দু নবদ্বীপ, মুসলমান মুরশিদাবাদ এবং ই-

রাজি কলিকাতা, এই তিন স্থানের তিন সভ্যতা-স্রোতের ত্রিবেণী-সঙ্গমের বাষ্প জমিয়া ধীরে ধীরে নব্য বঙ্গ সংগঠিত হইয়াছে।

ইংরাজি আমলের অনতি-পূর্ব্বে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম্ম এবং মরসিদাবাদের রাজবৈঠকী রীতি নীতি উভয়ে বিবাহ পাশে বদ্ধ হইয়া বঙ্গ-দেশে নূতন এক সভ্যতার জন্ম দান করিয়াছিল; সে সভ্যতার প্রধান আড্ডা ছিল কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতা আমাদের পিতামহগণের সময়ে যৌবনে পদ নিক্ষেপ করিয়া কলিকাতার প্রভৃতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার সাংসারিক পদে বরণ করিল। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতাকে জ্ঞানোজ্জ্বল ইংরাজি সভ্যতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। নব্য বঙ্গ সেই বিবাহের শুভ ফল।

দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে নূতন সভ্যতার জন্ম কেবল যে এই প্রথম আমরা দেখিতেছি তাহা নহে—সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা যায়। যাহাকে এখন আমরা বিশিষ্ট রূপে গ্রীক সভ্যতা বলি, তাহা গ্রীকদেশের পুরাতন আর্য্য সভ্যতা এবং পুরাতন মিসর দেশের সভ্যতা এই দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে প্রসূত; যাহাকে এখন আমরা রোমান কাথলিক ধর্ম্ম বলি, তাহা ইহুদীয় পুরাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এবং গ্রীক দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন এই দুয়ের বিবাহ হইতে প্রসূত, আর পাউল মহাপ্রভু (St Paul) এই বিবাহের সুনিপুন ঘটক; সারাসেনিক সভ্যতা এবং রোমান্ কাথলিক সভ্যতা এই দুয়ের বিবাহ হইতে ইউরোপের মাধ্যকালিক সভ্যতা প্রসূত হইয়াছিল; বৌদ্ধ সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতা এই দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে পৌরাণিক সভ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দুই দিক্ হইতে দুই সভ্যতা একত্রে মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে নূতন এক সভ্যতার সূত্রপাত করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—জন্ম মাত্রই বিবাহের ফল।

পুত্র সকল-বিষয়ে অবিকল পিতার মত হয় ও না—হইয়া থাকেও নাই। যদি প্রকৃতির এইরূপ নিয়ম হইত যে, পুত্র আর সকল পিতার অনুরূপ হইবে, তবে পৃথিবীর নবত্ব জ্ঞান হইতে বৈচিত্র্য জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিত,—তাহা হইলে একজন মনুষ্যকে জানিলেই তাহার বংশের সকল মনুষ্যকেই জানা হইত। তাহা যে হয় না—ইহা জগতের সৌভাগ্য। নবদ্বীপের সভ্যতা এবং মুরসিদাবাদের সভ্যতা উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার সেই নবদ্বীপের সভ্যতা অথবা আবার সেই মুরসিদাবাদের সভ্যতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত, তাহা হইলে তাহাতে কাহার কি লাভ হইত? না হিন্দুর কোন লাভ হইত—না মুসলমানের কোন লাভ হইত। তেমনি আবার, নবাবি হিন্দু সভ্যতা এবং ইংরাজি সভ্যতা উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতা অথবা আবার সেই ইংরাজি সভ্যতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত, তাহাতেই বা কাহার কি লাভ হইত? না হিন্দুর কোন লাভ হইত না ইংরাজের কোন লাভ হইত। তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনো তাহাই থাকত, নূতন কিছুই হইত না।

নবাবি হিন্দু-সভ্যতার সহিত ইংরাজি সভ্যতার বিবাহের সুফল হাতে হাতে ফলিতেছে;—মুসলমান সভ্যতার পরাক্রমে বঙ্গের পুরাতন আর্য্য সভ্যতা ক্রমশই হীন-

জ্যোতি হইয়া পড়িতেছিল—ইংরাজদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির আলোকে প্রাণ পাইয়া এক্ষণে তাহা আবার মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। প্রাচীন লোকেরা অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে "হিন্দুয়ানি আর থাকে কদাচ!" ইঁহারা শুধু দেখেন—দেশাচার রক্ষা করাই হিন্দুয়ানি! কোনো হিন্দু-শাস্ত্রে লেখে না যে অন্তঃপুরের বাহিরে স্ত্রীলোকদিগের পদার্পণ নিষেধ—বরং ইহার অবিকল বিপরীত; হিন্দু-শাস্ত্রে আছে "ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা" ছায়ার ন্যায় স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হইবেন,—বোম্বায়ের হিন্দুরা সপরিবারে লোকালয়ে যাতায়াত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, পর্দানশীন্ শব্দটাই যাবনিক শব্দ। স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে—এটা খাস্ মুসলমানি প্রথা—তবুও আমাদের কাছে তাহা হিন্দুয়ানি! কুলস্ত্রীদিগের প্রতি কুদৃষ্টি-পাত করা একেবারেই হিন্দুদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ—সাধ্বী স্ত্রীদিগকে সাধারণতঃ মাতৃ-সম্বোধন করাই হিন্দুদিগের চিরকালের অভ্যাস,—এখন যদি তাহার কোন ব্যত্যয় হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহা মুসলমান আমলের প্রবর্ত্তিত নবাবি বাবুগিরির ফল। পুত্রের সমক্ষে মাতা যেমন অসংকোচে বাহির হইতে পারে, হিন্দু-স্ত্রী সেইরূপ রীতিমত ভদ্রতা রক্ষা করিয়া ভদ্র সমাজে অসংকোচে বাহির হইতে পারেন,—তাঁহার প্রতি যে ব্যক্তি মুসলমানি চশমার মধ্যদিয়া কুভাবে কটাক্ষ করে, সে জাতিতে হিন্দু হইলেও তাহার মন মুসলমানের অধম;—এই শ্রেণীর কদর্য্য কাপুরুষ লোকদিগের প্রতি একজন সুবিজ্ঞ রাজার এইরূপ অভিসম্পাত দেওয়া আছে Honi soit qui mal y pense যে মন্দ ভাবে তাহার মন্দ হউক। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগকে শক্তো-শক্ত করিয়া ঘরে চাবি দিয়া রাখিবার রীতি নাই কেন? দিল্লীর প্রতাপ সে সকল স্থানে পূর্ণতেজে পৌঁছিতে পারে নাই—এই তাহার একমাত্র কারণ। মুসলমানদিগের অপেক্ষা আমাদের বোম্বাই মান্দ্রাজী ভ্রাতারা আমাদের অধিক আদরের বস্তু; হিন্দুয়ানির গর্ব্ব না করিয়া আমাদের উচিত যে সেই খাঁটি হিন্দু ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে আমরা হিন্দুয়ানির ক খ শিক্ষা করি। বঙ্গদেশের সংস্কৃত উচ্চারণ যেমন ভ্রষ্ট উচ্চারণ—বঙ্গ দেশের হিঁদুয়ানিও সেইরূপ ভ্রষ্ট হিঁদুয়ানি। খাঁটি হিন্দুয়ানি যদি কোথাও থাকে তবে তাহা ঐ সকল যবনাজিত প্রদেশেই আছে।

রামমোহন রায়ের দূর-দর্শিতাকে ধন্য—তিনি একাকী আপন বুদ্ধি প্রভাবে নব্য বঙ্গের উন্নতির জটিল সমস্যা অবলীলা-ক্রমে পূরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নব্য বঙ্গের জন্মদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তাহার সঙ্গে তিনি তাহার স্থিতি এবং গতি উভয়েরই মূল সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। সে স্থিতি এবং গতি কিরূপ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

গতি কিনা পরিবর্ত্তন। যখন গ্রীষ্ম ঋতু আইসে তখন মনে হয় যে, ইহার আর অন্ত নাই; প্রত্যহই লোকেরা তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কায়-ক্লেশে কোন রূপে দিবা অবসান করে, কাহারো শরীরে অধিক বস্ত্র সহে না। তাহার পর যখন শীত ঋতু আইসে তখন সমস্তই উল্‌টিয়া যায়; পূর্ব্বে লোকেরা অর্দ্ধ উলঙ্গ থাকিত, এখন বস্ত্রের বোঝা বহন করে; পূর্ব্বে জল সেবন করিত এখন অগ্নি সেবন করে; এককালে আর এক কালের সকলই উল্‌টিয়া যায়। শীত কাল চলিয়া গেলেও যে ব্যক্তি অভ্যাস-গুণে শীত-বস্ত্র পরিধান করে সে ব্যক্তির স্বাস্থ্য অচিরে বিপদগ্রস্ত

হয়। এতকাল গ্রীষ্ম চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকালই যে গ্রীষ্ম অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বৎসরের যেমন কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক সমাজেরও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক; এই কালোচিত পরিবর্ত্তনকেই এখানে আমরা "গতি" এই ক্ষুদ্র একটি নামে নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু আর একদিকে দেখা যায় যে, যদিও শীত-কালোচিত বস্ত্র-পরিধানের নিয়ম গ্রীষ্ম-কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয় ও গ্রীষ্ম-কালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম শীত-কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের একটি নিয়ম কোন কালেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না—সে নিয়ম এই যে, স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। যদি বলি যে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে ও কথা গ্রীষ্মকালে খাটে না, যদি বলি যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে এ কথা শীত-কালে খাটে না; কিন্তু যদি বলি যে স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে এ কথা শীতকালে যেমন খাটে, গ্রীষ্মকালেও তেমনি খাটে, বর্ষাকালেও তেমনি খাটে; কোন কালেই এ কথা উল্টাইতে পারে না। এখানে দুইরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্রথম, কালোচিত নিয়ম কিম্বা যাথাকালিক নিয়ম,—শীত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে ইহা একটি যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ নিয়ম যথাকালেই খাটে, অযথা-কালে খাটে না; দ্বিতীয়, সার্ব্বকালিক নিয়ম,—স্বাস্থ্যের উপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে—এ নিয়ম সকল কালেই খাটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজের যত প্রকার সামাজিক নিয়ম আছে তাহার মধ্যে যে-গুলি সার্ব্বকালিক তাহার স্থায়িত্ব সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল, এবং যে গুলি যাথাকালিক তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন সমাজের গতির ভিত্তি-মূল।

রামমোহন রায় বঙ্গের গতি ভালর দিকে ফিরাইবার জন্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের মূল প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার স্থিতি অটল রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে ইহা অনিবার্য্য কেবল নয়,—ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু যাথাকালিক রীতি-নীতির কালোচিত পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া আমরা যেন সেই সঙ্গে সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম-নিয়মের স্থৈর্য্য বিনাশ না করি—এই বিষয়ে আমাদের সবিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রামমোহন রায় ইংরাজি বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াই স্বচ্ছন্দে মনে করিতে পারিতেন যে, আর একজন সমাজ-সংস্কারকের যত্ন ও পরিশ্রমে এই যা হইল ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু তাহা হইলে এই বঙ্গ সমাজের কি দারুণ দুর্দ্দশা হইত তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাহা হইলে ছত্রাবরণ-শূন্য ইংরাজি কিরণে বঙ্গ সমাজের মাথা এরূপ ঘুরিয়া যাইত যে, বঙ্গ সমাজ অচিরে ভ্রমান্ধ খৃষ্টান এবং জ্ঞানাভিমানী নাস্তিক এই দুই সম্প্রদায়ের অন্ধকারময় অট্টালার আড্ডা হইত। তাহা হইলে বাঙ্গালিরা আসল কাজে যাহাই হউক না—আচার-ব্যবহারে ইংরাজ অপেক্ষাও ইংরাজ হইয়া উঠিত; বাঙ্গালি সভ্যতা এবং ইংরাজি সভ্যতা দুয়ের সম্মিলনের ফল স্বরূপ আর যে কোন প্রকার নূতন সভ্যতা উৎপন্ন হইবে তাহার পথ বন্ধ হইয়া যাইত। মুসলমানদিগের আমলে বঙ্গদেশে যেরূপ পারস্য ভাষার অনুশীলন প্রচলিত ছিল, তাহাতে লোকের স্বাধীন চিন্তার চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে পারে এমন কোন অঞ্জন ছিল না; এই জন্য

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মুসলমানদিগের আদব কায়দা এবং পুরাণতন্ত্রের ধর্ম্ম এ দুয়ের মিলন-মিশনের পক্ষে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যার অনুশীলন সহসা যেরূপ লোকের স্বাধীন চিন্তা ... ফুটাইয়া তোলে, তাহাতে সে অনুশাসনের সঙ্গে সমগ্র পুরাণ তন্ত্রের ধর্ম্ম কোন প্রতিকে ... খাইতে পারে না,—ঐ দুই বিরোধী সামগ্রীকে বল পূর্ব্বক মিশাইতে গেলে কেবলে জলে মিশানো হয় মাত্র। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বতন কালে বঙ্গের স্থিতির ভিত্তিমূল ছিল—এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যার তোড়ের মুখে তাহা কোন ক্রমেই টেঁকিতে পারে না,—এখন বঙ্গের স্থিতির এইরূপ একটা নূতন ভিত্তিমূল আবশ্যক, যাহা ইংরাজি বিদ্যার উন্নতি স্রোতে না টলিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থাকিতে পারে।

পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে স্থিতির কিছু অতিমাত্রা বাড়াবাড়ি ছিল। আপাদ-মস্তক শৃঙ্খলা-বন্ধনে হিন্দুসমাজ জড়-আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিল। পূর্ব্বতন হিন্দু-সমাজে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার কর্ত্তব্য, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত ও অলঙ্ঘ্য গণ্ডি দিয়া সীমাবদ্ধ করা ছিল। মনুর আমলের বাঁধা রাস্তায় বাঁধা চালে চলা হিন্দুসমাজের এরূপ অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে যে, এখনকার এই ঘুমন্ত হিন্দুসমাজও ঘুমের ঘোরে সেই একই বাঁধা রাস্তায় একই বাঁধা চালে চলিতেছে। কামারের কাজ কামার করিতেছে, কুমোরের কাজ কুমোর করিতেছে, তাঁতির কাজ তাঁতি করিতেছে, চাসার কাজ চাসা করিতেছে,—তাই না হয় নূতন প্রণালীতে করুক, তাহাও নহে,—মান্ধাতার আমল হইতে যেরূপ কার্য্য-প্রণালী চলিয়া আসিতেছে আজিও সেই প্রণালীতে সকলে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। স্থিতির যেখানে এইরূপ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানে গতি সহজেই মন্দা পড়িয়া আসে—ইহাই সমাজের নাড়ী ত্যাগের পূর্ব্ব-লক্ষণ। স্থাবর স্থিতি-শীলেরা বলিবেন সন্দেহ নাই যে, "চাসা দিব্য চাস করিতেছে, পণ্ডিত অধ্যাপনা করিতেছে, রাজা রাজ-কার্য্য করিতেছে, অন্নপ্রাশন বিবাহ শ্রাদ্ধ যথা নিয়মে চলিতেছে, সকলই দিব্য নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল আর কি আশা করা যাইতে পারে? তবে কেন মিথ্যা এক পরিবর্ত্তনের বিপ্লব আনিয়া শুদ্ধ শুধু সমাজের শান্তি-ভঙ্গ করা!" অন্ধ সংস্কার দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন "সমাজ দিব্য চলিতেছে।" কিন্তু সত্য-সত্যই কি সমাজ দিব্য চলিতেছে? গতিহীন স্থিতিশীল সমাজের উপরে জ্ঞানের এক বিন্দু আলোক পড়িলেই তাহার দিব্যত্ব ঘুচিয়া যায়। এরূপ সমাজের নীচের লোকেরা

> কাঁপে সদা কর-যোড়ে দিবা নিশি গ্রীবা অবনত।
> যত ভার চাপাও তত্তই সহে বলদের মত॥
>
> স্বপ্ন প্রয়াণ।

উপরের লোকদিগের—

> গর্ব্ব অভিমান ওঠে সকল-হইতে উচ্চে চাড়,
> সাধ যায় চরাচর পদতলে যাক্ গড়াগড়ি॥
>
> ঐ।

এরূপ স্থিতি-শীল সমাজের নীচের লোকদিগের উপরে-উঠিবার সিঁড়ি নাই, উপরের লোকদিগের নীচের সাহায্যে নামিবার সিঁড়ি নাই। স্থিতি-শীল সমাজের উপর-শ্রেণীর লোকেরা বিনা যত্নে বিনা পরিশ্রমে শুদ্ধ কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃপায় সমাজের উচ্চ আসনে অধিকার পাইয়াছেন—তাঁহারা প্রাণ থাকিতে সে আসন যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দিতে পারেন না; তাঁহারা চাহেন "সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকুক;" তাঁহারা মনে জানেন যে, সমাজ যেমন আছে তেমনি

থাকিলেই তাঁহারাও যেখানে আছেন সেই খানে থাকিবেন—সমাজের মস্তকের উপরে থাকিবেন, কিন্তু তাঁহারা মুখে এইরূপ কারণ দর্শান যে, “পুরুষানুক্রমে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না।” যাঁহাদের “স্থিত” আছে অর্থাৎ ধন-মান খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে—স্থিতিশীল সমাজ তাঁহাদের প্রস্তরের দুর্গ; এই সব দুর্গপতির—

> “চাবি-বন্ধ হৃদয় পাষাণময়, ...
> ... প্রণালিতে মানা চারি দিকে ...”
> ...।

নূতন উপার্জ্জনের জন্ত ... ইঁহারা সম্মত নহেন—পূর্ব্ব পুরুষদিগের উপার্জ্জিত ধন মান রক্ষা করাই ইঁহাদের প্রধান কার্য্য, এবং যাহা আছে তাহা হারাইবার ভয়ই ইঁহাদের প্রধান ভয়। গতিশীল সমাজে নূতন উপার্জ্জনের সহস্র পথ নিরন্তর খোলা থাকে, ও সহস্র ব্যক্তি উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত অভীষ্ট পথে চলিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করে; স্থিতিশীল সমাজে ঠিক ইহার বিপরীত। এ সমাজে ধন-মান যাহাদের আছে তাঁহাদেরই আছে, আর সমস্ত লোকে অতি দীন হীন ভাবে তাঁহাদের দ্বারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনরূপে স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন করে। স্থিতিশীল সমাজ যাঁহাদের প্রস্তরের দুর্গ তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থের অনুরোধে বলিতে পারেন “সমাজ দিব্য চলিতেছে,” এমন কি নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরাও অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও উপরি-উক্ত কথা শিরোধার্য্য করিতে পারেন—কিন্তু অপক্ষপাতী জ্ঞান কখনই ওরূপ কথায় সায় দিতে পারে না। জ্ঞান স্পষ্টই বলিবে যে, “এ সমাজের নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতে গতির তাড়িত-সঞ্চার করিতে আর এক দণ্ডও বিলম্ব করা উচিত হয় না।” কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক্ না, স্থিতি ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরো অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরু ভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে। সমাজের এইরূপ তপ্ত অবস্থায় বাহির হইতে পরিবর্ত্তনের উদ্দীপক কোন নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সঙ্গে কিছুকাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে। প্রথম প্রথম নূতন কিছুতেই পরিপাক পায় না,—ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব খিতাইয়া নরম পড়িয়া আসে, তখন পুরাতনের সহিত তাহার কতকটা মিশ খায়; প্রথম প্রথম নূতনকে অদ্ভুত নূতন মনে হয়, পরে চলন-সই নূতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত নূতনের রীতিমত লয় বাঁধিয়া গিয়া নূতন পুরাতনের অঙ্গের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পুরাতনের সহিত নূতনের সম্ভাব বসিতে না বসিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাও স্থির হইতে না হইতে আর এক নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়াও করে, মুহুর্মুহু নূতনের পর নূতন আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় কত যে নূতন-নূতন অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া কত যে দুই দিনের পুরাতন নাবালক স্থিতিকে বৎসর-কয়েকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতন-নূতন-নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দশা হয়।”

নব্য বঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে রোধ করিবে না, উভয়ের মধ্য-পথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উন্নতি-মার্গে লইয়া যাইতে হইবে। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম্ম যাহা এ যাবৎকাল বঙ্গ সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল ছিল তাহা এক্ষণকার কালোচিত গতির উপযোগী নহে। এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যানুশীলন নব্য বঙ্গকে স্বাধীনতার উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে। —"আপনার স্বাধীন চিন্তার পরামর্শ ভিন্ন আর কাহারো কথা মানিব না" এই মহামন্ত্রে ইংরাজি বিদ্যা বঙ্গ-সমাজকে দীক্ষিত করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শাসন নব্য-বঙ্গের এই নবোদ্দীপ্ত স্বাধীনতা-স্পৃহাকে কিছুতেই বাঁধ দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না—পারিবেও না। এই স্বাধীনতা-স্পৃহাকে প্রতিরোধ করিতে যাওয়া নিতান্তই হীন বুদ্ধির কার্য্য; উল্টা আরো, যাহাতে উহা সম্যক্ রূপে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে তাহার উপায় অন্বেষণ করা কৃতবিদ্য লোকের কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতার উপর্য্যুপরি তিনটি ধাপ আছে,—প্রথম, স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি; দ্বিতীয়, স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম নিয়মের সংস্থাপন, তৃতীয়, স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-প্রসূত সেই সকল ধর্ম্ম-নিয়ম দ্বারা আপনাকে নিয়মিত করা,—এক কথায় ধর্ম্ম-নিয়মানুসারে চলা।

প্রথম, স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি। স্বাধীনতা আপনার নূতন স্ফূর্ত্তির প্রথম উদ্যমে অধীরে বলিয়া উঠে "আমি কাহারো বলের বশবর্ত্তী হইয়া চলিব না, আমার নিজের স্বাধীন চিন্তা যাহা বলিবে তাহাই করিব।" কিন্তু স্বাধীনতা এখনও বালক—এখনো তাহার চিন্তা শক্তি জন্মে নাই; এ দুর্দ্দান্ত বালক-স্বাধীনতার উপর সমাজ কিছুতেই নির্ভর করিতে পারে না; এ স্বাধীনতা গতির উত্তেজনায় প্রমত্ত হইয়া সমাজের স্থিতিকে ভঙ্গ করিতে হস্ত উত্তোলন করে। এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার অধিক উপরে উঠিতে পারে না।

দ্বিতীয়, স্বাধীন চিন্তা হইতে সার্ব্বভৌমিক নিয়মের উৎপত্তি। স্বাধীনতা যথোচিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জ্ঞান তাহাকে এইরূপ উপদেশ দেয় যে, "তুমি যখন স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখিয়াছ তখন তাহার চরম পর্য্যন্ত যাও—মধ্য-গঙ্গায় হাল ছাড়িয়া দিও না; তোমার স্বাধীন চিন্তা যে পর্য্যন্ত না সার্ব্বভৌমিক সত্যে পৌঁছায় সে পর্য্যন্ত নিবৃত্তি মানিও না; যতক্ষণ না সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-জনক ধর্ম্ম-নিয়ম অন্বেষণ করিয়া পাও, ততক্ষণ আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিও না।" এইবার স্বাধীনতার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে; স্বাধীনতা বুঝিয়াছে যে, শুধু গতিতে কিছুই হয় না—গতির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি চাই; বুঝিয়াছে যে, পরিবর্ত্তনীয় রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করা যেমন আবশ্যক, অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম নিয়মকে ধরিয়া থাকা তেমনি আবশ্যক; কিন্তু সেই যে ধর্ম্ম-নিয়ম তাহা ঐ স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-প্রসূত—পুঁথি হইতে সংগ্রহ করা বচন মাত্র নহে।

তৃতীয়, আপনার স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্ম-নিয়মে আপনি চলা। আমাদের দেশে স্বাধীনতা এ যাবৎকাল ক্রমাগতই বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বলের অধীনে ঘাড় পাতিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মনু বলিয়াছেন অমুক কার্য্য করা কর্ত্তব্য অতএব তাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম মনুর শাসনাধীন; গুরুর আজ্ঞা পালনই সার ধর্ম্ম—ধর্ম্ম গুরুর শাসনাধীন। কুন্তী যখন পাণ্ডবদিগকে বলিলেন "তোমরা

পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বাঁটিয়া লও” তখন সেই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আদেশ পালন করাই পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম হইল। দেবতারা বলবান্ বলিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও দোষের নহে—তেজীয়সাং ন দোষায়। এখনকার জ্ঞানোজ্জ্বল সমাজে মনুর শাসন বা গুরু-আজ্ঞা, কিংবা ঋষিবাক্য, ধর্ম্মের নিংহাসন অধিকার করিতে গেলে, তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ দেখিতে হয়। এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে, ধর্ম্মের নিয়ম কৃতবিদ্য ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা হইতে প্রসূত হইলে তবেই তাহা লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে। প্রতি জনেই আপনার স্বাধীন চিন্তা হইতে ধর্ম্মের নিয়ম উদ্ভাবন করিবার অধিকারী। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির দোষে যে-সে নিয়ম ধর্ম্ম-নিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না; কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কেননা নির্দ্ধারিত নিয়মটি সত্য-সত্যই ধর্ম্মের নিয়ম কি না তাহার পরীক্ষা সহজেই হইতে পারে। যদি সে নিয়ম সার্ব্বভৌমিক পদবীর উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যদি তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী হয়, তবেই তাহা ধর্ম্ম-নিয়ম—নচেৎ নহে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি; “মিথ্যা কথা কহিবে” এই নিয়ম সর্ব্ব-সাধারণে প্রচারোপযোগী—না “সত্য কথা কহিবে” এই নিয়ম সর্ব্ব-সাধারণে প্রচারোপযোগী? যদি কোন রাজা স্বীয় রাজ্যে এইরূপ একটী নিয়ম প্রচলিত করেন যে “কেহই মিথ্যা ছাড়া সত্য কহিবে না,” তাহা হইলে সকলেই সকলের কথা অবিশ্বাস করিবে, কেহ কাহারো কথায় কর্ণপাত করিবে না; কেহ কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিলে কোন কথা বলিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে না—সমস্ত রাজ্যে কথা কহা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহার সঙ্গে মিথ্যা কহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, “মিথ্যা কহিবে” এ নিয়মটি যদি কোন কালে সর্ব্ব-সাধারণে প্রচলিত হইবার হয়, তবে আত্মহত্যা তাহার ললাটে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অতএব “মিথ্যা কহিবে” এ নিয়মটি সর্ব্ব-সাধারণে প্রচারোপযোগী নহে। আমার নিজের স্বাধীন চিন্তা আমাকে বলিতেছে যে, সত্য কহিবে এই নিয়মটিই সর্ব্ব-সাধারণে প্রচারোপযোগী—সুতরাং আমি যদি সত্যের নিয়মে চলি তবে আমি আমার আপনারই স্বাধীন চিন্তার পরামর্শ অনুসারে চলি—কাহারো কোন বল দ্বারা বাধ্য হইয়া চলি না।

স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তিতেই জ্ঞানের উৎপত্তি সাধিত হয়; স্বাধীন চিন্তার ফলে—এক দিকে প্রাকৃতিক নিয়ম আর-এক দিকে ধর্ম্ম-নিয়ম এই দুই প্রকার নিয়মের আবিষ্কারে—জ্ঞানের স্থিতি সাধিত হয়; এবং স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত সেই সকল নিয়মকে নানা প্রকার হিত কার্য্যে প্রয়োগ করা হইলেই জ্ঞানের গতি সাধিত হয়। জ্ঞানের এইরূপ উৎপত্তি স্থিতি এবং গতির উপরে সভ্যতার উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। বৈদিক মুনি-ঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি-প্রভাবে আমাদের দেশে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছিল—এবং তাহার পর মন্বাদি রাজর্ষির আবিষ্কৃত ধর্ম্ম-নিয়মে আমাদের দেশে জ্ঞানের স্থিতি সাবধানে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন দেশেই জ্ঞানের গতি রীতি মত সাধিত হইতে পারে না—অর্থাৎ জ্ঞানকে রীতি মত কার্য্য-ক্ষেত্রে নামানো যাইতে পারে না।

আমাদের দেশে তাহাই ঘটিয়াছিল। আমাদের দেশে জ্যোতিষ ছিল—কিন্তু নাবিকীয় কার্য্যে জ্যোতিষের প্রয়োগ ছিল না; আমাদের দেশে গণিত বিদ্যা ছিল, কিন্তু যন্ত্র-তন্ত্রে গণিতের প্রয়োগ ছিল না; আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিল কিন্তু সাংসারিক কার্য্য-ক্ষেত্রে তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োগ ছিল না,—আমাদের দেশে স্থিতির নিপীড়ন-ভারে গতির শ্বাস অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, স্থিতি এবং গতি, দুইই সমান আবশ্যক, এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই যে, আমাদের দেশে স্থিতির কোন উপাদানেরই অভাব নাই—আমাদের যত কিছু অভাব সমস্তই গতির প্রসঙ্গাধীন। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যে,আমরা আমাদের স্বদেশীয় স্থিতির সহিত ইউরোপীয় গতি মিলিত করিয়া সেই মৃতপ্রায় স্থিতির জীবন সঞ্চার করি। ইংরাজি বিদ্যালয় জ্ঞানের কিরণ বর্ষণে দিন দিন নব্য বঙ্গের ভাব ভঙ্গি পরিবর্তন করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু যতই কেন পরিবর্তন করুক্ না—ব্রাহ্মসমাজ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোন অবস্থাতেই নব্য বঙ্গ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না; স্বাধীন চিন্তার নূতন স্ফূর্ত্তি কিয়ৎপরিমাণে দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে—ইহা তো হইতেই পারে, কোন্ ভাল বস্তুর সঙ্গে মন্দ একটু-না একটু লাগিয়া না থাকে? কিন্তু সেই স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইতেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়ম উদ্বোধিত করিয়া স্বাধীনতাকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। কালোচিত পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রচারের জন্য যেমন আমাদের দেশে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম-নিয়ম প্রচারের জন্য আমাদের দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি নব্য বঙ্গ-সমাজের গতির ভিত্তি-মূল, আর-একটি স্থিতির ভিত্তিমূল। আমাদের স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ইংরাজি বিদ্যার বিবাহ সংঘটন হইলে সেই সঙ্গে স্থিতি এবং গতির বিবাহ-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়; ইহাই নব্যবঙ্গের মঙ্গলের একমাত্র নিদান।

আমাদের দেশের নব্য-সম্প্রদায়েরা একটি বিষয়ে বড়ই ভুল বোঝেন; স্বাধীন চিন্তা বলিতে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তাই বোঝেন—দেশের স্বাধীন চিন্তা বলিয়া যে একটা সামগ্রী আছে তাহা তাঁহারা বোঝেন না। যেমন আমি তুমি তিনি, তেমনি আমার দেশ তোমার দেশ তাঁহার দেশ। দেশের স্বাধীন অবস্থায় দেশের মস্তক-স্বরূপ ব্যক্তিদিগের মন হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ সত্য এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা বিনিঃসৃত হয় তাহাই দেশের স্বাধীন চিন্তা। স্বভাবতঃ যেরূপ চিন্তা বিনিঃসৃত হয়—অর্থাৎ কোন বিদেশীয় জাতি-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক বাধিত না হইয়া যেরূপ চিন্তা বিনিঃসৃত হয়। প্রথমে প্রেম আসিয়া স্বাধীন চিন্তাকে উস্কাইয়া দিবে, তাহার পর জ্ঞান আসিয়া স্বাধীনতাকে নিয়মিত করিবে, এই ইচ্ছে নিয়ম। যদি আমার প্রেম না থাকে তবে আমার স্বাধীন চিন্তাই বা কিসের জন্য—স্বাধীনতাই বা কিসের জন্য। যে জাতির স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম আছে সেই জাতিই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে। প্রেমের উত্তেজনায় প্রথমে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয়; সেই স্ফূর্ত্তির ফলিত অবস্থায় জ্ঞানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল উদ্বোধিত হয়; অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিণামে সেই-সকল নিয়ম দ্বারা স্বাধীনতা কার্য্যে নিয়মিত হয়। এইরূপে আমার স্বাধীন চিন্তা হইতে যে ধর্ম্ম প্রসূত হয় তাহাই প্রকৃত পক্ষে স্ব-

...ার স্বধর্ম্ম—আর এক জনের বলিয়া দেওয়া ধর্ম্ম যদি আমার স্বাধীন চিন্তার বিরোধী হয় তবে তাহা আমার স্বধর্ম্ম নহে—তাহা পরধর্ম্ম। স্বদেশের সম্বন্ধেও ঠিক ঐকথাটি পুনরুক্তি করা যাইতে পারে, বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনায় স্বদেশে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয়; সেই স্ফূর্ত্তির ফলিত অবস্থায় স্বদেশের জ্ঞানে সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল উদ্ভাবিত হয়; অবশেষে সেই উদ্যোগের চরম পরিণামে সেই সকল নিয়ম দ্বারা স্বদেশের [illegible] ভূমিক[illegible] নিয়মিত হয়। এইরূপ স্বদেশের স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্মই স্বদেশের স্বধর্ম্ম, [illegible] জাতির বলিয়া দেওয়া ধর্ম্ম যদি স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তার বিরোধী হয়, তবে তাহা স্বদেশের স্বধর্ম্ম নহে কিন্তু পরধর্ম্ম। ভগবদ্গীতায় [illegible] "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আপনার স্বাধীন চিন্তার বিরোধী—যে ধর্ম্ম বল-পূর্ব্বক লোকের স্কন্ধে বা দেশের স্কন্ধে আরোপিত—তাহা ভয়াবহ। [illegible] যেমন স্বাধীন চিন্তাকে উস্কাইয়া [illegible] মনি স্বাধীন চিন্তাকে দমাইয়া দে[illegible]। পূর্ব্ব কালে সামাজিক শাসন-বলে [illegible] দেশের স্বাধীন চিন্তা অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; চিন্তাশীল মুনি ঋষিরা এক প্রকার আরণ্যক সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের স্বাধীন চিন্তার সে ভয় নাই, কিন্তু তাহার স্থানে আর এক গুরুতর ভয়ের পূর্ব্ব-সূচনা দেখা দিতেছে; ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে বল-পূর্ব্বক নিষ্ফল বিদ্যার মোট বহাইয়া না ছাড়ে—এই [illegible] ভয়। এক পয়সা ফেলিয়া দিলেই মুটে মোট মাথায় করে—ইংরাজেরা আমাদের সম্মুখে কেরানি-গিরি নিক্ষেপ করিলেই আ-[illegible] বিদ্যার বোঝায় ঘাড় পাতিয়া দিই। ইউরোপীয় লোকেরা যে আপনাদের স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইতে আপনাদের সমস্ত বিদ্যা উদ্ভাবন করিয়া তুলিয়াছে—এবং তাহাদের সেই স্বাধীন চিন্তাটির মূল্য যে তাহাদের সমস্ত বিদ্যার মূল্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভুল ক্রমেও আমরা সে দিকপানে চাহিয়া দেখি না। ইউরোপীয় সমস্ত বিদ্যা [illegible] থাকে—ও কেবল যদি স্বাধীন চিন্তাটি তাহার মধ্য হইতে অন্তর্দ্ধান করে—তবে ইউরোপীয় বিদ্যার মূল্য একেবারেই [illegible] নিপাতিত হয়। তাহা হইলে [illegible] কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইবার পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজি শিক্ষার যথা দুইটি তথ্য [illegible]—আপনাদের স্বদেশে চিন্তা [illegible] হইতে [illegible] উদ্দীপন আমাদের [illegible] লেশ মা[illegible] হয়। পূর্ব্বে আমরা বলিতাম "মনু বলিয়াছেন অমুক কার্য্য কর্ত্তব্য—অতএব তাহা কর্ত্তব্য," এখন আমরা বলিতেছি "ইউরোপ বলিতেছে অমুক কার্য্য কর্ত্তব্য—অতএব তাহা কর্ত্তব্য।" পূর্ব্বে মনুর স্বদেশানুরাগ-মিশ্রিত [illegible] প্রধানে আমরা গ্রীবা নত করিতাম, এখন ইউরোপের গর্ব্বস্ফীত মানসিক বলের প্রধানে আমরা গ্রীবা নত করিতেছি!—স্বাধীন চিন্তা পূর্ব্বে আমাদের দেশে নব্য ইউরোপের মত এত প্রবল ছিল না এই মাত্র—কিন্তু এক্ষণে আমাদের তাহা নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে অন্ততঃ আরণ্যক মুনি-ঋষিদের মধ্যে স্বাধীন-চিন্তা পাখা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল;—এখন এক দিকে ইউরোপীয় পরাক্রমের গুরুভার এবং আর একদিকে ভ্রষ্ট হিন্দুয়ানি-রূপী মৃত ঘটোৎকচের গুরুভার—দুইদিক দিয়া দুইভার আসিয়া আমাদের দেশের স্বাধীন-চিন্তাকে যাতায় পিসিয়া বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে।

এই উভয়-সঙ্কট হইতে আমরা নব্য সমাজকে রক্ষা না করিলে কিছুতেই তাহার রক্ষা নাই। সমগ্র মনুর বিধান এখনকার কালোচিত নহে, এ জন্য এখন আমরা তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে পারি না; ইউরোপের সমগ্র সামাজিক রীতিনীতি আমাদের দেশোচিত নহে—এজন্য তাহাও আমরা নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে পারি না। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য আমাদের এই যে, এ-দেশের স্বাধীন চিন্তায়—ইউরোপের যে সমস্ত রীতি নীতি এ দেশের উপযোগী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, তাহা আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিব: আবার এ-কালের স্বাধীন চিন্তায়—মনু প্রভৃতি স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের যে সমস্ত বিধান বর্ত্তমান কালের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাও আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিব। ইংরাজেরাও আর্য্য জাতি—আমরাও আর্য্যজাতি,—ইংরাজদিগের সহিত আমাদের এক প্রকার জ্ঞাতি সম্পর্ক; ইংরাজদিগের মধ্যে এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহা এক সময়ে আমাদের মধ্যেও ছিল;—মুসলমানদিগের রাজ্যকালে যেরূপ অনেক সামগ্রী আমরা অযত্নে হারাইয়া ফেলিয়াছি,—ইংরাজদের সান্নিধ্য-বশতঃ যদি সে-গুলি পুনরায় নূতন বেশে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে সুযোগ পায়—তবে তেমন সুযোগ কোন মতেই আমাদের ছাড়া উচিত হয় না। ইউরোপের নিকট হইতে আমাদের স্বদেশোপযোগী সভ্যতার উপকরণ গ্রহণ করিবার বৈধ প্রণালী সবিস্তরে বিবৃত করিয়া বলিবার এ সময় নহে—এখানে তাহার দুই একটি স্বল্প আভাস প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। কাণ্টের দর্শন-শাস্ত্র এবং আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্র দুয়ের মধ্য হইতে সার মন্থন করিয়া লইলে সে দুই সারাংশের কেবল যে সমষ্টি মিল পায় তাহা নহে, কিন্তু উভয়ের দোষাংশ উভয়-কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং উভয়ের গুণাংশ উভয়ের যোগে বর্দ্ধিত হইয়া নূতন এক সারবান্ দর্শন-শাস্ত্র আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশের পারদ-ভস্মাদির নানাবিধ রাসায়নিক প্রকরণ ইংরাজি কিমীয় বিদ্যার সহিত মিলিয়া মিশিয়া নূতন এক রসায়ন বিদ্যার উৎপত্তি করিতে পারে। চিকিৎসা-বিদ্যা-সম্বন্ধে ঐরূপ মিলনের কথা আরো জোরের সহিত খাটে। লৌকিক শিষ্টাচার-প্রথাও এমন অনেক পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ আর্য্যজাতির মধ্যে এককালে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এখন বঙ্গ দেশ হইতে তাহার অনেক গুলি উঠিয়া গিয়াছে; নব্য বঙ্গে তাহার পুনরুদ্দীপন ভাল বই মন্দ নহে। ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত—হস্ত-আলোড়ন-রূপ অভিনন্দনের প্রথা;—এপ্রথা হিন্দুস্থানি খোট্টা মহলে এখনো প্রচলিত আছে; ইউরোপীয় অভিনন্দন-প্রথা এবং ভারতবর্ষীয় অভিনন্দন প্রথা দুয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু প্রভেদ যে, দুই হস্তে দুই হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ভারত-বর্ষীয় প্রথা—দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ইউরোপীয় প্রথা—এ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কালিদাসের সময় বোধ হয় আমাদের দেশে ইউরোপের অনুরূপ অভিনন্দন-প্রথা প্রচলিত ছিল;—পুরূরবা রাজার সহিত চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সাক্ষাৎকারের সময়, রাজা রথ হইতে নামিয়া বলিলেন "স্বাগতং প্রিয়সুহৃদে", ইহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ Welcome dear friend. ইহার পরেই লিখিত আছে "অন্যোন্য [illegible] স্পৃশতঃ" "উভয়ে পরস্পরের হস্ত স্পর্শ করিলেন; হস্ত এখানে বিবচন [illegible] বচন—ইহাতে [illegible] যে, কালিদাসের সময়ে [illegible] ইউরোপীয় প্রথা [illegible]। এই

রূপ যেখানে আমাদের দেশের রীতি নীতির কালোচিত পরিবর্তন আমাদের স্বদেশেরই পূর্ব্বতন রীতিনীতিকে উস্কাইয়া তুলে, সেখানে সেরূপ পরিবর্তনকে মিছামিছি স্বদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ভাবিয়া কেন-যে আমরা ভয় করিব তাহার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশ স্বাধীন অবস্থায় যেরূপ ছিল তাহা আমরা হারাইয়াছি,—এক্ষণকার কোন কালোচিত পরিবর্তন যদি সেই হারা সামগ্রী আমাদিগকে মিলাইয়া দেয়,তবে উল্টা-আরো তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করা আমাদিগকে শোভা পায়। ইউরোপীয় আধুনিক আর্য্য রীতি নীতি যদি আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আর্য্য রীতি-নীতিকে ভস্মের আচ্ছাদন হইতে টানিয়া বাহির করে, তবে নূতন-পুরাতনের মধ্যে—গতি এবং স্থিতির মধ্যে—সহজেই ঐক্য বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়,—ইহা কত না প্রার্থনীয়।

এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রীতি-নীতি আচার ব্যবহার—যাহা থাকিলেও বিশেষ কোন লাভ নাই—না থাকিলেও বিশেষ কোন হানি নাই, তাহার কথা এখন যাইতে দিয়া—স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্ম নিয়ম সকল কালোচিত গতির সহিত কিরূপে সৌহার্দ্দ-পাশে বদ্ধ হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যা'ক। আমাদের দেশের বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র হইতে যদি এরূপ এক উচ্চ ধর্ম্ম-শাস্ত্র মন্থন করিয়া পাওয়া যায়, যাহা বর্ত্তমান কালের উন্নত জ্ঞানের উপযোগী, তবে তাহাই নব্য-বঙ্গের স্থিতি-বন্ধন-কার্য্যে যথার্থ অধিকারী। বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের মথিত সারাংশ—যাহার আর-এক নাম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম—তাহা একদিকে যেমন স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত—আর একদিকে তেমনি বর্ত্তমান কালোচিত উন্নত জ্ঞানের সবিশেষ উপযোগী,—এক দিকে যেমন তাহা নব্য-বঙ্গের স্থিতি সংস্থাপনের উপযোগী, আর এক দিকে তেমনি তাহা নব্য বঙ্গের গতির অবিরোধী,—ঈশ্বর-কৃপায় যেটি আমাদের চাই সেইটি আমরা ঠিক্ সময়ে পাইয়াছি—এজন্য তাহার প্রতি সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

স্থাবর স্থিতিশীলতা-নিবন্ধন বঙ্গদেশের শোচনীয় জড়-ভাব রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয়কে কত যে তীব্র বেদনায় ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই; আর কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলে—যাহাতে বঙ্গের স্থিতি ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় তাহারই চেষ্টায় তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের হৃদয় যেমন বিশাল ছিল তাঁহার বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ ছিল,—একাধারে প্রেম এবং জ্ঞানের সমান উৎকর্ষ যদি কোথাও দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহা রামমোহন রায়েই দেখা যায়। রামমোহন রায়ের কার্য্য দেখিলেই তাঁহার মনের মহদ্ভাব দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়; সে ভাব এই যে, বঙ্গ সমাজের স্থিতি-ভঙ্গ না করিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে গতির সঞ্চার করিতে হইবে। তিনি দেখিলেন ইংরাজি বিদ্যালয় ভিন্ন গতি সঞ্চারের উপায় নাই, ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন স্থিতি-রক্ষার উপায় নাই; এই জন্য তিনি সমাজরূপী তুলাদণ্ডের এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং আর-এক দিকে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; যদি একটিকে উঠাইয়া লও তবে আর একটি নিম্নে ঝুঁকিয়া তদ্দণ্ডেই ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে। রামমোহন রায়ের ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান্-দর্শী ত্রিনেত্রে নব্য বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি তিনই সাক্ষাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং তাঁহার একা হস্ত তিনেরই নির্ব্বাহ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনের কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই।

[illegible]বঙ্গের উৎপত্তির মূল ইংরাজি এবং বাঙ্গালি সভ্যতার বিবাহ—স্থিতির মূল ব্রাহ্মসমাজ—গতির মূল, ইংরাজি বিদ্যালয়,—রামমোহন রায় এই তিনটি আপনার অটল কীর্ত্তি স্তম্ভ এবং নব্যবঙ্গের অটল আশ্রয়-স্তম্ভ যুগপৎ সংস্থাপন করিয়া পৃথিবীর একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন ; ভবিষ্যতে ইহার শুভ ফল ... কত দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া পড়িবে, এখন আমরা তাহার বাষ্পও হয় তো জানি না।

—

সঙ্গীত।

রাগিণী কানাড়া—তাল একতালা।

কি গাব আমি কি শুনাব
আজি আনন্দ ধামে।
পুরবাসীজনে এনেছি ডেকে
তোমার অমৃত নামে।
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ
তোমার মধুর প্রেমে॥
তব নাম ল'য়ে চন্দ্র তারা
অসীম শূন্যে ধাইছে।
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম
গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল
তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত সাগর মাঝারে
ভাসিছে অবিরামে।

রাগিণী বাহার—তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে॥
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে
গগন-উৎসব-প্রাঙ্গনে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁখি পাইছে অন্ধ হে
তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত
প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে "নাথ যাচি
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে
যশোগাথা কত ছন্দে হে।
ঐ ভব শরণ প্রভু অভয়পদ তব
সুর মানব মুনি বন্দে হে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নির্শীথ আকাশে
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি।
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান।
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ।
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ।

রাগিণী মিশ্র কেদারা—একতালা।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি
তারা ত চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে
ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়.
দীপ নিভে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে, নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি [illegible] সব যায়
[illegible]—

সুখের আশায় মরি পিপাসায়
ডুবে মরি দুখ পাথারে,
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা
দেখিতে না পাই তোমারে।

রাগিণী হাম্বির। তাল সুরফাঁক তাল।

ঘোর গহন ভব-সংকটে আর কে জীবন সম্বল
থাক হে বন্ধু তুমি সঙ্গে অবিচল ভূধর আশ্রয়।
ভীষণ সিন্ধু তরঙ্গ নাদ নাশে তব নীরব
শরণ যাচি হে করুণা সিন্ধু আনন্দ সাগর।
প্রাণেশ্বর প্রাণ বিতরো,
হৃদি মাঝে আসি বন্ধন ঘুচাও।
আছি নাথ দিবা নিশি ঐ চরণ-তলে
প্রসাদে বঞ্চিত ক'রো না।

রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

তার' তার' হরি দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়
পূজন-সাধন-হীন জনে।
অকুল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাওহে
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে
যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে
অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে।

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল।
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকুল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল্।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল।

রাগিণী গৌড় মল্লার। তাল কাওয়ালি।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।
দেহগো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে,
মোচন কর তিমির,
জগত আড়ালে থেক না বিরলে
লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও।

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা।
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেওনা,
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।
চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে, শূন্য ভবন মম।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,

তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
অসীম পূর্ণ প্রেম পানে,
তোমার চরণ কমলে শরণ নিখিল জন।

রাগিণী তিলক কামোদ—তাল চৌতাল।

নয়ন বাহিয়ে অশ্রু ধারা বহে
পেয়ে তব [illegible] এ কলিকালে।
দীন হীনের প্রাণ বন্ধু তোমারে পাইলে,
কি ধন আর চাহি, আনন্দ সিন্ধু হৃদি উথলে।

রাগিণী সরজ—তাল কাওয়ালি।

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে।
কোথা কে আছে নাহি জানি,
তোমার মাধুরী পানে মেতেছি
ডুবেছে মন ডুবেছে।

রাগিণী সিন্ধু বিজয়। তাল তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল
সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে॥
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কি ধ্যানে মগন।
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে
ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ;
বিমল বিভুগুণ-বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত
নৃত্য করিছে অবিরামে।

জয়পুর।*

জয় জয়পুর রাজে, কেমন সুন্দর সাজে
সাজায়েছে নগরী আপন,
প্রাচীর পাষাণে গাঁথা বিপক্ষের মর্ম্ম-ব্যথা,
কার সাধ্য করে তা লঙ্ঘন।
শারদ জাহ্নবী যেন পুরী বক্ষে পথ হেন
তট দুই রাঙা হর্ম্ম্য-সারী,
দশ দিকে দশ দ্বার লোহার তোরণ তার
বিদারিতে বজ্র মানে হারি।
উগ্র রাজপুত বীর রণে বজ্র বাহু স্থির
স্থির দৃষ্টি তির্য্যক নয়ন,
তীক্ষ্ণ অসি-অস্ত্র করে জাতীয় গৌরব ভরে
শত্রু দুর্গ করিছে রক্ষণ।
ব্রিটীশ-বিক্রম নাই এখানে বড়ই ধীর
ধীর যথা প্রশান্ত সাগর,
রোষ প্রতিরোষ নাই শ্বেতে কৃষ্ণে ভাই ভাই
শোভে সাম্যে পবিত্র সুন্দর।
পূরবে পর্ব্বত শোভে, মুনির মানস লোভে
গালব ঋষির তপ তায়
নীচে নির্ঝরিণী ঝরে মাঠে শিখি মৃগ চরে
হাসি খুশি প্রকৃতি দুলায়।
রাজার কানন মাঝে দেব তপস্বীর হর্ম্ম্য
হেরিলে নয়ন মন ভুলে
যুগ যুগ ছুটে ছুটে বিশ্বের প্রকৃতি লুটে
হেন, যেন রাখিয়াছে তুলে।
আগাগোড়া হিন্দু দেশ, হিন্দু ভোজা, হিন্দু বেশ,
হিন্দু রুচি হিন্দু-পবিত্রতা,
হিন্দু ভাবে হিন্দু কর্ম্ম, হিন্দু মঠে দান ধর্ম্ম,
সেই খানে হিন্দু স্বাধীনতা।
স্বাধীন সরল চিত্তে নিজ নিজ মান বিত্তে
করে বাস হিন্দু সুত বালা,
হিন্দু করে চিত্র চারু, স্বদেশী সুন্দর কারু,
খান সত্য প্রস্তরের মালা।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম হিন্দু হৃদয়ের মর্ম্ম
জীবে জীব করে না বিনাশ
করে না কাহারো ভয়, হৃদে হৃদে বিনিময়
ভূচরে খেচরে মিলে বাস।
জাহ্নবীরে ছাড়ি দূরে, দূর অগ্রবন ঘুরে
প্রাচীনা যমুনা পরিহরি
প্রাচীন যবন কীর্ত্তি করিয়া পশ্চাৎবর্ত্তী
মহেশের মহা ইচ্ছা স্মরি
পূজ্যপাদ গুরু সনে সবল শরীর মনে
কয় দিন এসেছি হেথায়,
রবির রজনী গতে ক্রমে দক্ষিণের পথে
যেতে গুরুদেবে অভিপ্রায়।

---

* গত বারের পত্রিকায় স্থানাভাবে এই পদ্যটী দেওয়া হয় নাই।